দি ন্যারেটিভ অব

আর্থার গর্ডন পিম

এডগার অ্যালান পো

অনুবাদ • খসরু চৌধুরী

বুকের গভীরে সাগর অভিযানের আকাঙ্ক্ষা লালন করত আর্থার গর্ডন পিম। তাই একদিন সুযোগ পেতেই বন্ধু অগাস্টাসের সঙ্গে উঠে বসল সে আমেরিকান জাহাজ গ্রামপাসে। ১৮২৭ সালের জুনে গ্রামপাস যাত্রা শুরু করল দক্ষিণ সাগর অভিমুখে। এক বিদ্রোহের পথ ধরে জাহাজে ঘটল নৃশংস হত্যাকাণ্ড। বিদ্রোহের কবল থেকে রক্ষা পাবার পর হানা দিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ।

রক্ষাকারী হিসেবে এল ব্রিটিশ জাহাজ জেন গাই। এবার যাত্রা কুমেরু মহাসাগর অভিমুখে। এখানে নানা অবিশ্বাস্য আবিষ্কার হলো, তারপর এক দ্বীপে রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড।

চলুন, পাঠক, অ্যালান পো-র হাত ধরে আমরাও অংশ নিই অতি রোমাঞ্চকর, অবিস্মরণীয় এক সাগর অভিযানে।

ঐতিহ্য

ISBN 978-984-8863-92-3

রহস্য উপন্যাস

দি ন্যারেটিভ অব আর্থার গর্ডন পিম

মূল

এডগার অ্যালান পো

অনুবাদ

খসরু চৌধুরী

ঐতিহ্য

দি ন্যারেটিভ অব আর্থার গর্ডন পিম
মূলঃ এডগার অ্যালান পো
অনুবাদঃ খসরু চৌধুরী

প্রকাশক
আরিফুর রহমান নাইম
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট, ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

দ্বিতীয় মুদ্রণ
এপ্রিল ২০১৭

প্রকাশকাল
মাঘ ১৪১৭
ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
দুইশত টাকা

THE NARRATIVE OF ARTHUR GORDON PYM
by Edgar Allan Poe.
Translated by Khasru Choudhury.
Published by Arifur Rahman Nayeem
Oitijjhya.
Date of Publication February 2011.

website: www.oitijjhya.com
Email: oitijjhya@gmail.com

Price: Taka 200.00 US$ 4.00
ISBN 978-984-8863-92-3

উৎসর্গ

দুলু ভাই
মাকছুদুর রহমান। টাউন লাইব্রেরি, নওগাঁ

আমার দুঃসময়ে তথাকথিত আপন মানুষদের চেয়ে
আপনি বরাবরই ছিলেন অনেক বেশি আপন

এডগার অ্যালান পো

এডগার অ্যালান পো। বিশ্বসাহিত্যের এক অত্যুজ্জ্বল হীরক। আশ্চর্য ব্যাপার হলো, জীবদ্দশায় ক্ষণজন্মা এই লেখক প্রায় কোনো স্বীকৃতিই পাননি। স্বল্পকালীন এক জীবনে (১৮০৯-১৮৪৯) তাঁর সর্বশেষ ছোটগল্পটা প্রকাশিত হবার পরও কেটে গেছে দেড়শো বছরের বেশি, অথচ আজও সেগুলো হয়ে আছে ছোটগল্পের মাস্টারপিস। পো ছিলেন আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক লেখা, ডিটেকটিভ গল্প, বিজ্ঞান কল্পকাহিনির জনক। আমেরিকান জনপ্রিয় লেখকেরা ভুল বুঝলেও, ইয়োরোপে পো-র প্রভাব ছিল অসামান্য, বিশেষ করে বোদলেয়ার, মালার্মে প্রমুখ ফরাসি প্রতীকীবাদী কবিদের ওপর। বোদলেয়ার তাঁর দ্বারা এতটাই প্রভাবিত ছিলেন যে তিনি তাঁর বেশকিছু সাহিত্যকর্ম অনুবাদ করেছিলেন ফরাসি ভাষায়। মানুষের মনের অন্ধকার দিক নিয়ে লেখার ক্ষেত্রে পো-র যে ধারা, সেই ধারাকে অনুসরণ করেছেন ন্যাথানিয়েল হথর্ন, অ্যামব্রোস বিয়ার্স এবং উইলিয়াম ফকনার।

১৮০৯ সালে পো জন্মগ্রহণ করেন আমেরিকার বোস্টন শহরে। বাবা-মা দুজনেই অভিনয় করতেন ভ্রাম্যমাণ নাট্য দলে। পো-র বয়স যখন মাত্র তিন (মতান্তরে দুই), তখনই মারা যান বাবা-মা উভয়েই। তারপর পো-কে গ্রহণ করেন ভার্জিনিয়ার রিচমন্ড শহরের ধনী তামাক ব্যবসায়ী জন অ্যালান। পালক পিতার সঙ্গে ইংল্যান্ডে থাকার সময় পো ভর্তি হন লন্ডনের ম্যানর স্কুলে। ১৮২০ সালে আমেরিকা ফিরে এসে পো ভর্তি হন ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু অর্থাভাবে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হয়। ১৮৩০ সালে পো ভর্তি হন ওয়েস্ট পয়েন্ট-এর মিলিটারি একাডেমিতে। ১৮৩১ সালে মিলিটারি একাডেমি থেকে পো বিতাড়িত হন অসম্মানজনকভাবে। ১৮৩৪ সালে তাঁর সঙ্গে যাবতীয় পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন পালক পিতা জন অ্যালান। অবশ্য তিনি তাঁকে কোনো দিনই আইনসম্মতভাবে দত্তক নেননি। ১৮৩৬ সালে পো বিয়ে করেন চৌদ্দ বছরের ভার্জিনিয়া ক্লেমকে। বিয়ের এগারো বছর পর যক্ষ্মায় ভার্জিনিয়ার মৃত্যু হয়। পো-র ভাঙা স্বাস্থ্যের ঘটে আরও অবনতি। ১৮৪৯ সালে, মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন কালজয়ী এই সাহিত্যিক, এবং তাঁকে বাল্টিমোর-এ সমাহিত করা হয় স্ত্রীর সমাধির পাশেই।

১৮৪৫ সালে পো সর্বপ্রথম দৃষ্টি কাড়েন *'দি র‍্যাভেন অ্যান্ড আদার পোয়েমস'* লিখে। ডব্ল্যু.বি.ইয়েটস তাঁকে বলেছেন 'সর্বদেশের সর্বকালের একজন মহান গীতিকবি'। তিনি সাহিত্য করেছেন অর্থ উপার্জনের মরিয়া তাগিদে এবং আবেগ প্রকাশের নিরুপায় খাতিরে। পো-র ভেতরে ছিল আত্মধ্বংসকারী এক দানবীয় প্রবণতা যা দারুণভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর *'দি ইম্প অব দি পারভার্স'*-এ, যে গল্পেরই অনেকটা বিস্তৃত রূপ আমরা পাই দস্তয়ভস্কির 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট'-এ।

পো ভুগতেন মৃত্যুর ভয়াবহ আতঙ্কে। সেই পথ ধরেই রচিত হয়েছে সুবিখ্যাত *'দি প্রিম্যাচিউর বেরিয়াল'*, যা তাঁর ভাষায় 'ভয়ংকরতম বিপজ্জনক অবস্থা'– আতঙ্ক, অতল অন্ধকার আর চরম অসহায়ত্বের শিকার মানুষকে নিয়ে নিখুঁতভাবে তিনি লিখেছেন *'দি ফল অব দি হাউস অব আশার'*, *'দি কাস্ক অব আমোনটিলাডো'*। আত্মজীবনীমূলক অসাধারণ গল্প *'উইলিয়াম উইলসন'*-এ প্রকাশিত হয়েছে পো-মানসের চিরন্তন দ্বন্দ্ব – আত্মবিধ্বংসী অবচেতন বনাম দায়িত্ববান শ্রদ্ধেয় চেতন, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা যেটাকে বলেন 'দুটো বিরোধী সত্তাবিশিষ্ট মানুষ'।

মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করার অসামান্য ক্ষমতাই পো-কে লিখিয়েছে সফল ডিটেকটিভ গল্প, আজ যে গল্পের ধারা খুবই জনপ্রিয়। পো-র ডিটেকটিভ সি.অগাস্ত দুপাঁ বিখ্যাত আর্থার কোনান ডয়েল, আগাথা ক্রিস্টি, ডরোথি লেই সেয়ার্স প্রমুখ সৃষ্ট ডিটেকটিভদেরই পূর্বসূরি। তাঁর বিরল রহস্যসন্ধানী ক্ষমতার ফলেই তিনি লিখতে পেরেছেন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চার জটিল রহস্য গল্প – *'দি মার্ডারস ইন দি রু মর্গ'*, *'দি মিস্ট্রি অব মেরি রোজেট'*, *'দি গোল্ড-বাগ'*, এবং *'দি পারলয়ন্ড লেটার'*। খাঁটি রহস্যপ্রিয় কোনো পাঠকের পক্ষে এই চারটে গল্প জীবনেও ভোলা সম্ভব নয়।

তাঁর *'দি ফ্যাক্টস ইন দি কেস অব এম.ভলডিমার'* এবং *'আ টেল অব দি র‍্যাগেড মাউনটেনস'* গল্পে আছে সম্মোহনবিদ্যা (মেসমেরিজম), *'দাউ আর্ট দি ম্যান'* গল্পে মায়াস্বর (ভেনট্রিলোকুইজম)। মহাশূন্য অভিযানমূলক গল্পে তিনি জুল ভার্নকেও হার মানিয়েছেন তাঁর *'দি আনপ্যারালেলড অ্যাডভেঞ্চার অব ওয়ান হ্যান্স ফাল'*-এ।

তাঁর একমাত্র উপন্যাস *'দি ন্যারেটিভ অব আর্থার গর্ডন পিম অব ন্যানটাকেট'* স্বয়ং জুল ভার্নকে এতটাই আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল যে তিনি লিখেছেন ওটার দ্বিতীয় পর্বমাফিক এক উপন্যাস।

পো-র অরিজিন্যালিটি তুলনাহীন, কল্পনাশক্তি অভাবনীয়, ডিটেইল ওয়ার্ক পাঠক-মনের ভিত কাঁপিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

পো-র ছিল অহেতুক এবং বিপথগামী কিছু সমালোচক। যেমন, এমারসনের মতো মনীষী তাঁকে বলেছেন 'জিংগল', অর্থাৎ 'ডুগডুগি বাদক'; অবশ্য এর ফলে এমারসনই ছোট হয়েছেন, পো-র আমেরিকার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার হওয়া আটকায়নি।

গত দেড়শো বছরেরও বেশি সময় ধরে জাত পাঠককে সম্মোহিত করে রেখেছেন এডগার অ্যালান পো, এবং আমার বিশ্বাস, কালজয়ী এই লেখক সম্মোহিত করবেন আগামী আরও অনেক শতাব্দী।

খসরু চৌধুরী
১ সেপ্টেম্বর, ২০০৮

ভূমিকা

দক্ষিণ সাগরে অসাধারণ বেশকিছু অভিযান শেষ করে, কয়েক মাস আগে আমেরিকা ফিরে আসতে, ঘটনাচক্রে পরিচিত হলাম রিচমন্ডের কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে, যাঁরা গভীর আগ্রহ দেখালেন দক্ষিণ সাগর অঞ্চল নিয়ে, আর বারবার অনুরোধ করে বলতে লাগলেন যে বিবরণের মাধ্যমে দুঃসাহসিক অভিযানগুলো জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমার কর্তব্যের মাঝে পড়ে। বেশ কয়েকটা কারণে আমি প্রথমটায় রাজি হলাম না। সেগুলোর মাঝে একটা হলো, অভিযানের বেশির ভাগ বিবরণই আমি কোথাও লিখে রাখিনি। এখন কেবল স্মৃতি থেকে লিখতে গেলে আমার বিবরণ হয়ে যেতে পারে অতিরঞ্জিত ; প্রতিদিনের বিবরণের সহায়তা ছাড়া লিখলে প্রায় সব লেখকই একরকম অতিরঞ্জন করতে বাধ্য। আরেকটা কারণ, ঘটনা প্রবাহ এতটাই চমকপ্রদ আর অত্যাশ্চর্য যে আমার ওপরে স্থির বিশ্বাস আছে এমন গুটিকয় আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধব ছাড়া এই বিবরণ বিশ্বাস করতে পারেন সেই জাতীয় কিছু হাতেগোনা মানুষ যাঁদের রয়েছে সবল যুক্তি। বেশির ভাগ সাধারণ পাঠকের পক্ষেই এরকম ভাবা খুব সম্ভব যে আমি ফেঁদে বসেছি এক আষাঢ়ে উপন্যাস। ঘটনাপ্রবাহের সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে রয়ে গেছি আমি একা (অবশ্য দোআঁশলা এক ইন্ডিয়ান ছাড়া)। আর, রিচমন্ডের ভদ্রলোকদের অনুরোধের পর অনুরোধ উপেক্ষা করার সবচেয়ে বড় কারণ হলো, লেখালিখি বিষয়ে আমার অক্ষমতা, লেখক হিসেবে নিজের ওপর আস্থা আমার একেবারেই নেই।

আমার অভিযানের ব্যাপারে, বিশেষ করে যেগুলো ঘটেছে কুমেরু সাগর অঞ্চলে, সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখালেন মি.পো। আমার উল্লিখিত ভদ্রলোকদের মতোই তিনিও বাস করেন ভার্জিনিয়ার রিচমন্ডে, সেই সঙ্গে তিনি সেই শহর থেকে মি.টমাস ডব্ল্যু.হোয়াইট কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা, সাদার্ন লিটারারি মেসেঞ্জারের সম্পাদক। তিনি পরামর্শ দিলেন, আমি যেন আর এক মুহূর্তও নষ্ট না করে অভিযানের সম্পূর্ণ বিবরণ লিখে ফেলি; চমৎকার বাকচাতুর্যে বুঝিয়ে দিলেন, পাঠককে অতটা বোকা না ভেবে তাদের বোধশক্তির ওপর ভরসা রাখাই ভালো, আর আমার লেখা যদি কুৎসিতও হয়, একসময় সমস্ত আবরণ ভেদ করে তার ঝলকানিতে চারপাশ উদ্ভাসিত হবেই, কারণ, কোনো শক্তিই সত্যকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না।

কিন্তু তাঁর এই পীড়াপীড়ি আর সৎ পরামর্শ সত্ত্বেও মনস্থির করতে পারলাম না আমি। শেষমেশ তিনি একদিন প্রস্তাব দিলেন (এতকিছুতেও আমার কোনো রকম হেলদোল না দেখে) যে আমারই সরবরাহকৃত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযানের প্রথম দিকের বিবরণগুলো না হয় তিনিই লিখে দেবেন, আর সাদার্ন মেসেঞ্জারে ছাপবেন তা উপন্যাসের পোশাক পরিয়ে। তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করলাম এই শর্তে যে উপন্যাস হোক আর যা-ই হোক, সেখানে আমার মূল নাম পরিবর্তন করা যাবে না। ১৮৩৭ সালের জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি মাসে মেসেঞ্জারের পর পর দুটো সংখ্যায় প্রকাশিত হলো ভানধারী উপন্যাসটার দুটো কিস্তি। আর, ওটা যে আসলেই বানোয়াট একটা উপন্যাস, পাঠকের মনে সেই ধারণা বদ্ধমূল করাতে মি.পো-র নামই রাখা হলো পত্রিকার সূচিতে।

ছলনাটা কোনো কাজেই লাগল না দেখে অবশেষে মনস্থির করলাম, অভিযানের বাদবাকি পর্বগুলো লিখব আমি নিজেই। উপন্যাসের রংবেরঙের পোশাক (মূল ঘটনা এতটুকু পরিবর্তন বা বিকৃত না করে) পাঠককে ভোলাতে পারল না। তারা মনে করল বিবরণের প্রত্যেকটা বর্ণ সত্য, এমনকি সেসব ধারণার উল্লেখ করে তারা চিঠিও লিখল মি.পো-র ঠিকানায়। সেজন্যেই ঠিক করলাম, আমি নিজে যদি সত্য ঘটনাগুলোকে অবিকল লিখে যাই, পাঠকেরা অন্তত অবিশ্বাসের বোঝা চাপিয়ে দেবে না আমার ওপর।

অভিযানের এই বিবরণের কতটা মি.পো-র লেখা আর কতটা আমার তা খুঁজে পেতে মোটেই ঝামেলা পোহাতে হবে না। এমনকি যাঁরা কখনো মেসেঞ্জার পত্রিকা পড়েননি, সেসব পাঠকও স্টাইলের পার্থক্য দেখে সহজেই বুঝতে পারবেন যে কোথায় লেখা শেষ করেছেন মি.পো আর শুরু করেছি আমি।

এ.জি.পিম
নিউ ইয়র্ক, জুলাই, ১৮৩৮

অধ্যায় ১

আমার নাম আর্থার গর্ডন পিম। বাবা ছিল ন্যানটাকেটের সাগর থেকে সংগ্রহযোগ্য দ্রব্যাদির এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী, আর এই শহরটাতেই আমার জন্ম। দাদা ছিল সর্বজনশ্রদ্ধেয় একজন অ্যাটর্নি, আইনজীবী হিসেবে প্রচুর আয়ের পাশাপাশি সে আবার সফল হয়েছিল এডগারটন নিউ-ব্যাংকের শেয়ার কিনে। পৃথিবীতে আমাকেই সে ভালোবাসত সবচেয়ে বেশি, ফলে এটা একরকম প্রত্যাশিতই ছিল যে আমিই হব বুড়োর সম্পদের বেশির ভাগের উত্তরাধিকারী। ছয় বছর বয়সে দাদা আমাকে পাঠিয়েছিল বুড়ো মি.রিকেটসের স্কুলে। নিউ বেডফোর্ডের সবাই চিনত একটামাত্র হাতঅলা, খামখেয়ালি মানুষটাকে। ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত তার স্কুলে থাকার পর আমি গেলাম পাহাড়ের ওপরের মি.ই.রোনাল্ডের অ্যাকাডেমিতে। সেখানে আমি অন্তরঙ্গ হলাম সাগরে চলাচলকারী জাহাজের ক্যাপটেন মি.বার্নার্ডের ছেলের সঙ্গে। নিউ বেডফোর্ডে মি.বার্নার্ডও ছিল সুপরিচিত। আমি নিশ্চিত, তার অনেক আত্মীয়স্বজন ছিল এডগারটনে। তার ছেলের নাম অগাস্টাস, বয়সে সে আমার চেয়ে প্রায় দুই বছরের বড়। একবার তার বাবার সঙ্গে জন ডোনাল্ডসন জাহাজে সে গিয়েছিল তিমি শিকার অভিযানে, আর সেখান থেকে ফিরে আমাকে শুনিয়েছিল দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের সব অভিযানের গল্প। প্রায় যেতাম তার বাড়িতে, আর থাকতাম সারাদিন, কখনো কখনো সারারাত। থাকতাম আমরা একই বিছানায়, আর ভোরের আলো ফোটার আগ পর্যন্ত সে আমাকে ঘুমোতে দিত না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে যেত তিনিয়ান দ্বীপের আদিবাসী আর তার অন্যান্য সব ভ্রমণের গল্প। শুনতে শুনতে অবশেষে আগ্রহী হয়ে উঠলাম একসময়, আমার ভেতরেও জাগল সাগর অভিযানের আকুলতা। আমার ছিল এরিয়েল নামের একটা পালতোলা

নৌকা, দাম প্রায় পঁচাত্তর ডলার। ওটার ছিল একটা হাফ ডেক, যেখানে দশজন মানুষের জায়গা অনায়াসেই হতে পারে। আমরা দুজন ওটায় চেপে মাঝেসাঝেই বেরিয়ে পড়তাম উন্মাদনাময় এমন সব সাগর অভিযানে যে এখন ভাবলে অবাক লাগে, আজও আমি বেঁচে আছি কীভাবে !

মূল অভিযানের লম্বা বিবরণ শুরু করার আগে ভূমিকা স্বরূপ আমি দেব সেসব অভিযানের একটা বিবরণ। মি.বার্নার্ডের বাড়িতে এক রাতের পার্টির শেষদিকে বেশ মাতাল হয়ে পড়লাম আমি আর অগাস্টাস। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত যা করি, বাড়ি না ফিরে শুয়ে পড়লাম তার বিছানায়। ভাবলাম, সে ঘুমিয়ে পড়েছে (পার্টি শেষ হয়েছিল প্রায় রাত একটায়), নেশা হয়ে যাওয়ার ফলে আজ আর তার প্রিয় অভিযানের গল্প বলার অবস্থায় নেই। শুয়ে পড়ার আধ ঘণ্টা মতো পর কেবল একটা ঝিমুনির ভাব এসেছে, হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বসে মারাত্মক এক শপথ নিয়ে সে বলল যে যখন এত চমৎকার বাতাস বইছে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে, পুরো খ্রিষ্টান জগতের কোনো আর্থার পিমের মতো সে পড়ে পড়ে ঘুমোতে চায় না। জীবনে এত অবাক আমি কখনো হইনি, সে ঠিক কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে ভাবলাম, ওয়াইন আর কড়া মদ তাকে বেসামাল করে ফেলেছে। কিন্তু সে খুবই স্বাভাবিক স্বরে বলল যে আমি তাকে যতই মাতাল ভাবি না কেন, আজ রাতেই সে সবচেয়ে ঠান্ডা মাথায় আছে। এত সুন্দর একটা রাতে সে কেবল বিছানায় শুয়ে শুয়ে ক্লান্ত, আর তাই এক্ষুণি উঠে কাপড় পরে নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে চায় আনন্দময় একটা ভ্রমণে। কথাগুলো কানে আসা মাত্র দারুণ এক পুলকে রোমাঞ্চিত হলো আমার সর্বাঙ্গ, তার পাগলামিকেই মনে হলো পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুক্তিপূর্ণ এক উপভোগ্য কল্পনা। তখন অক্টোবরের শেষাশেষি, আবহাওয়া বেশ ঠান্ডা, বাতাস তো নয় যেন ঝড় বইছে। লাফিয়ে বিছানা ছাড়লাম অসহনীয় এক উল্লাসে, বললাম যে আমিও তার মতোই সাহসী, শুয়ে শুয়ে তার মতোই ক্লান্ত, আর ন্যানটাকেটের যে কোনো অগাস্টাস বার্নার্ডের মতো আনন্দময় ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

যথা শিগগির পোশাক পরে দৌড়ালাম আমরা নৌকার উদ্দেশে। ওটা বাঁধা ছিল পুরনো জেটিতে, প্যাঙ্কি অ্যান্ড কোং-এর কাঠগুদামের পাশে। উঠে পড়ল অগাস্টাস আর সেচে সেচে ফেলে দিল ওটায় জমে-যাওয়া-পানি। তারপর পাল তুলে দুজনে বেরিয়ে পড়লাম খোলা সাগরে।

আগেই বলেছি, জোরালো বাতাস বইছিল দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে। কনকনে ঠান্ডা পরিষ্কার রাত। হাল ধরল অগাস্টাস, আমি রইলাম মাস্তুলের

পাশে। নৌকা ছুটে চলেছে তীরবেগে – জেটি থেকে রওনা দেওয়ার পর আমরা আর মুখ খুলিনি। এবার আমি বন্ধুর কাছে জানতে চাইলাম, সে চলেছে কোথায় আর ফিরতেই বা আমাদের কতক্ষণ লাগবে। কয়েক মিনিট জবাব না দিয়ে সে কেবল শিস দিল, আর তারপর বলল, 'আমি চলেছি মাঝ সাগরে – ইচ্ছে হলে তুমি বাড়ি ফিরে যেতে পার।' বুঝতে পারলাম, বাইরে একটা শান্ত ভাব ধরে রাখলেও সে এখন দারুণ উত্তেজিত। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেলাম – শ্বেতপাথরের চেয়েও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার মুখ, হাত এত কাঁপছে যে হালটাও ধরে রাখতে পারছে না ঠিক মতো। ভুলভাল কিছু একটা ঘটেছে ভেবে আমিও হয়ে পড়লাম দারুণ শঙ্কিত। সেসময় আমি তেমন নৌকা চালানো জানতাম না, ফলে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হলো বন্ধুর দক্ষতার ওপর। বাতাসের বেগ আরও বেড়ে যাওয়ায় নৌকা ছুটেছে আরও জোরে – তবু ভয় প্রকাশ করতে লজ্জা লাগল, চুপচাপ রইলাম প্রায় আধ ঘণ্টা। কিন্তু তারপর আর পারলাম না, অগাস্টাসকে বললাম যে এবার বাড়ি ফিরে গেলে কেমন হয়। আগের মতোই, জবাব না দিয়ে চুপচাপ রইল অগাস্টাস মিনিটখানেক। শেষমেশ বলল, 'এত তাড়া কিসের, হাতে রয়েছে প্রচুর সময় – বাড়ি একসময় ফিরলেই হবে – এত তাড়া কিসের।' এই ধরনের জবাবই আশা করছিলাম তার কাছ থেকে, তবু তার স্বরে এমন একটা কিছু ছিল যা আমাকে কাঁপিয়ে তুলল অবর্ণনীয় এক আতঙ্কে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম তার দিকে। ঠোঁট ধারণ করেছে সিসের মতো রং, হাঁটু এত জোরে কাঁপছে যেন দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিও তার আর নেই। 'হায় ঈশ্বর, অগাস্টাস,' এবার খাঁটি আতঙ্কের চিৎকার বেরিয়ে এল আমার গলা চিরে, 'কী হয়েছে তোমার ? – ব্যাপার কী বলো তো ? – কী করতে চাও তুমি ?' 'ব্যাপার !' তোতলাতে লাগল সে, হাত থেকে তার ছুটে গেল হাল, আর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে নৌকার তলায় – 'ব্যাপার – ব্যাপার আবার কী – বাড়ি ফিরে যাচ্ছি – দে – দে – দেখতে পাচ্ছ না ?' মুহূর্তের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু। সামনে ছুটে গিয়ে তুলে ধরলাম তাকে। সে এখন মাতাল – পাঁড় মাতাল – দাঁড়ানো, কথা বলা, কিংবা দেখার ক্ষমতাটুকুও তার আর অবশিষ্ট নেই। চকচক করছে চোখজোড়া, হতাশায় তাকে ছেড়ে দিতেই গড়িয়ে পড়ল সে কাঠের একটা গুঁড়ির মতো। আমি যতটা ভেবেছি, পার্টিতে সে মদ গিলেছে তার চেয়ে অনেক বেশি, আর বিছানায় তার আচরণ চূড়ান্ত মাত্রার মাতলামিরই একটা স্তর – বাইরে বাইরে একদম স্বাভাবিক থাকা। এখন রাতের ঠান্ডা বাতাসে উবে গেছে তার ছদ্ম-স্বাভাবিকতা,

মানসিক শক্তির তলানিটুকুও পরাজিত হয়েছে মদের নেশার কাছে। চেতনা লুপ্ত হয়েছে তার সম্পূর্ণভাবে যা কয়েক ঘণ্টার আগে ফিরবে বলে মনে হয় না।

আমার সেসময়ের আতঙ্কের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। নেশা পুরো কেটে যাওয়ায় ভয় আরও বাড়ল। নৌকা চালানো আমার সাধ্যের বাইরে, ওদিকে ঝোড়ো বাতাস আর স্রোতের প্রবল টানে এগিয়ে চলেছি নিশ্চিত ধ্বংস অভিমুখে। পেছনে পুঞ্জীভূত হচ্ছে তীব্র একটা ঝড় ; আমাদের না আছে কম্পাস না আছে খাবার ; আর এভাবে ছুটতে থাকলে দিনের আলো ফোটার আগেই মিলিয়ে যাবে ডাঙার রেখা। এসব চিন্তার পাশাপাশি ভয়াবহ আরও অনেক দুশ্চিন্তা আমাকে প্রায় অসাড় করে ফেলল। প্রচণ্ড বেগে ছোটার ফলে নৌকার গলুই পুরোটাই তলিয়ে গেছে ফেনার নিচে। আগেই বলেছি, হাল ছুটে গিয়েছিল অগাস্টাসের হাত থেকে, আর মানসিক অস্থিরতায় আমিও সেটা তুলে নিইনি, তবু নৌকা যে ডুবে যায়নি এটা এক বিরাট বিস্ময়। ধীরে ধীরে মানসিক স্থিরতা ফিরে পেলাম আমি। তখনো বেড়ে চলেছে বাতাসের বেগ ; যখনই আমরা উঠে পড়ছি ঢেউয়ের মাথায়, সাগরের পানি ছিটকে এসে পড়ছে নৌকার ওপর। অসাড় হয়ে অনুভূতি প্রায় লোপ পেয়েছিল আমার। অবশেষে সাহস ফিরে পেলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে মূল মাস্তুলের কাছে ছুটে গিয়ে খুলে দিলাম পাল। যা ভেবেছিলাম, পাল সামনে আছড়ে পড়ল গলুইয়ের ওপর, আর পানিতে ভিজে ভারী হয়ে ভেঙে ফেলল মাস্তুল। এই দুর্ঘটনা আমাকে রক্ষা করল তাৎক্ষণিক ধ্বংসের হাত থেকে। একমাত্র তেকোনা পাল নিয়ে নৌকা ছুটল তরতর করে, কিন্তু মৃত্যুর আতঙ্ক থেকে আপাতত রেহাই পেলাম। হাল ধরতে বুঝতে পারলাম, বাঁচার একটা সুযোগ এখনো আছে। জ্ঞানহীন অগাস্টাস তখনো পড়ে আছে নৌকার তলে ; যেহেতু তার ডুবে মরার আশঙ্কা আছে (যেখানটায় সে পড়েছিল, সেখানকার পানি এখন প্রায় এক ফুট গভীর), তাকে পানি থেকে কিছুটা তুলে, কোমরে রশি পেঁচিয়ে, রাখলাম বসার ভঙ্গিতে, তারপর রশিটা বাঁধলাম নৌকার একটা আংটার সঙ্গে। ঠান্ডায় থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে যথাসাধ্য করলাম আমি, তারপর ঈশ্বরের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে, মনস্থির করলাম যে ভাগ্যে যা-ই ঘটুক মোকাবিলা করব তা সর্বশক্তিতে।

মানসিক এই স্থিরতা ফিরে পেতে না পেতেই নৌকার চারপাশ যেন ভেঙে পড়ল ভয়াবহ এক শব্দে, যেন হঠাৎ একসঙ্গে গর্জে উঠেছে হাজারটা দানব। আতঙ্কিত সেই অনুভবের কথা আমি সারা জীবনেও ভুলব না।

সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল আমার মাথার চুল – শিরায় শিরায় জমাট বাঁধল রক্ত – বন্ধ হয়ে গেল যেন হৃৎস্পন্দন, আমার আতঙ্কের উৎস দেখার জন্যে মাথা তোলার আগেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লাম অজ্ঞান অগাস্টাসের ওপর।

জ্ঞান ফিরতে দেখলাম, শুয়ে আছি আমি ন্যানটাকেটগামী বিরাট এক তিমি শিকারি জাহাজের (পেঙ্গুইন) কেবিনে। আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেশ ক'জন লোক, আর মড়ার চেয়েও ফ্যাকাশে মুখে ঝুঁকে পড়ে ঘষে ঘষে আমার হাত গরম করার চেষ্টা চালাচ্ছে অগাস্টাস। আমাকে চোখ মেলতে দেখে ছাড়ল সে এক আনন্দিত চিৎকার, ঘিরে থাকা রুক্ষ চেহারার লোকগুলোর মুখে ফুটল হাসি, এমনকি চোখও মুছল কেউ কেউ। এখনো কীভাবে বেঁচে আছি সে রহস্য জানতে পারলাম শিগগিরই। সবক'টা পাল তুলে ন্যানটাকেটের দিকে ছুটে আসা তিমি শিকারি জাহাজটা উঠে পড়েছিল আমাদের নৌকার ওপর। ডেকে দাঁড়িয়ে সামনে চোখ রেখেছিল অনেকেই, কিন্তু প্রবল ঝড়ের মাঝে আমাদের খুদে নৌকাটাকে লক্ষ করতে পারেনি – তারপর দেখতে পেয়েছে যখন তখন সংঘর্ষ এড়ানোর আর কোনো উপায় নেই – নাবিকদের সম্মিলিত সাবধানী চিৎকারকেই আমার মনে হয়েছে দানবীয় গর্জন। অতবড় জাহাজ আর ঝড়ের হুঙ্কারের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল নৌকা ভাঙার শব্দ। আমাদের নৌকাটায় কোনো পাল তোলা না থাকায় ক্যাপটেন (নিউ লন্ডনের ই.টি.ভি.ব্লক) ভাবল, অকেজো হয়ে পড়ায় ওটাকে কেউ ভাসিয়ে দিয়েছে স্রোতের মুখে, আর তাই জাহাজটাকে নির্দিষ্ট পথেই এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে ঠিক করল। সৌভাগ্যক্রমে, পাহারাদার দুই নাবিক শপথ করে বলল যে নৌকাটায় তারা মানুষ দেখেছে, চেষ্টা চালালে এখনো তাকে উদ্ধার করা সম্ভব। ক্ষিপ্ত হয়ে ক্যাপটেন বলল, 'সাগর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ডিমের খোলা রক্ষা করার দায়িত্ব আমার নেই, আর ওই নৌকাতে যদি কেউ থেকেও থাকে, অনেক আগেই সে তলিয়ে গেছে গভীর পানির অতলে।' ক্ষিপ্ত হলো ফার্স্ট মেট হেন্ডারসন, নাবিকেরাও রেগে গেল ক্যাপটেনের হৃদয়হীন ঔদ্ধত্যে। ফার্স্ট মেট বলল যে আদেশ অমান্য করার অপরাধে তীরে নামার সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছে হলে ক্যাপটেন তাকে ফাঁসি দিতে পারে, তবু এই মুহূর্তে জাহাজ পরিচালনার ভারটা সে তুলে নিতে চায় নিজের হাতে। ব্লককে একপাশে ঠেলে সরিয়ে (কাগজের মতো ফ্যাকাশে মুখে কোনো জবাব দিল না ক্যাপটেন), হাল তুলে নিয়ে, আদেশ দিল সে। নাবিকেরা ছুটল যে যার অবস্থানে। এত কাণ্ড ঘটে গেল মাত্র

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে – তবে তখনো তাদের কেউই জানে না যে নৌকার কোনো আরোহীকে রক্ষা করা সম্ভব হবে কি না। যা-ই হোক, পাঠক বুঝতেই পারছেন, রক্ষা পেলাম আমি আর অগাস্টাস দুজনেই ; আর এভাবে রক্ষা পাওয়া একমাত্র তখনই সম্ভব হয় যখন হস্তক্ষেপ করেন স্বয়ং ঈশ্বর।

একটা জলি-বোট নিয়ে জাহাজ থেকে নেমেছিল হেন্ডারসন, সম্ভবত সেই দুজন নাবিকসহ। জাহাজ হঠাৎ একপাশে কাত হওয়ায় উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় তারা দেখতে পেল, চকচকে তলায় (পেঙ্গুইনের তলা তামা দিয়ে বাঁধানো) অদ্ভুত ভঙ্গিতে গেঁথে আছে একটা মানুষের দেহ আর আলতোভাবে আছাড় খাচ্ছে ঢেউয়ের তালে তালে। বলা বাহুল্য, দেহটা আমার। নৌকার ওপর দিয়ে জাহাজটা চলে যাবার সময় কাঠের একটা খিল তামা ভেদ করে, আমার মোটা পশমি সবুজ জ্যাকেটের কলার ফুটো করে, ঘাড়ের পেছনের দুই কণ্ডরার মাঝখান দিয়ে ঢুকে যায় ডান কানের ঠিক নিচে, আর দেহটাকে গেঁথে ফেলে তলার সঙ্গে। উদ্ধার করার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে শুইয়ে দেওয়া হয় বিছানায় – যদিও তখন কেউই মনে করেনি যে আমি বেঁচে আছি। জাহাজে কোনো সার্জন ছিল না। তবে প্রাণপণে আমার সেবা করতে লাগল ক্যাপটেন, সম্ভবত নাবিকদের তার জঘন্য আচরণটার কথা ভুলিয়ে আপন ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে।

জলি-বোট নিয়ে আবার খোঁজ করতে নামল হেন্ডারসন। সাধারণ ঝড় ততক্ষণে রূপ নিয়েছে হ্যারিকেনে। নৌকার ভাঙা টুকরোগুলোর মাঝে বেশ কিছুক্ষণ অনুসন্ধান চালাবার পর সঙ্গের একজন নাবিক বলল, হ্যারিকেনের গর্জনের ফাঁকে থেমে থেমে সাহায্য চেয়ে চিৎকার করছে কে যেন। কষ্টসহিষ্ণু নাবিকেরা আবার অনুসন্ধান চালাল আধ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে, ওদিকে জাহাজে ফিরে যাবার জন্যে বারবার তাড়া দিচ্ছে ক্যাপটেন ব্লক ; সাগর যেরকম উত্তাল হয়ে উঠেছে, হেন্ডারসনদের ছোট্ট নৌকা যে কোনো সময় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। অত ছোট একটা জলি-বোট অতক্ষণ বিক্ষুব্ধ সাগরে থাকার পরেও যে ধ্বংস হয়ে যায়নি এটাও এক আশ্চর্য ব্যাপার। নৌকাটা অবশ্য তিমি শিকারি জাহাজে ব্যবহারের উপযুক্ত করেই নির্মিত হয়েছিল। এয়ার-বক্স ব্যবহার করে নির্মিত এই ধরনের ছোট অথচ ভীষণ শক্ত কিছু লাইফ-বোট দেখেছি আমি ওয়েলসের উপকূলে।

ব্যর্থ অনুসন্ধানের পর যখন তারা কেবল ফিরে যেতে চাইছে জাহাজে, তাদের পাশে ভাসমান গাঢ় রঙের এক বস্তুর ভেতর থেকে ভেসে এল দুর্বল একটা চিৎকার। ওটা ছিল এরিয়েলের পুরো ডেক, আর তার ভেতরেই রশি

বাঁধা অবস্থায় ছটফট করছিল অগাস্টাস। কোমরে রশি পেঁচিয়ে, আমিই বেঁধে রেখেছিলাম আংটার সঙ্গে, ফলে রক্ষা পেয়েছিল তার জীবন।

পেঙ্গুইনে তোলার একঘণ্টারও বেশি পরে সে দিল দুর্ঘটনার বর্ণনা। সংঘর্ষের পর পানিতে তলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ফিরে পেল সে, অকল্পনীয় বেগে বনবন করে পাক খেতে খেতে কেবল এটুকু বুঝতে পারল যে একটা রশি তিন-চার প্যাঁচ দিয়ে বাঁধা রয়েছে তার ঘাড়ের কাছে। এসময় দ্রুত ওপর দিকে উঠে কিসের সঙ্গে যেন জোরে ঠুকে গেল তার মাথা, আর জ্ঞান হারাল সে আবার। নতুন করে চেতনা ফিরে পেতে অনেকক্ষণ তালগোল পাকিয়ে রইল তার বুদ্ধি, তারপর ধীরে ধীরে বুঝতে পারল যে ঘটে গেছে ভয়ংকর কোনো দুর্ঘটনা, সে এখন পানিতে, তবে মাথাটা ভেসে রয়েছে পানির ওপর ; অগাস্টাস অনুভব করল, যতক্ষণ এভাবে মাথা ভেসে থাকবে অন্তত ততক্ষণ তাকে মরতে হবে না। এই অবস্থার ফাঁকে ফাঁকে রক্ষা পাবার জন্যে চিৎকার করেছে সে।

আমি সুস্থ হলাম সাড়ে তিন ঘণ্টা পর। অগাস্টাসই পরামর্শ দিয়েছিল, গরম তেলে ফ্লানেল ভিজিয়ে আমার হাত ঘষা হোক জোরে জোরে। আমার ঘাড়ের ক্ষতটা দেখতে ভয়ংকর হলেও আসলে মারাত্মক কিছু ছিল না।

পেঙ্গুইন বন্দরে ভিড়ল পরদিন সকাল নয়টায়। যথাসময়েই আমরা যোগ দিতে পারলাম মি.বার্নার্ডের নাস্তার টেবিলে – গতরাতের পার্টির ফলে, সৌভাগ্যক্রমে, যে নাস্তা শুরু হয়েছিল খানিকটা দেরিতে। নাবিকেরা শহরে বলে বেড়াল যে তাদের জাহাজের সঙ্গে একটা নৌকার সংঘর্ষে ডুবে মরেছে সেটার তিরিশ-চল্লিশজন আরোহী, তবে নাবিকদের সেই ফুলানো-ফাঁপানো গল্প শুনে আমাদের বন্ধুবান্ধবদের কেউই সামান্যতম সন্দেহও করল না যে দুর্ঘটনায় পতিত নৌকাটার নাম এরিয়েল এবং সেটায় ছিলাম আমি আর অগাস্টাস। আমরা দুই বন্ধু অবশ্য প্রায়ই আলোচনা করেছি ওই ঘটনা নিয়ে, আর প্রত্যেক বারই কেঁপে উঠেছি আতঙ্কে। অগাস্টাস স্বীকার করেছে, ছোট নৌকাটায় যখন প্রথম সে টের পেয়েছে তার নেশার পরিমাণ, আর অনুভব করেছে যে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে যাচ্ছে নেশার ঘোরে, সেই মুহূর্তের চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক হতাশার অভিজ্ঞতা জীবনে তার আর কখনোই হয়নি।

অধ্যায় ২

কোনো পূর্ব ধারণা নিয়েই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, তা যুক্তি সেই ধারণার স্বপক্ষেই থাকুক কিংবা বিপক্ষে। ধরে নেওয়া যেতে পারে, এইমাত্র যে বিপর্যয়ের বর্ণনা দিলাম, তার ফলে সাগরের প্রতি আমার টান কমে গিয়েছিল। আসলে ঘটনা ঘটল উল্টো, অলৌকিকভাবে রক্ষা পাবার সাত দিনের মাঝেই নাবিকদের মতো আকুল হয়ে উঠলাম বুনো অভিযানের জন্যে। সাত দিন আগের ঘটনাটার প্রাণ নিয়ে টানাটানির অংশটুকু হয়ে পড়ল অস্পষ্ট আর ছায়াচ্ছন্ন, কিন্তু অভিযানের অংশটুকু উজ্জ্বল হয়ে মনের পর্দায় বুলোতে লাগল রংবেরঙের তুলি। প্রতিদিনই জোরদার হয়ে উঠল অগাস্টাসের সঙ্গে আমার অভিযানের আলাপ। তার সব গল্পই সাগর অভিযানের গল্প (এখন সন্দেহ হয়, সেগুলোর অর্ধেকেরও বেশিই ছিল বানোয়াট), আর তার বলার ঢং আমার মনকে আরও আগ্রহী করে তুলত অভিযানের দিকে, চমৎকারভাবে মানিয়ে যেত আমার বিষণ্ন অথচ ভাবাবেগপূর্ণ কল্পনার সঙ্গে। আমার মনের গতি লক্ষ করেই সম্ভবত গল্পে সে বেশি করে ফোটাত নাবিক জীবনের ছবি। তার গল্পের আলোয় ভরা অংশের প্রতি আমার তেমন টান ছিল না। আমার মনে ভেসে উঠত কেবল জাহাজ ধ্বংস হয়ে যাওয়া আর দুর্ভিক্ষের দৃশ্য ; বর্বরদের হাতে বন্দী হওয়া বা মৃত্যুর দৃশ্য ; অজানা, অতি দুর্গম এক মহাসাগরের ধূসর আর নির্জন কোনো পাহাড়ে দুঃখ পেয়ে আর চোখের পানি ফেলে সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়ার দৃশ্য। তখন থেকেই জেনেছি যে এসব দৃশ্য বা আকুলতা – হ্যাঁ, এসব তখন আর দৃশ্য ছিল না, চলে গিয়েছিল আকুলতার পর্যায়ে – বিষণ্নতায় ডুবে থাকা অসংখ্য মানুষকে ঘিরে রাখে – আর যখনকার কথা বলছি তখন গল্প শুনতে শুনতে মনে হতো গল্পের মাধ্যমে সে যেন আমাকে শোনাচ্ছে আমারই ভবিষ্যৎ, এসব যেন আমার জীবনে কখনো না কখনো ঘটবেই ঘটবে

আমার মানসিক যে অবস্থা তার ভেতরে পুরোপুরিই ঢুকে পড়েছিল অগাস্টাস। হতে পারে যে আমাদের দুজনের চরিত্রগত যে সাদৃশ্য, তার ফলেই আমরা পরস্পর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও সফল হয়েছিলাম।

এরিয়েলের মারাত্মক দুর্ঘটনার প্রায় আঠারো মাস পর লয়েড অ্যান্ড ভ্রেডেনবার্গ ফার্মকে (আমার বিশ্বাস, ফার্মটা কোনোভাবে লিভারপুলের মঁসিয়ে এন্ডারবির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল) নিযুক্ত করা হলো গ্রামপাস জাহাজটাকে মেরামত করে আবার তিমি শিকার অভিযানের উপযোগী করে তোলার কাজে। জাহাজটা ছিল খুবই পুরনো, ফলে যাবতীয় কেরামতি খাটানোর পরেও ওটাকে ঠিক সাগর অভিযানের উপযুক্ত করে তোলা গেল না। আমি জানি না ওই মালিকের অধীনে আরও অনেক ভালো ভালো জাহাজ থাকতে এই বুড়ো জাহাজটাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল কেন– কিন্তু ঘটনা ঘটেছিল এরকমই। জাহাজ পরিচালনার ভার পড়ল মি.বার্নার্ডের ওপর আর তার সঙ্গে যাবে অগাস্টাস। গ্রামপাস যখন অভিযানের জন্যে তৈরি হচ্ছিল, সে আমাকে বারবার বলতে লাগল যে ভ্রমণের জন্যে আমার যে আকুলতা তা মিটিয়ে নেওয়ার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। তার কথাগুলো শুনতে আমার বেশ ভালোই লাগল– তবে এটাও বুঝলাম যে ব্যাপারটা অত সহজ হবে না। বাবা সরাসরি বাধা দিল না ; কিন্তু মা অভিযানের কথা শোনামাত্র চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলল ; আর, যার সমর্থন আশা করেছিলাম সবচেয়ে বেশি, সেই দাদা বলল যে প্রসঙ্গটা যদি দ্বিতীয় বার তুলি তাহলে সম্পত্তির একটা শিলিংও আর আমার ভাগ্যে জুটবে না। যাই হোক, এসব বাধা আমার আকুলতাকে কমানোর পরিবর্তে আরও বাড়িয়ে তুলল। দৃঢ়সঙ্কল্প হলাম, যত বাধা-বিপত্তিই আসুক অভিযানে আমি যাবই ; আর, মনোভাবটা অগাস্টাসকে জানিয়ে দেওয়ার পর দুজনে শুরু করলাম পরিকল্পনা সফল করার জোগাড়যন্ত্র। ইতিমধ্যে অভিযান সম্বন্ধে আর কোনোরকম আলোচনা করলাম না আমার কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে, আর, পড়াশোনায় ডুবে যাবার এমন ভান করলাম যে তারা হাঁফ ছেড়ে ভাবল, সাগর অভিযানের ভূত আমার ঘাড় থেকে নেমে গেছে। পরে অনেক বার অবাক হয়ে ভেবেছি যে সবার চোখে আমি ধুলো দিতে পেরেছিলাম কীভাবে ! অভিযানে যাবার জন্যে দীর্ঘকাল ধরে আমার ভেতর জ্বলছিল যে আগুনের শিখা তাকে নেবানোর জন্যে আমার প্রত্যেকটা কথা প্রত্যেকটা আচরণকে ঢেকে দিলাম কপটতার আবরণে।

সবার চোখে ধুলো দেওয়ার বুদ্ধি আবিষ্কারে ব্যস্ত থাকায় অভিযানের ব্যবস্থাপনার বেশির ভাগই আমার ছেড়ে দিতে হলো অগাস্টাসের হাতে, সে দিনের বেশির ভাগ সময়ই কাটাতে লাগল গ্রামপাস জাহাজে, তার বাবাকে নিয়ে ব্যস্ত রইল কেবিন আর কেবিনের খোল গোছানোর কাজে। রাতে অবশ্য আমরা বসতে লাগলাম আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আলোচনায়। এভাবেই কেটে গেল প্রায় একমাস, কিন্তু কোন পরিকল্পনামাফিক এগোলে আমাদের সাফল্য আসবে তা খুঁজে বের করতে পারলাম না, অবশেষে অগাস্টাস আমাকে বলল যে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই নাকি সে নিয়ে ফেলেছে। নিউ বেডফোর্ডে মি. রস নামে আমার এক আত্মীয় আছে, মাঝেসাঝে যার বাড়িতে গিয়ে আমি দুই-তিন সপ্তাহ থাকি। জাহাজ ছাড়ার কথা জুনের (১৮২৭ সাল) মাঝামাঝি, আর ঠিক হলো, জাহাজ ছাড়ার দুই একদিন আগে যথারীতি মি. রসের কাছ থেকে একটা চিঠি যাবে বাবার হাতে, যে চিঠিতে সে অনুরোধ জানাবে আমি যেন গিয়ে দিন পনেরো থাকি রবার্ট আর এমেটের সঙ্গে (তার দুই ছেলে)। চিঠিটা লেখা এবং যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়ার ভার নিল অগাস্টাস। নিউ বেডফোর্ড রওনা দেওয়ার নাম করে আমি গিয়ে যোগ দেব আমার বন্ধুর সঙ্গে, যে জাহাজে আমার লুকিয়ে থাকার একটা জায়গা ঠিক করে রাখবে। সে আমাকে নিশ্চিত করল যে লুকানোর জায়গাটা হবে অনেক দিন থাকার পক্ষেও বেশ আরামদায়ক, কারণ, প্রথমটায় কারো কাছে আমার নিজেকে প্রকাশ করা চলবে না। জাহাজটা যখন এত দূরে চলে যাবে যে ফিরে আসার আর কোনো প্রশ্নই উঠবে না, তখন সে আমাকে স্থান করে দেবে কেবিনের যাবতীয় আরামের মাঝে ; আর তার বাবা এটা নিয়ে কোনো রাগারাগি তো করবেই না বরং হেসে গড়িয়ে পড়বে আমাদের দুষ্টুমি দেখে। অনেক জাহাজই যাবে আশপাশ দিয়ে, যার কোনো একটা মারফত অভিযানের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বাবাকে একটা চিঠি দিলেই চলবে।

অবশেষে এসে উপস্থিত হলো জুনের মাঝামাঝি, সব ব্যবস্থা নেওয়াও হয়ে গেল। চিঠি লিখে পৌঁছে দেওয়া হলো বাড়িতে, সোমবারের এক সকালে বাড়ি ছেড়ে রওনা দিলাম নিউ বেডফোর্ডের উদ্দেশে, মানে, তেমনটাই ভাবল সবাই। আসলে সরাসরি গেলাম অগাস্টাসের কাছে, আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল সে রাস্তার এক মোড়ে। আমাদের মূল পরিকল্পনা ছিল এরকম যে আঁধার নেমে না আসা পর্যন্ত আমি লুকিয়ে থাকব কোথাও, তারপর চুপিসারে গিয়ে উঠে পড়ব জাহাজে ; কিন্তু আমাদের সহায়তায় নেমে

এল গাঢ় কুয়াশা, ফলে লুকিয়ে থাকার আর প্রয়োজন পড়ল না। আমাকে পথ দেখিয়ে জেটির দিকে পা বাড়াল অগাস্টাস, বেশ খানিকটা ফাঁক রেখে পেছন পেছন এগোতে লাগলাম আমি, পরনে আমার নাবিকের আলখাল্লা, অগাস্টাস জোগাড় করে দিয়েছিল পোশাকটা যেন দেখে ফেললেও সহজে কেউ আমাকে চিনতে না পারে। মি. এডমন্ডসের কুয়োটা পেরিয়ে, দ্বিতীয় মোড় ফিরতেই, পড়লাম একেবারে বুড়ো মি.পিটারসন, মানে, আমার দাদার মুখোমুখি। আমাকে দেখে তো দাদার চোখ উঠল কপালে। 'আরে, গর্ডন নাকি,' বলল বুড়ো থতমত ভাবটা কেটে যাবার পর, 'তোমার পরনে এই নোংরা আলখাল্লাটা কার ?' 'স্যার !' পরিস্থিতি সুবিধে নয় বুঝতে পেরে, জবাব দিলাম আমি ভীষণ অবাক হবার ভান করে, তারপর যথাসম্ভব রূঢ় স্বরে বললাম – 'স্যার ! আপনার কোথাও একটা ভুল হয়েছে ; প্রথমত আমার নাম মোটেই গর্ডন নয়, আর এত সুন্দর ওভারকোটটাকে আপনি কিনা বলছেন নোংরা ! পাজি বুড়ো কোথাকার !' গালি খেয়ে এমন চেহারা হলো দাদার, হাসি চাপতে জীবনে এত কষ্ট আমাকে আর কখনোই করতে হয়নি। দু-তিন ধাপ পিছিয়ে গেল বুড়ো, মুখ প্রথমে ফ্যাকাশে আর তারপর টকটকে লাল হয়ে গেল, চশমাটা ওপরে তুলল সে, তারপর আবার নামিয়ে আনল নাকের ওপর, সোজা উল্টোদিকে ঘুরে ছুটল ছাতাটা উঁচু করে ধরে। কয়েক ধাপ এগিয়েই থামল বুড়ো, যেন হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ে গেছে, তারপর আবার এগোল আজব ভঙ্গিতে পা ফেলে হেঁটে, থরথর করে কাঁপছে রাগে আর বিড়বিড় করে বলছে, 'এই নতুন চশমাটা চলবে না – গর্ডনই তো মনে হলো – না, একেবারেই চলবে না, জঘন্য এই চশমা !'

এভাবে অল্পের জন্যে রক্ষা পাবার পর এগোতে লাগলাম আমরা আরও সাবধানে, এবং নিরাপদেই পৌঁছলাম গন্তব্যে। ডেকে মাত্র দু-একজন নাবিক, তারাও কাজ নিয়ে ব্যস্ত, কী যেন আঁচড়াচ্ছে ফোকাসলে। আমরা জানতাম, ক্যাপটেন বার্নার্ড আছে লয়েড অ্যান্ড ভ্রেডেনবার্গে, সন্ধের আগে ফিরবে না, সুতরাং তার তরফ থেকে আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। প্রথমে অগাস্টাস গিয়ে উঠল জাহাজে, শিগগিরই তার পেছন পেছন আমি, কাজে ব্যস্ত নাবিকেরা আমাদের লক্ষই করল না। সোজা আমরা গেলাম কেবিনে, সেখানে কাউকে দেখতে পেলাম না। আরামের যাবতীয় ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে – তিমি শিকারি জাহাজে যেমনটা সাধারণত থাকে না। জাঁকজমকপূর্ণ বড় বড় চারটে স্টেটরুম, আর শোয়ার জন্যে প্রশস্ত বার্থ। দেখতে পেলাম বিরাট এক স্টোভ, আর অত্যন্ত পুরু, দামি কার্পেটে ঢাকা

কেবিন আর বড় চারটে স্টেটরুমের মেঝে। সিলিং পুরো সাত ফুট উঁচুতে, মোট কথা, আমি যতটা ভেবেছিলাম জায়গাটা তারচেয়েও অনেক বেশি সাজানো-গোছানো। অগাস্টাস অবশ্য আমাকে দেখার বেশিক্ষণ সুযোগ দিল না, বারবার বলতে লাগল যে কেউ দেখে ফেলার আগেই আমার লুকিয়ে পড়াটা জরুরি। সে আমাকে নিয়ে গেল তার নিজের স্টেটরুমে, যেটা জাহাজের স্টারবোর্ডের পাশে, বাল্কহেডের পরেই। রুমটাতে ঢুকতেই ভেতর থেকে ছিটকিনি তুলে দিল সে। এত সুন্দর রুম আমি জীবনে কখনো দেখিনি। এটা দশ ফুট মতো লম্বা, আর রয়েছে প্রশস্ত একটামাত্র বার্থ। সেখানেই বাল্কহেডের একদম পাশ ঘেঁষে চার বর্গফুট মতো একটা জায়গা যেখানে রয়েছে একটা টেবিল, একটা চেয়ার, আর ঝুলন্ত কয়েকটা তাক ভরতি মূলত সাগর অভিযান আর ভ্রমণ কাহিনীর বই। রুমটায় ছোটখাটো আরও আরাম আয়েশের মাঝে রয়েছে একটা সিন্দুক বা রেফ্রিজারেটর গোছের বস্তু, অগাস্টাস দেখাল সেটার ভেতরে আছে খানাপিনার পর্যাপ্ত আয়োজন।

এবার কার্পেটের একটা কোনায় আঙুলের গাঁট দিয়ে চাপ দিল অগাস্টাস, দেখতে পেলাম যে এখানকার ষোলো বর্গইঞ্চি মতো জায়গা নিখুঁতভাবে কেটে আবার জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তার চাপে জায়গাটার একদিক ঠেলে উঠল ওপরদিকে, নিচে দেখা গেল সরু একটা গলি। এবার ফসফরাসের দেশলাই জ্বালিয়ে একটা মোমবাতি ধরাল সে, তারপর মোমবাতিটাকে একটা কালো লণ্ঠনের ভেতরে বসিয়ে, তাকে অনুসরণের ইশারা করে, গলি দিয়ে নেমে গেল জাহাজের খোলে। আমি নামতেই, ভেতরে আটকানো একটা পেরেক টেনে ঢাকনাটা আবার বসিয়ে দিল সে যথাস্থানে, ফলে কাটা জায়গাটা কার্পেটের গায়ে জুড়ে গিয়ে গোপন গর্তটার আর কোনো চিহ্নই রইল না।

মোমবাতিটার আলো এতই ক্ষীণ যে রাশি রাশি তক্তার মাঝ দিয়ে প্রায় হাতড়াতে হাতড়াতে এগোলাম অতি কষ্টে। যাই হোক, ধীরে ধীরে চোখ সয়ে এল, তখন বন্ধুর কোটের একটা প্রান্ত চেপে ধরে এগোতে পারলাম অপেক্ষাকৃত সহজভাবে। অসংখ্য মোড় আর সরু সরু গলি পেরিয়ে, অবশেষে আমাকে সে নিয়ে গেল লোহা দিয়ে বাঁধানো একটা বাক্সের কাছে, একসময় যার ভেতরে বোধ হয় রাখা হতো মাটির সুন্দর সুন্দর সব পাত্র। বাক্সটা প্রায় চার ফুট উঁচু, আর পুরো ছয় ফুট লম্বা, কিন্তু খুবই সরু। বাক্সটার ওপরে তেলের বড় বড় দুটো শূন্য পিপে, আর তার ওপর স্তূপ করে

রাখা খড়ের মাদুর গিয়ে ঠেকেছে প্রায় কেবিনের মেঝেতে। চারপাশে কোথাও কোথাও এমনকি সিলিং পর্যন্ত গাদাগাদি করে রাখা জাহাজের যাবতীয় ধরনের আসবাবপত্র আর সেসবের ফাঁকে ফাঁকে বিশৃঙ্খলভাবে বস্তা, পিপে, বাক্স, ঝুড়ি ; এতকিছুর মাঝ দিয়ে পথ চিনে আমরা যে বাক্সের কাছে আসতে পেরেছি এটা অবাক করার মতো এক ঘটনা। পরে জেনেছি যে অগাস্টাস ইচ্ছে করেই জিনিসগুলো এভাবে গাদাগাদি করে রেখেছে যেন আমার লুকানোর জায়গাটার গোপনতা সম্পূর্ণ বজায় থাকে, আর কাজটা করতে সহায়তা নিয়েছে একজন মাত্র মানুষের যে কখনোই জাহাজের ডেকের ওপরে উঠে না।

এবার আমার সঙ্গী দেখাল যে বাক্সটার একটা প্রান্ত অনায়াসেই খুলে ফেলা যায়। সে ওটা টেনে খুলে ভেতরটা দেখাতে খুবই অবাক হলাম আমি। বাক্সটার তলা জুড়ে বিছানো কেবিনের বার্থ থেকে আনা একটা তোশক, আর আরামের অনেক জিনিস রাখা সত্ত্বেও সেখানে রয়ে গেছে বসে কিংবা সটান শুয়ে থাকার মতো যথেষ্ট জায়গা। অন্যান্য জিনিসের পাশাপাশি আছে কিছু বই, কলম, কালি আর কাগজ, তিনটে কম্বল, বড় একটা জগভরতি পানি, ছোট এক পিপে সি-বিস্কিট, তিন কি চারটে বিরাট বিরাট বোলোনা সসেজ, বিশাল এক টুকরো হ্যাম, খাসির রোস্ট করা ঠান্ডা আস্ত একটা রান, গোটা ছয় কর্ডিয়াল আর হুইস্কির বোতল। এত খুশিমনে দ্রুত জায়গাটার দখল নিলাম আমি, যত খুশি বোধ হয় কোনো রাজাও হয়নি তার নতুন প্রাসাদে ঢুকে। এবার অগাস্টাস আমাকে দেখিয়ে দিল কীভাবে বন্ধ করতে হয় বাক্সের খোলা প্রান্তটা, তারপর মোমবাতি নামিয়ে দেখাল নিচে পড়ে থাকা এক টুকরো কালো পাকানো দড়ি। রাশি রাশি তক্তার ফাঁক দিয়ে দড়িটা নাকি গিয়ে পৌঁছেছে গুপ্ত দরজাটার নিচে আটকানো পেরেকের কাছে। যদি হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনায় এই জায়গাটা ত্যাগ করার প্রয়োজন হয়, তাহলে তার সহায়তা ছাড়াই পথ চিনে আমি যেতে পারব গুপ্ত দরজাটা দিয়ে বাইরে। আমাকে বেশকিছু মোমবাতি আর ফসফরাসের দেশলাই দিয়ে এবার বিদায় নিল অগাস্টাস, যাবার আগে বলে গেল সুযোগ পেলেই সবার চোখ বাঁচিয়ে আমাকে এসে দেখে যাবে। সেদিন ছিল সতেরোই জুন।

বাক্সের ভেতরেই কাটিয়ে দিলাম তিন দিন তিন রাত (যতদূর ধারণা করতে পারি), কেবল দুবার বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম দরজার উল্টোপাশে রাখা দুটো কাঠের বাক্সের মাঝখানে, আর হাত-পা টানটান করে পেশির খিল ছাড়ালাম। এই সময়টাতে একবারের জন্যেও অগাস্টাসের সঙ্গে আর দেখা

হয়নি ; তবে তাতে মোটেই ঘাবড়ে যাইনি আমি, জানতাম জাহাজটা যে কোনো মুহূর্তে যাত্রা শুরু করবে, আর এই ব্যস্ততায় সে নিচে আসার সুযোগ পায়নি। অবশেষে শুনতে পেলাম গুপ্ত দরজাটা খোলা আর বন্ধ হবার শব্দ, চাপা স্বরে সে জানতে চাইল, আমি ভালো আছি কি না, আর আমার কোনো জিনিসের দরকার আছে নাকি। 'কিচ্ছু প্রয়োজন নেই,' জবাব দিলাম আমি ; 'যথেষ্ট আরামে আছি ; জাহাজ ছাড়বে কখন ?' 'আধ ঘণ্টার আগেই,' জবাব দিল সে। 'আমি সেটাই তোমাকে জানাতে এসেছি, ভয়ও পেয়েছিলাম যে আমার অনুপস্থিতিতে অস্বস্তিবোধ করছ কি না। আবার নিচে আসার সুযোগ পাব না আমি – হয়ত আরও তিন-চার দিন। ওপরে সব ঠিকঠাক আছে। আমি গুপ্ত দরজাটা বন্ধ করে চলে যাবার পরে দড়ি ধরে ওখানে এলে পাবে আমার রেখে-যাওয়া ঘড়ি – এখানে যেহেতু কোনো আলো আসে না, ওটা তোমার কাজে লাগতে পারে। তুমি বোধ হয় বুঝতে পারনি নিচে কত দিন ধরে আছ – মাত্র তিন দিন – আজ বিশ তারিখ। ঘড়িটা নিজেই দিয়ে যেতাম, কিন্তু আমাকে না দেখে খোঁজ শুরু হয়ে যেতে পারে।' চলে গেল সে।

অগাস্টাস চলে যাবার প্রায় আধ ঘণ্টা পর স্পষ্টই বুঝতে পারলাম জাহাজ যাত্রা শুরু করেছে, অবশেষে ভালোভাবেই একটা অভিযানে রওনা দিতে পারায় নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানালাম। যতদিন না এই বাক্স ছেড়ে যেতে পারি কেবিনে, যথাসাধ্য সহজ মনেই এখানে থাকব বলে স্থির করলাম আমি, ওখানে পাব আরও বড়সড় জায়গা, তবে এখানকার চেয়ে আরাম তেমন বেশি পাব বলে মনে হয় না। আমার প্রথম কাজ এখন ঘড়িটা নিয়ে আসা। মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখেই, দড়ি ধরে এগোলাম হাতড়াতে হাতড়াতে, অসংখ্য মোড় আর সরু সরু গলি পেরোতে গিয়ে কয়েকবার লক্ষ করলাম যে অনেকটা পথ যাবার পর ফিরে এসেছি আবার পূর্বের অবস্থানের এক দুই ফুটের ভেতরে। যাই হোক, অবশেষে পৌঁছতে পারলাম পেরেকটার কাছে, আর, ঘড়ি নিয়ে ফিরে এলাম নিরাপদে। এবার নজর দিলাম বইগুলোর দিকে – আমার কথা ভেবে উপযুক্ত সব বই-ই বেছেছে অগাস্টাস – তারপর তুলে নিলাম লুই আর ক্লার্কের কলাম্বিয়া অভিযান কাহিনি। কিছুক্ষণ আনন্দের সঙ্গেই পড়লাম বইটা, তারপর চোখ জড়িয়ে আসতে, খুব সাবধানে মোমবাতিটা নিবিয়ে, শিগগিরই তলিয়ে গেলাম ঘুমে।

জাগার পর কেমন তালগোল পাকিয়ে রইল মাথাটা, কিছুই স্মরণ করতে পারলাম না। খানিকটা সময় কেটে যাবার পর অবশ্য ধীরে ধীরে আবার মনে পড়ল পুরো পরিস্থিতিটা। আলো জ্বেলে ঘড়ি দেখলাম আমি ;

কিন্তু ঘড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বোঝার আর কোনো উপায় রইল না যে ঠিক কতক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছি। হাত-পায়ে একদম খিল ধরে গিয়েছিল, তাই আড়মোড়া ভাঙার জন্যে কাঠের সেই দুই বাক্সের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হলাম। খিদেয় পেট জ্বালা করে উঠতে মনে পড়ল ঠান্ডা খাসির মাংসের কথা, ঘুমাবার আগে কিছুটা খেতে বুঝেছিলাম যে চমৎকার ওটার স্বাদ। কিন্তু খেতে গিয়ে দেখলাম, মাংসটা একদম পচে গেছে। এই ব্যাপারটা মনকে অশান্ত করে তুলল ; এটার সঙ্গে জাগার পর মাথার তালগোল পাকানো অবস্থাটা মিলিয়ে ভাবলাম, নিশ্চয় অত্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে ঘুমিয়েছি। জাহাজের খোলের বদ্ধ পরিবেশ সম্ভবত এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে, যা পরিশেষে অবস্থা ভয়াবহ করে তুলতে পারে। যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়তে চাইছে মাথাটা ; মনে হলো প্রত্যেকটা শ্বাসই যেন টানছি অতি কষ্টে ; মোট কথা, মন জুড়ে ভেসে উঠল অসংখ্য বিষণ্ন সব চিন্তা। তবু গুপ্ত দরজাটা খুলে বাইরে বেরোবার বা অন্য কিছু করার সাহস পেলাম না, তাই ঘড়িটাতে চাবি দিয়ে বসে রইলাম চুপচাপ।

পরবর্তী চব্বিশটা ঘণ্টা কাটল ভীষণ একঘেয়েমির মাঝে, কেউ এল না আমাকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে, আর এই অমনোযোগের কারণে মনে মনে অগাস্টাসকে দোষী না করে পারলাম না। তবে প্রধানত আমি শঙ্কিত হলাম জগের পানির আর মাত্র আধ পাইন্ট মতো অবশিষ্ট থাকায়, খাসির মাংসটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ইচ্ছে মতো খেয়েছি সসেজ, ফলে মাঝেসাঝেই পিপাসায় শুকিয়ে যাচ্ছে বুক। অস্বস্তি ধীরে ধীরে বেড়ে গেল, তাই বই পড়াতেও মনোযোগ দিতে পারলাম না। শরীর ভেঙে আসতে চাইছে ঘুমে, কিন্তু খোলের বদ্ধ বাতাসে পোড়া কাঠকয়লার মতো অত্যন্ত ক্ষতিকর কোনো পরিবেশ রয়ে গেছে কি না ভেবে ঘুমাতেও রীতি মতো ভয় পাচ্ছি। ইতিমধ্যে জাহাজের দুলুনিতে টের পেয়েছি, আমরা এসে পড়েছি খোলা মহাসাগরের অনেকটা দূরে, আর বহু দূর থেকে ভেসে আসা একটা গুঞ্জন জানান দিচ্ছে যে ঝড়ও বইছে বেশ জোরে। অগাস্টাসের নিচে নেমে না আসার কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না। নিশ্চয় এতটা দূরে চলে এসেছি যে এখন ওপরে যাবার ব্যাপারে আমার আর বাধা থাকার কথা নয়। কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে থাকতে পারে সে – অবশ্য ভেবে ভেবে এমন একটা দুর্ঘটনার কথাও মনে করতে পারলাম না যার ফলে সে আমাকে এতক্ষণ এখানে বন্দীর যন্ত্রণা ভোগ করাতে পারে, কেবল সে যদি হঠাৎ মারা গিয়ে না থাকে কিংবা পড়ে না গিয়ে থাকে পানিতে, আর এই ভাবনাটা আমাকে একেবারে অশান্ত করে

তুলল। এমনও তো হতে পারে প্রবল বাতাস ঠেলে বেশি এগোতে পারেনি জাহাজ, আমরা এখনো রয়ে গেছি ন্যানটাকেটের আশপাশে। পরমুহূর্তেই ভাবনাটা বাতিল করে দিতে বাধ্য হলাম ; কারণ, সেরকম কিছু ঘটলে জাহাজ ভীষণভাবে দুলতে শুরু করত ; তরতরিয়ে এগোতে পারত না। তাছাড়া, জাহাজ যদি এখনো ন্যানটাকেটের কাছাকাছিই থেকে থাকে, তাহলে অগাস্টাস এসে সেই সংবাদ আমাকে দিচ্ছে না কেন ? নির্জন আর নিরানন্দ আমার এই অবস্থায় নানা অসুবিধে নিয়ে ভাবলাম আরও খানিকটা, এবং আগামী চব্বিশ ঘণ্টাও অপেক্ষা করে দেখব বলে মনস্থির করলাম, আর তারপরেও কারো দেখা না পেলে যাব গুপ্ত দরজাটার কাছে, বন্ধুর সঙ্গে আলাপের একটা চেষ্টা করব, বা খোলা জায়গাটা দিয়ে অন্তত গায়ে লাগাব সামান্য তাজা বাতাস, আর পানি নিয়ে আসব বড় স্টেটরুমটা থেকে। এরকম উল্টোপাল্টা ভাবতে ভাবতেই ক্লান্তিতে একসময় তলিয়ে গেলাম ঘুমে, কিংবা অচেতন অবস্থায়। সারি বেঁধে এল ভয়ংকর সব দুঃস্বপ্ন। কোনো দুর্দশা আর আতঙ্কই বাদ গেল না। অন্যান্য দুঃস্বপ্নের মাঝে, প্রকাণ্ড সব বালিশ চাপা দিয়ে আমার শ্বাসরোধ করল ভয়ংকরতম আর হিংস্রতম চেহারার দানবের দল। প্রকাণ্ড সব সাপ জড়িয়ে ধরল আমাকে, আর চোখে চোখে চেয়ে রইল ভয়াবহ ঝকঝকে দৃষ্টিতে। তারপর আমার সামনে এসে উপস্থিত হলো অসীম সব মরুভূমি, যেগুলোতে জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। যতদূর চোখ যায় একের পর এক গজাতে লাগল অত্যন্ত লম্বা, ধূসর, পাতাশূন্য অসংখ্য গাছ। সেগুলোর শেকড় লুকিয়ে আছে বিস্তীর্ণ জলাশয়ে, আতঙ্ক জাগানো যে জলাশয়গুলোর পানি কালির মতো কালো। মনে হলো, অদ্ভুত চেহারার সেই গাছগুলোর মাঝে যেন বন্দী হয়ে আছে মানুষের প্রাণশক্তি, কঙ্কালের মতো ডালপালা দোলাতে দোলাতে, আর ভীষণ যন্ত্রণা এবং হতাশায় মোচড়াতে মোচড়াতে সেগুলো করুণা ভিক্ষা করছে নীরব পানির কাছে। তারপর বদলে গেল দৃশ্যপট ; এবার নিঃসঙ্গ, নগ্ন আমি দাঁড়িয়ে আছি সাহারা মরুভূমির আগুনের মতো গরম বালির মাঝখানে। আমার পায়ের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে আছে গ্রীষ্মমণ্ডলের এক হিংস্র সিংহ। হঠাৎ পশুটা তাকাল আমার দিকে তার বুনো চোখ মেলে। একলাফে উঠে বসল সিংহটা, মুখের ফাঁকে বেরিয়ে এল ভয়াবহ দাঁতের সারি। লাল টকটকে গলা দিয়ে তার বেরিয়ে এল বিদ্যুতের মতো গর্জন, প্রচণ্ড বেগে আমি যেন পড়ে গেলাম মাটিতে। আতঙ্কের আক্রমণ থেকে মুক্ত হয়ে খানিকটা জাগলাম আমি। স্বপ্ন তাহলে সত্যিই স্বপ্ন নয়। কারণ, জাগার পরেও দেখছি, আমার

বুকের ওপর চেপে বসেছে বিরাট আর আসল কোনো দানবের থাবা– কানে এসে লাগছে সেটার গরম নিশ্বাস – প্রায় অন্ধকারের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভয়াবহ সাদা দাঁত।

একহাজার মানুষের জীবনীশক্তিও যদি তখন ভর করত আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর জিভের ওপর, তবু আমি একচুল নড়তে পারতাম না কিংবা উচ্চারণ করতে পারতাম না কোনো শব্দ। আগের মতোই বসে রইল পশুটা, তবে হিংস্র কোনো আচরণ করল না, চূড়ান্ত অসহায় এক অবস্থায় পড়ে রইলাম আমি, মনে হলো, জীবন বেরিয়ে যাবার আর বেশি দেরি নেই। অনুভব করলাম, দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে যাবতীয় শারীরিক আর মানসিক শক্তি, দমটা এবার ফুরিয়ে যাবে তীব্র আতঙ্কে। মাথা ঘুরতে লাগল– ভীষণ অসুস্থ বোধ করলাম – কমে এল চোখের দৃষ্টি– আমার ওপরে মেলে থাকা গনগনে চোখ দুটোও যেন নরম হয়ে এল কিছুটা। সর্বশেষ শক্তিটুকু একত্রিত করে, ফিসফিস করে ঈশ্বরকে ডেকে প্রস্তুত হলাম মৃত্যুর জন্যে। আমার স্বর যেন পশুটার লুকিয়ে থাকা সমস্ত হিংস্রতা জাগিয়ে তুলল। সে শুয়ে পড়ল আমার শরীরের ওপর ; কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে টানা আর চাপা স্বরে কুঁইকুঁই করতে করতে সাগ্রহে চাটতে লাগল আমার মুখ আর হাত, তার সেই আচরণে মিশে আছে দারুণ অনুরাগ আর আনন্দের চিহ্ন ! হতভম্ব হয়ে গেলাম আমি, অভিভূত হলাম বিস্ময়ে, কিন্তু মনে পড়ে গেল আমার নিউফাউন্ডল্যান্ড কুকুর টাইগারের কথা, এভাবেই কুঁইকুঁই করে সে, এরকমই আচরণ করে আদর জানাবার সময়। হ্যাঁ, এটা টাইগারই। হঠাৎ রক্তের একটা স্রোত যেন ছুটে গেল আমার মাথার দিকে, মুক্তি আর পুনর্জীবনের একটা অনুভূতি শক্তি জোগাল শরীরে। যে তোশকটার ওপর শুয়েছিলাম, উঠে পড়লাম সেটার ওপর থেকে তড়াক করে, জড়িয়ে ধরলাম আমার বিশ্বস্ত অনুচর আর বন্ধুর গলা, বুকে জমে ওঠা যন্ত্রণার বোঝা হালকা করে দিলাম ঝরঝর করে চোখের পানি ফেলে।

তোশক ছেড়ে ওঠার পর, আগে একবার ঘটা ঘটনাটার মতোই আবার চেতনাকে অস্পষ্ট করে দিয়ে তালগোল পাকিয়ে গেল আমার মাথা। দীর্ঘক্ষণ কোনো কথাই মনে করতে পারলাম না – কিন্তু, অত্যন্ত ধীরে ধীরে আবার ফিরে এল আমার চিন্তাশক্তি, আবার স্মরণ হলো এই অবস্থার অনেক ঘটনা। তবে টাইগার কীভাবে এখানে এল সেটা কিছুতেই বুঝতে পারলাম না তার সম্বন্ধে নানারকম হাজারটা ভাবনা ভাবার পর শেষমেশ এই আনন্দে তৃপ্ত হতে হলো যে সে এখানে এসেছে আমার নির্জনতার অংশ নিতে, আর

আদর করে আমাকে শান্তি দিতে। বেশিরভাগ মানুষই তাদের কুকুরকে ভালোবাসে – কিন্তু টাইগারের প্রতি আমার ভালোবাসা সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি ; আর এ কথাও সত্যি যে কোনো কুকুরই তার মতো ভালোবাসা পাবার দাবি রাখে না। সাত বছর ধরে সে আমার এক অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হয়ে আছে, আর অসংখ্য বার সে তার যাবতীয় মহৎ গুণের প্রমাণ দিয়েছে, যে গুণের কারণে আমরা এই পশুটাকে এত গুরুত্ব দিই। বাচ্চা থাকা অবস্থায় আমি তাকে উদ্ধার করেছি ন্যানটাকেটের এক খুদে শয়তানের হাত থেকে, টাইগারের গলায় দড়ি লাগিয়ে সে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল পানিতে ডুবিয়ে মারার জন্যে ; তিন বছর পর বড় হয়ে কুকুরটা সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করেছে এক ডাকাতের মুগুরের আঘাত থেকে আমার মাথাটাকে রক্ষা করে।

ঘড়িটা কানের কাছে ধরতে বুঝতে পারলাম, ওটা আবার বন্ধ হয়ে গেছে ; তবে এতে আমি অবাক হলাম না মোটেই, এবারেও নিশ্চয় দিয়েছি লম্বা ঘুম ; তবে কত লম্বা তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। জ্বরে শরীর পুড়ে যাচ্ছে, পিপাসা হয়ে উঠেছে প্রায় অসহ্য। অবশিষ্ট পানিটুকুর জন্যে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে লাগলাম জগটা ; কারণ, এখন আমার আর কোনো আলো নেই, জ্বলে শেষ হয়ে গেছে মোমবাতিটা, ফসফরাসের দেশলাইও পাচ্ছি না হাতের কাছে। জগটা খুঁজে পেলাম, কিন্তু ওটা এখন শূন্য, নিশ্চয় টাইগার খেয়ে ফেলেছে, খাসির মাংসের অবশিষ্টাংশটুকুও চেটেপুটে খেয়ে হাড়গুলো ফেলে রেখেছে সে বাক্সের খোলা মুখের সামনে। পচা মাংস নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই, কিন্তু পানির কথা ভেবে রীতি মতো অসহায় বোধ করলাম। ভীষণ দুর্বল হয়ে গেছি আমি – এতটাই যে সামান্য নড়াচড়াতেই ম্যালেরিয়ার রোগীর মতো হাত-পা কাঁপছে থরথর করে। ঝামেলা আরও বাড়াবার জন্যেই ওদিকে জাহাজ আবার এত জোরে জোরে দুলতে শুরু করেছে যে বাক্সের ওপর রাখা তেলের পিপেগুলো যে কোনো মুহূর্তে নিচে গড়িয়ে পড়ে ঢোকার এবং বেরোবার একমাত্র পথটা বন্ধ করে দিতে পারে। সি-সিকনেসে মাঝেসাঝেই গুলিয়ে উঠছে শরীর। এসব পরিস্থিতি বিবেচনা করেই গুপ্ত দরজা দিয়ে বাইরে গিয়ে হাঁপ ছাড়ব বলে মনস্থির করলাম আমি, কারণ, আরও দেরি করলে হয়ত বাইরে যাবার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলব। আবার হাতড়াতে লাগলাম ফসফরাসের দেশলাই আর মোমবাতির জন্যে। দেশলাই পেয়ে গেলাম খানিক পরেই, কিন্তু মোমবাতি (ওগুলো কোথায় রেখেছিলাম তা স্পষ্ট মনে পড়া সত্ত্বেও) আর পেলাম না। তাই আপাতত

খোঁজাখুঁজি বাদ দিয়ে, টাইগারকে চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলে, তক্ষুনি রওনা দিলাম গুপ্ত দরজাটার উদ্দেশে।

কাজটা শুরু করতেই বুঝতে পারলাম দুর্বলতার পরিমাণ। তবু অতি কষ্টে এগোতে লাগলাম হামাগুড়ি দিয়ে, মাঝেসাঝেই হঠাৎ করে ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু ; তখন পড়ে গেলাম মুখ থুবড়ে, আর কয়েক মিনিট ধরে পড়েই রইলাম যেন যে কোনো মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলব। এই অবস্থা সত্ত্বেও এগোলাম তিল তিল করে, আতঙ্কিত মন বারবার বলতে লাগল যে একবার যদি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি তক্তার এই গোলকধাঁধার মাঝে, তাহলে নেমে আসবে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু। হঠাৎ কপাল ঠুকে গেল লোহা দিয়ে বাঁধানো একটা বাক্সের ধারালো কোণে। মাথা ঘুরে পড়ে রইলাম কিছুক্ষণ ; কিন্তু অবর্ণনীয় এক দুঃখ নিয়ে লক্ষ করলাম, জাহাজের তীব্র দুলুনিতে বাক্সটা এসে পড়েছে ঠিক আমার পথের ওপর। শরীরের সমস্ত শক্তি ব্যয় করলেও বাক্সটাকে এক ইঞ্চি নড়ানোর সাধ্য আমার নেই, ওটা এসে পড়েছে চারপাশের অন্যান্য বাক্স আর জাহাজের আসবাবের মাঝখানে। এখন হয় আমাকে দড়ির সহায়তা ত্যাগ করে খুঁজে নিতে হবে নতুন কোনো পথ, নয়ত টপকাতে হবে বাক্সটা। যতবার দড়ি ত্যাগ করার কথা ভাবলাম ততবারই এত সব অসুবিধে আর বিপদের কথা মনে হলো যে শিউরে না উঠে পারলাম না। ওটা করতে গেলে আমার এই শারীরিক আর মানসিক দুর্বল পরিস্থিতিতে জাহাজের খোলের স্তূপীকৃত জঞ্জালের মাঝে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করাই হবে একমাত্র নিয়তি। তাই দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে স্থির করলাম, বাক্সটাকে টপকে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

সোজা হয়ে দাঁড়াতেই বুঝতে পারলাম, যতটা কঠিন ভেবেছিলাম আসলে কাজটা তারচেয়ে অনেক বেশি কঠিন। সরু গলিটার দুই পাশে দেয়াল তুলে আছে নানা জাতের ভারী ভারী তক্তা, আমার সামান্য ভুলে সেগুলো নেমে এসে গুঁড়ো করে দেবে আমার মাথা ; কিংবা, এই দুর্ঘটনা থেকে যদি বেঁচেও যাই, সেগুলো বন্ধ করে দিতে পারে ওপাশের পথ। বাক্সটা যেমন লম্বা তেমনই অসুবিধেজনক, ওটার কোথাও পা রাখার কোনো উপায় নেই। বাক্সটার মাথায় ওঠার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থ হলাম। তবে ব্যর্থ হওয়াতেই সম্ভবত রক্ষা পেলাম এ যাত্রা, একবার ওটার ওপরে উঠলে ওপাশে নামার মতো শক্তি আমার আর থাকত না। অবশেষে বাক্সটাকে সরাবার জন্যে মরিয়া হয়ে ঠেলা দিতেই, আমার পাশে অনুভব করলাম একটা কম্পন। সাগ্রহে তক্তাগুলো হাতড়াতেই বুঝলাম, বেশ বড় একটা

তক্তা আলগা হয়ে আছে। সৌভাগ্যক্রমে, পকেট নাইফটা সঙ্গেই ছিল, ওটা দিয়ে খানিকটা খোঁচাখুঁচি করতেই পুরোপুরি খুলে এল তক্তাটা ফাঁকটা দিয়ে ঢুকে পড়তেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে দেখলাম, ওপাশে আর কোনো তক্তা নেই। এবার দড়িটা ধরে এগোতে তেমন কোনো অসুবিধে ছাড়াই পৌঁছে গেলাম পেরেকটার কাছে। দুরুদুরু বুকে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম আমি, তারপর আস্তে করে ঠেলা দিলাম গুপ্ত দরজাটার ঢাকনায়। ওটা উঠল না, এবার আরও জোরে ঠেলা দিলাম, মনে মনে ভয়ও পাচ্ছিলাম যে ওপরের স্টেটরুমটাতে হয়ত দেখা হবে অগাস্টাস ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে। যাই হোক, আমাকে অবাক করে দিয়ে দরজাটা খুলল না, শঙ্কিত হয়ে পড়লাম, আগে তো এটা খুলতে কোনো জোর লাগেনি ! এবার ঠেলা দিলাম আরও জোরে, তারপর সর্বশক্তিতে – তবু ঢাকনাটা খুলল না ; আমার যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে মনে হলো, গর্তটা আবিষ্কার করে হয় কেউ পেরেক ঠুকে বন্ধ করে দিয়েছে, নয়ত ওটার ওপরে তুলে দিয়েছে এত ভারী কোনো ওজন, যেটাকে নড়ানোর কল্পনা করাও অসম্ভব।

চূড়ান্ত আতঙ্ক চেপে বসল আমার বুকে। এভাবে আমার কবর হয়ে যাবার সম্ভাব্য কারণ খুঁজে খুঁজে ব্যর্থ হলাম। হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়লাম মেঝেতে, মাথা জুড়ে এল মৃত্যুর ভয়াবহ চিন্তা, কিন্তু সেই মৃত্যু এসে সব জ্বালা জুড়িয়ে দেওয়ার আগে ভয়ংকর এক লড়াই করতে হবে পিপাসা, খিদে, শ্বাসরোধ আর অকাল সমাধির সঙ্গে। অবশেষে খানিকটা ফিরে পেলাম নিজেকে। উঠে, গুপ্ত দরজাটার কোথাও একটা ফাঁক খোঁজার চেষ্টা করলাম, আর তা পেয়ে যেতে পরীক্ষা করলাম সেদিক দিয়ে ওপরের রুমটার কোনো আলো দেখা যায় কি না ; কিন্তু চোখে পড়ল না কিছুই। ফাঁক দিয়ে পকেট নাইফ ঢুকিয়ে দিতে ওটা ঠেকল নিরেট লোহার কিছু একটার সঙ্গে। ছুরি বোলাতে জিনিসটার আজব ঢেউ খেলানো ধরনে মনে হলো, ওটা একটা চেইন-কেবল। এখন সামনে একমাত্র পথ খোলা রইল আবার সেই বাক্সে ফিরে যাওয়া, সেখানে গিয়ে আমার করুণ নিয়তির অপেক্ষায় থাকা, কিংবা ঠান্ডা মাথায় রক্ষা পাবার কোনো পরিকল্পনা করা। অনেক চেষ্টায়, নানা বাধা কাটিয়ে ফিরলাম আবার। তোশকের ওপর শুয়ে পড়তেই আমার পাশে ঝাঁপিয়ে এল টাইগার, আদরে আদরে যেন জানাতে চাইল সান্ত্বনা, সেই সঙ্গে নিয়তিকে বরণ করতে বলল বীরের মতো।

তার আচরণের একটা অদ্ভুত দিক আমার নজর কাড়ল। কয়েক মিনিট আমার মুখ-হাত চাটার পর সে কুঁইকুঁই করতে করতে পিঠের ওপর শুয়ে

পড়ে চার পা তুলে দিচ্ছে শূন্যে। বারবার এরকম করতে লাগল সে, যার কোনো কারণ খুঁজে না পেয়ে ভাবলাম, কুকুরটার বোধ হয় চোট লেগেছে ; একে একে চারটে পা-ই দেখলাম, কিন্তু জখমের কোনো চিহ্ন চোখে পড়ল না। তখন খিদে পেয়েছে ভেবে ওটাকে দিলাম হ্যামের বড় একটা টুকরো – সঙ্গে সঙ্গে মাংসটা সাবাড় করে দিল সে, তারপর আবার ফিরে গেল সেই অদ্ভুত আচরণে। তখন ভাবলাম যে আমার মতোই বেচারি বোধ হয় পিপাসায় কষ্ট পাচ্ছে, তারপর মনে হলো, আমি তো কেবল পাগুলোই পরীক্ষা করেছি, হয়ত চোট লেগেছে শরীরের অন্য কোথাও বা মাথায়। কিন্তু সারা শরীরে বা মাথার কোথাও পেলাম না জখমের কোনো চিহ্ন। তবে এবার পরীক্ষা করতে গিয়ে আমার হাত ঠেকল একটা সুতোয় যা তার সারা শরীরে বেড় দেওয়া আছে। আরও ভালোভাবে পরীক্ষা করতে দেখলাম, কুকুরটার বাম কাঁধের ঠিক নিচে বাঁধা আছে একটুকরো কাগজ, নেড়েচেড়ে যেটাকে মনে হলো চিঠির একটা প্যাড।

অধ্যায় ৩

মাথায় চিন্তা দোলা দিয়ে গেল যে চিরকুটটা নিশ্চয় লিখেছে অগাস্টাস, কল্পনার অসাধ্য কোনো দুর্ঘটনার ফলে সে এসে আমাকে মুক্ত করতে পারেনি এই বন্দীদশা থেকে, আর তাই পরিস্থিতিটা যথাযথভাবে জানাবার জন্যে মাথা খাটিয়ে বের করেছে এই পথ। আগ্রহে কাঁপতে কাঁপতে আবার অনুসন্ধান চালালাম ফসফরাসের দেশলাই আর মোমবাতির জন্যে। তালগোল পাকানো স্মৃতির মাঝেও মনে পড়ল, ঘুমে তলিয়ে যাবার আগে আগে ওগুলোকে রেখে দিয়েছিলাম বেশ ভালোভাবেই ; শেষবার গুপ্ত দরজাটার কাছে যাবার আগে মনেও পড়েছিল ওগুলো ঠিক কোথায় রেখেছি। কিন্তু এখন আর মনে পড়ল না সেসবের কিছুই, ফলে পুরো একঘণ্টা ধরে খোঁজা সত্ত্বেও হারানো জিনিসগুলো আর পেলাম না ; এরকম দুশ্চিন্তার যন্ত্রণা আর উৎকণ্ঠার কাল আমাকে কাটাতে হয়নি আর কখনোই। হাতড়াতে হাতড়াতে বাক্সটার খোলা মুখের কাছে, ব্যালাস্টের পাশে মাথা নিয়ে যেতেই, স্টিরেজের দিকে চোখে পড়ল আলোর একটা আভা। জায়গাটা মনে হলো মাত্র কয়েক ফুট সামনে, তাই ভীষণ অবাক হয়ে এগোলাম সেদিকে। কিন্তু এগিয়েছি কি এগোইনি, আভাটা হারিয়ে গেল গাঢ় অন্ধকারে ; কিছুতেই ওটাকে আর খুঁজে না পেয়ে ফিরে এলাম আগের অবস্থানে। এবার আলোর আভাটা চোখে পড়ল যেদিকে যাচ্ছিলাম ঠিক তার উল্টোদিকে। আভার ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ না সরিয়ে, খুব সাবধানে এগোতে, যেতে পারলাম ওটার কাছে। দেখলাম, আভাটা ছড়াচ্ছে কাত হয়ে পড়ে থাকা একটা শূন্য পিপের ওপর ছড়ানো আমার ফসফরাসের দেশলাইয়ের কয়েকটা টুকরো থেকে। অবাক হয়ে যখন ভাবছি এগুলো এখানে এল কীভাবে, হাতে ঠেকল মোমবাতির দু-তিনটে টুকরো ; বুঝতে পারলাম, চিবিয়ে এগুলোর এই হাল করেছে টাইগার। নিশ্চিত হলাম যে মোমবাতিগুলো খেয়ে ফেলেছে কুকুরটা,

আর অসহায়ের মতো ভাবলাম, অগাস্টাসের চিরকুটটা আর কখনোই পড়তে পারব না। মোমবাতির যেটুকু অবশেষ ছিল তা এমনভাবে দলা পাকিয়ে গেছে যে কোনো কাজেই আর আসবে না, তাই সেগুলো যেমন ছিল তেমনই রেখে দিলাম। তবে ফসফরাসের টুকরোগুলো যথাসাধ্য সংগ্রহ করে আমি ফিরে এলাম বাক্সে, যেখানে টাইগার তার জায়গা থেকে এতটুকুও নড়েনি।

এবার কী করা উচিত বুঝতে পারলাম না আমি। জাহাজের খোলটা এত অন্ধকার যে নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না, এমনকি সে হাত মুখের সামনে তুলে ধরলেও। চিঠির সাদা প্যাডটাও সরাসরি না তাকালে চোখে পড়ছে না। এদিকে চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও সেই চিঠি পড়তে না পারায় মনের যন্ত্রণা আরও বাড়ল। আলো পাবার জন্যে মাথায় দোলা দিতে লাগল হাজারটা কৌশল – ঠিক যেরকম কৌশল দোলা দেয় কোনো আফিমখোরের মাথায় তার অশান্তির ঘুমের মাঝে – যুক্তি আর কল্পনাশক্তি তখন অস্থির হয়ে পড়ে বলে যখন যে ভাবনা দোলা দেয় সেটাকেই মনে হয় তার আগের সবগুলোর চেয়ে যুক্তিসঙ্গত। শেষমেশ একটা কৌশলকে সত্যিই যুক্তিসঙ্গত মনে হলো, আর ভেবে অবাক হলাম যে এতক্ষণ এটা আমার মাথায় আসেনি কেন। চিঠির প্যাডটা রাখলাম একটা বইয়ের মলাটের ওপর, আর, পিপে থেকে আনা ফসফরাসের টুকরোগুলো ছড়িয়ে দিলাম তার ওপর। তারপর হাতের তালু দিয়ে সেগুলোর ওপর জোরে একটা ঘষা দিলাম। পুরো জায়গাটা জুড়ে জ্বলে উঠল পরিষ্কার একটা আলো ; তখন ওখানে যদি কোনো লেখা থাকত তা পড়তে আমার মোটেও অসুবিধে হতো না। কিন্তু কোনো লেখা নেই, একটা শব্দও নয়, পুরোটাই সাদা ; কয়েক মুহূর্ত পরেই নিবে গেল আলোটা, আর তার সঙ্গেই যেন নিবে গেল আমার হৃৎপিণ্ড।

একাধিক বার বলেছি যে এমনভাবে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল আমার মাথা যেন পাগল হয়ে যাব যে কোনো মুহূর্তে। মাঝেসাঝে ফিরে এসেছে মানসিক সুস্থতা, ফিরেছে শারীরিক শক্তি, কিন্তু খুব কম সময়ের জন্যেই। অনেকদিন যাবত এক তিমি শিকারি জাহাজের খোলে আবদ্ধ হয়ে আমি শ্বাস নিয়েছি সেখানকার বিষাক্ত বাতাসে, পর্যাপ্ত পানি খেতে পারিনি। গত চৌদ্দ কি পনেরো ঘণ্টা কিছু খাইনি, একবারের জন্যেও বন্ধ করতে পারিনি চোখের পাতা। খাসির রোস্টটা পচে যাবার পর আমার খাবারের প্রধান অংশ জুড়ে ছিল লবণে জারিত মাংস, সি-বিস্কিটগুলো এতই শুকনো যে ফুলে ওঠা, জ্বালা ধরা এই গলা নিয়ে সেগুলো খাবার প্রশ্নই ওঠে না। এখন আবার জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে শরীর, এককথায়, হয়ে পড়েছি অত্যন্ত

অসুস্থ। ফসফরাসের টুকরোগুলো দিয়ে সর্বশেষ অভিযান চালাবার পর কেটে গেল হতাশাজনক অনেকটা সময়, তারপর হঠাৎ করেই মনে পড়ল যে ওই আলোয় আমি দেখেছি চিঠিটার একটামাত্র পাশ। কী রকম রাগ হলো নিজের ওপর তার আর বর্ণনা দিতে চাই না (অতটা রাগ বোধহয় আমি কখনোই করিনি), যখন বুঝতে পারলাম ভুলটা। আসলে ভুলটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ হতো না, যদি না রাগের মাথায় করে বসতাম চরম একটা বোকামি – প্যাডটার একপাশে কোনো লেখা নেই দেখে চরম হতাশায় এটা আর মনে পড়েনি যে লেখা থাকতে পারে উল্টো পাশেও, চিঠিটা ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলে দিয়েছি আমি, কোথায় ফেলেছি তা এখন আর বলা সম্ভব নয়।

নিদারুণ এই পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হলাম টাইগারের বিচক্ষণতায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর প্যাডটার একটা টুকরো পেয়ে সেটা শুঁকিয়ে কুকুরটাকে বুঝিয়েছিলাম যে বাকি টুকরোগুলো তার অবশ্যই এনে দিতে হবে। আমাকে রীতি মতো অবাক করে দিয়ে (গন্ধ শুঁকে জিনিস খুঁজে বের করার ব্যাপারে এই প্রাণীটা বিখ্যাত হলেও কৌশলটা আমি তাকে শেখাইনি) তৎক্ষণাৎ লেগে পড়ল সে অনুসন্ধানে, আর শিগগিরই আমাকে এনে দিল আরেকটা টুকরো। কাগজটা এনে, আমার হাতে নাক ঘষতে লাগল সে, অর্থাৎ, কাজটার জন্যে একটু বাহবা চায়। মাথায় চাপড় দিয়ে খানিক আদর করতেই আবার সে ছুটে গেল অন্ধকারে। কেটে গেল বেশ কয়েকটা মিনিট, তারপর ফিরল সে বড়সড় একটা টুকরো নিয়ে – এবার মনে হলো পুরো কাগজটাই পেয়ে গেছি, যার মানে, প্যাডটাকে ছিঁড়ে আমি মাত্র তিনটে টুকরোই করেছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে, ফসফরাসের বাকি টুকরোগুলো খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না। আমার ঝামেলা আমাকে শিখিয়েছে সাবধান হবার প্রয়োজনীয়তা, তাই সময় নিয়ে ভাবলাম এখন আমি কী করতে যাচ্ছি। প্যাডের যে পাশটা পরীক্ষা করিনি সেই পাশে কিছু কথা লেখা আছে – কিন্তু সেটা কোন পাশ ? টুকরোগুলো কেবল জোড়া দিলেই ব্যাপারটা জানা যাবে না – যদিও এতে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে সবগুলো লেখা (যদি সত্যিই কোনো লেখা থেকে থাকে) একপাশেই আছে। লেখাগুলো ঠিক কোন পাশে আছে তা জানা প্রয়োজন, কারণ, ফসফরাসের যতটুকু অবশিষ্ট আছে তাতে এবারের চেষ্টা বিফল হলে তৃতীয় চেষ্টার আর কোনো সুযোগ থাকবে না। আগের মতোই প্যাডটা রাখলাম একটা বইয়ের ওপর, তারপর বসে বসে ভাবলাম ব্যাপারটা কয়েক মিনিট। অবশেষে মনে হলো, লেখার পাশটা খসখসে হতে পারে, সূক্ষ্মভাবে স্পর্শ করলে যা হয়ত ধরতে পারব আমি।

সতর্কতার সঙ্গে প্যাডের ওপর আঙুল বোলালাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম না কিছুই, তাই উল্টিয়ে নিলাম প্যাডটা। আবার সতর্কতার সঙ্গে তর্জনী বোলালাম, আর তখনই চোখে পড়ল অত্যন্ত অস্পষ্ট একটা আভা। বুঝতে পারলাম, আগের বার যে ফসফরাস ঘষেছিলাম, আভা ছড়াচ্ছে তারই খুদে কিছু কণা। তাহলে, লেখা থাকলে অবশ্যই তা আছে কাগজটার উল্টো পাশে। আবার উল্টিয়ে মিলিয়ে নিলাম কাগজের টুকরোগুলো। ফসফরাস ঘষতে আগের মতোই জ্বলে উঠল একটা আলো – এবার দেখতে পেলাম বড় বড় অক্ষরে, লাল কালিতে লেখা বেশ কয়েকটা লাইন। আলোটা চিঠি পড়ার জন্যে যথেষ্ট হলেও ছিল ক্ষণস্থায়ী। তবু, উত্তেজিত না হলে ওই সময়েই পড়ে ফেলতে পারতাম বাক্য তিনটে – লক্ষ করেছি, ওখানে তিনটে বাক্যই ছিল। উত্তেজনায়, দুশ্চিন্তায় তাড়াহুড়ো করে একসঙ্গে পুরোটা পড়ার চেষ্টা করতে গিয়ে আমি পড়তে পেরেছি কেবল শেষ সাতটা শব্দ – 'রক্ত – চুপচাপ না থাকলে বাঁচতে পারবে না।'

যদি পুরো চিঠিটা পড়তে পারতাম, যা লিখে আমাকে সতর্ক করতে চেয়েছে আমার বন্ধু, তাহলে ভয়ংকর কোনো ঘটনার কথা জেনে যতখানি আতঙ্কিত হতাম, তারচেয়ে অনেক বেশি আতঙ্কিত হলাম কেবল 'রক্ত' শব্দটা পড়ে – চিরদিনই যেন এই শব্দটার সঙ্গে মিশে আছে রহস্য, দুর্দশা, আর আতঙ্ক। ঘোর আঁধার এই কারাগারে শব্দটা যেন আতঙ্কের সঞ্চার করে চেপে বসল আমার বুকের ওপর !

আমাকে লুকিয়ে রাখার পেছনে তাহলে অগাস্টাসের ভালো যুক্তিই ছিল – যদিও হাজাররকম ভেবেও রহস্যটার কোনো সমাধান করতে পারিনি। গুপ্ত দরজাটার কাছ থেকে ফিরে আসার পরপর, আর টাইগারের অদ্ভুত আচরণটা লক্ষ করার আগে, ভেবেছিলাম আবার গুপ্ত দরজাটার নিচে গিয়ে এমনভাবে চেঁচাব যেন শুনতে পায় ডেকের ওপরের সবাই, আর তাতেও যদি কাজ না হয়, তাহলে বেরিয়ে যাব অরলপ (Orlop) ডেক কেটে। বাস্তবে কতটা সফল হতাম জানি না, তবে মুক্তির এই দুই সম্ভাবনার চিন্তা অশুভ পরিবেশেও আমাকে শক্তি জুগিয়েছে। চিঠিটার গুটিকয়েক যে শব্দ পড়তে পেরেছি, তার ফলে সর্বশেষ এই দুই সম্ভাবনাকেও বাতিল করতে হলো, আর প্রথমবারের মতো অনুভব করলাম নিয়তির যাবতীয় দুর্দশা। হতাশায় তলিয়ে গিয়ে গা এলিয়ে দিলাম তোশকে আর অচেতনের মতো পড়ে রইলাম প্রায় একদিন একরাত, যা থেকে মাঝেসাঝে দু-এক মুহূর্তের জন্যে কেবল মুক্তি দিল মাথায় খেলে যাওয়া যুক্তির ঝিলিক আর স্মৃতির চমক।

তারপর আবার উঠে, ভাবতে বসলাম আমাকে ঘিরে ফেলা আতঙ্কগুলো নিয়ে। পানি ছাড়া বড়জোর আর চব্বিশ ঘণ্টা টিকতে পারব – তার বেশি কিছুতেই নয়। বন্দীদশার প্রথম দিকে ইচ্ছে মতো খেয়েছি অগাস্টাসের রেখে যাওয়া কর্ডিয়াল, কিন্তু তাতে পিপাসা এতটুকু কমেনি, বরং বেড়ে গেছে জ্বর। এখন রয়ে গেছে কেবল সিকি পাইন্ট মতো হুইস্কি যা আমার পেটে সয় না। সসেজের পুরোটাই শেষ ; ছোট্ট এক টুকরো চামড়া ছাড়া হ্যামের আর কিছু অবশিষ্ট নেই ; সামান্য গুঁড়ো বাদে সব বিস্কুট সাবাড় করে দিয়েছে টাইগার। এদিকে ক্রমশ বেড়ে চলেছে মাথাব্যথা, পেয়ে বসছে প্রলাপের ঝোঁক যা সেই প্রথমবার ঘুমে তলিয়ে যাবার পর থেকেই আমাকে কমবেশি ভোগাচ্ছে। গত কয়েক ঘণ্টা ধরে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, চাপ অনুভব করছি বুকের ভেতরে। কিন্তু সব ছাপিয়ে উঁকি মারছে নতুন আরেক অশান্তি। এই অশান্তি শুরু হয়েছে টাইগারের আচরণ দেখে।

কাগজে শেষবার ফসফরাস ঘষার সময়েই প্রথম লক্ষ করেছি তার আচরণের পরিবর্তন। যখন আমি ঘষছি, চাপা এক গর্জন ছেড়ে আমার হাতে নাক ঘষতে লাগল সে ; কিন্তু তখন এত উত্তেজিত হয়েছিলাম যে এদিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পাইনি। ওই ঘটনার পরপরই আচ্ছন্নের মতো শুয়ে পড়েছিলাম তোশকের ওপর। তখন কানের কাছে পেয়েছি অদ্ভুত এক ফোঁসফোঁসানির শব্দ, আর দেখেছি শব্দটা করছে টাইগার, কিসের যেন দারুণ উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে সে, অন্ধকারের ভেতর হিংস্রভাবে জ্বলজ্বল করছে তার চোখ। কথা বললাম তার সঙ্গে, চাপা একটা গর্জন ছেড়ে চুপ মেরে গেল সে। টাইগারের এরকম আচরণে তিন-চার বার ঘোর কেটে গেল আমার, তারপর ব্যাপারটা এমনই আতঙ্ক সৃষ্টি করল মনে যে জেগে গেলাম পুরোপুরি। এখন সে শুয়ে আছে বাক্সটার দরজার সামনে, ছাড়ছে চাপা ভীতিকর গর্জন, আর এমনভাবে দাঁতে দাঁত ঘষছে যেন আক্রান্ত হয়েছে প্রবল খিঁচুনিতে। নিঃসন্দেহে বুঝলাম, জাহাজের খোলের বদ্ধ বাতাস আর পানির অভাবে সে পাগল হয়ে গেছে, কিন্তু এটা বুঝলাম না যে এই পরিস্থিতিতে আমার কী করা উচিত। তাকে হত্যা করার কথাও আমি ভাবতে পারি না, তবু নিজেকে রক্ষার খাতিরেই কাজটা করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে। একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে কুকুরটা, চোখে তার ঝকঝক করছে ভয়াবহ হিংস্রতা, যেন যে কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর। অবশেষে ভয়ংকর এই পরিস্থিতি আর সইতে পারলাম না আমি, মনস্থির করলাম যে কোনোভাবে বাক্সের বাইরে যাব, তখন যদি তার

পক্ষ থেকে তেমন বাধা পাই, হত্যা করতে দ্বিধা করব না। বাক্স থেকে বেরোতে হলে যেতে হবে ওটার শরীর ডিঙিয়ে, আর ইতিমধ্যেই যেন সে বুঝে ফেলেছে আমার মনোভাব – তাই উঠে বসেছে সামনের পায়ের ওপর (অনুমান করছি চোখের অবস্থানের পরিবর্তন লক্ষ করে), অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছি তার ঝকঝকে সাদা দাঁতের সারি। হ্যামের অবশিষ্ট চামড়া, হুইস্কির বোতল, আর অগাস্টাসের দেওয়া মাংস কাটার বড় ছুরিটা নিয়ে, আলখাল্লাটা গায়ে জড়িয়ে পা বাড়ালাম বাক্সের দরজার দিকে। তৎক্ষণাৎ জোর এক গর্জন ছেড়ে আমার টুঁটি লক্ষ করে লাফ দিল কুকুরটা। তার পুরো শরীর এসে আঘাত হানল আমার ডান কাঁধে, ছিটকে আমি পড়ে গেলাম বামপাশে, আমার ওপর দিয়ে চলে গেল ক্রুদ্ধ জানোয়ারটা। হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে, আমার মাথা ঢুকে গিয়েছিল কম্বলের ভেতরে, আর এটাই আমাকে রক্ষা করল তার দ্বিতীয় আক্রমণ থেকে– ঘাড়ে কামড় বসাল সে, কিন্তু তার দাঁত কম্বলের পশম পুরো ভেদ করতে পারল না। এখন আমি কুকুরটার তলে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবে সে। হতাশাই আমাকে শক্তি জোগাল, সাহসে ভর করে উঠে দাঁড়িয়ে, এক ঝটকায় ফেলে দিলাম টাইগারকে, পরক্ষণেই তার ওপর কম্বল ছুড়ে দিয়ে, বাক্সটার বাইরে এসে দরজা বন্ধ করে আটকে দিলাম ওটার বেরোনোর পথ। এই সংঘর্ষে ফেলে দিতে বাধ্য হয়েছি হ্যামের চামড়াটুকু, ফলে খাবার বলতে এখন আমার আছে কেবল সিকি পাইন্ট হুইস্কি। কথাটা মনে পড়তেই আমাকে পেয়ে বসল সেই ধরনের এক বিকৃতি যাতে হঠাৎ করে আক্রান্ত হয় দুষ্টু শিশুরা, আর, বোতলটা মুখের কাছে তুলে ধরে, ঢকঢক করে সব হুইস্কি সাবাড় করে, মেঝেতে আছড়ে চুরমার করে দিলাম বোতলটা।

কাচ ভাঙার প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে না যেতেই শুনতে পেলাম, স্টিরেজের দিক থেকে চাপা গলায় কে যেন ডাকছে আমার নাম ধরে। এই ডাক এতই অপ্রত্যাশিত আর তা আমার ভেতরে আবেগের এমনই আলোড়ন তুলল যে কোনো জবাবই দিতে পারলাম না। কথা বলার শক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে গেল আমার, আর, পাছে আমাকে মৃত ভেবে ফিরে চলে যায় আমার বন্ধু – ভয়াবহ এই ভাবনার যন্ত্রণায় আমি গিয়ে দাঁড়ালাম বাক্সের দরজার কাছে রাখা ঝুড়িগুলোর মাঝখানে, থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে হাঁপাতে লাগলাম কথা বলার জন্যে। একটা শব্দের ওপর যদি ভর করে হাজারটা শব্দের শক্তি, তবু আমার ওই অবস্থার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। সামনের তক্তাগুলোর ভেতর থেকে ভেসে এল একটা নড়াচড়ার শব্দ। তারপর ক্রমেই সে শব্দ হয়ে এল ক্ষীণ,

ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর। কখনোই কি ওই মুহূর্তের অনুভূতি ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ? সে চলে যাচ্ছে– আমার বন্ধু– আমার সঙ্গী, যার কাছ থেকে আমার অনেককিছু আশা করার অধিকার আছে– সে চলে যাচ্ছে– সে চলে যাচ্ছে আমাকে ফেলে– সে চলে গেল ! চলে গেল সে আমাকে শোচনীয় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে, ঘোর অন্ধকার কারাগারের ভয়ংকরতম জঘন্য মৃত্যু– অথচ একটা শব্দ – ছোট্ট একটামাত্র শব্দ আমাকে রক্ষা করতে পারত– তবু সেই একটামাত্র শব্দ আমি উচ্চারণ করতে পারলাম না ! এই যন্ত্রণা দশ হাজার মৃত্যু যন্ত্রণাকেও হার মানায়। বনবন করে ঘুরতে লাগল মাথা, দড়াম করে আছড়ে পড়লাম আমি বাক্সের প্রান্তে।

আমি পড়তেই, ঝনঝন শব্দে মেঝেতে পড়ে গেল কোমরে গোজা মাংস কাটার ছুরিটা। ওই শব্দ যেন পৃথিবীর মধুরতম সংগীত হয়ে বাজল আমার কানে ! চরম উদ্বেগে কান খাড়া করে শুনতে চাইলাম যে শব্দটা কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে অগাস্টাসের ওপর – হ্যাঁ, যে আমার নাম ধরে ডেকেছে, জানি সে অগাস্টাস ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। কয়েক মুহূর্ত নীরব হয়ে রইল চারপাশ। তারপর চাপা গলায় আবার ভেসে এল ইতস্তত সেই ডাক– 'আর্থার !' পুনরুজ্জীবিত আশা তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে দিল আমার কথা বলার শক্তি, গলা ফাটিয়ে চেঁচালাম, 'অগাস্টাস ! এই, অগাস্টাস !' 'শ্‌শ্‌শ্‌– ঈশ্বরের দোহাই চুপ করো !' জবাব দিল সে কাঁপা কাঁপা গলায় ; 'এক্ষুণি আসছি তোমার কাছে– কেবল যেতে যেটুকু সময় লাগে।' দীর্ঘ সময় ধরে পেলাম তক্তাগুলোর ভেতর দিয়ে তার এগিয়ে আসার শব্দ, এক একটা মুহূর্তকে মনে হলো এক একটা যুগ। অবশেষে কাঁধের ওপর পেলাম তার হাতের স্পর্শ, একইসঙ্গে সে আমার মুখে তুলে দিল পানির একটা বোতল। কবরের অসীম অন্ধকারে ঢুকতে ঢুকতে হঠাৎ যারা ফিরে এসেছে জীবনের উজ্জ্বল আলোয়, বা ওরকম ঘোর অন্ধকার কারাগারে ভোগ করেছে আমার মতো বুকফাটা পিপাসা, তারাই কেবল কিছুটা অনুমান করতে পারবে আমার সেই সময়ের অবস্থা, তখন একটা লম্বা চুমুকের কাছে যেন হার মেনেছে জীবনের শ্রেষ্ঠতম বিলাস।

পিপাসা খানিকটা মেটার পর অগাস্টাস পকেট থেকে বের করে দিল তিনটে কি চারটে ঠান্ডা সেদ্ধ আলু, যেগুলো খেলাম আমি গোগ্রাসে। কালিপড়া একটা লণ্ঠনও জ্বালিয়ে নিয়ে এসেছিল সে, যে আলোও খাবার আর পানির চেয়ে আমাকে কম শান্তি দিল না। কিন্তু আমি অধীর হয়ে উঠলাম তার দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণ জানতে, আর সে-ও শোনাতে বসল আমার বন্দীদশায় কী ঘটেছে জাহাজে।

অধ্যায় ৪

অগাস্টাস ঘড়িটা রেখে যাবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রওনা দিয়েছিল জাহাজ। সেদিন ছিল বিশ জুন। ইতিমধ্যেই খোলের ভেতরে আমার কেটে গেছে তিনটে দিন ; ওই সময়টাতে ডেকে, বিশেষ করে কেবিন আর স্টেটরুমগুলোতে এত মানুষ ছোটাছুটি করেছে যে পাছে গুপ্ত দরজাটার রহস্য ফাঁস হয়ে যায় ভেবে অগাস্টাস আমার কাছে আসার সাহস পায়নি। অবশেষে সে এলে আমি তাকে জানিয়েছি যে আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না ; তাই পরবর্তী দুই দিন আমাকে নিয়ে আর দুশ্চিন্তায় ভোগেনি সে – তারপরেও নিচে নেমে আসার সুযোগ খুঁজেছে। সুযোগটা পেয়েছে সে চতুর্থ দিনে। ইতিমধ্যে আমাদের অভিযানের ব্যাপারটা তার বাবাকে বলার জন্যে অনেক বার মনস্থির করেছে সে, কারণ, কথাটা জানিয়ে দিলেই আমাকে সে তুলে নিয়ে যেতে পারবে ওপরে ; কিন্তু জাহাজটা তখনো ন্যানটাকেট থেকে বেশি দূরে চলে আসেনি, তাছাড়া ক্যাপটেন বার্নার্ড এমনকিছু কথা বলেছে যাতে আমার উপস্থিতি ফাঁস হয়ে গেলে সে যে আবার জাহাজ ঘুরিয়ে ন্যানটাকেটে ফিরে যাবে না সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি অগাস্টাস। ইতিমধ্যেই যে আমার কোনো জিনিসের প্রয়োজন পড়তে পারে তা-ও ভাবেনি সে, পাশাপাশি এটাও ভেবেছে যে সত্যিই যদি তেমন প্রয়োজন পড়ে আমি গিয়ে ডাকব গুপ্ত দরজাটার নিচে থেকে। তাই আমাকে দেখতে আসার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করেনি সে, স্থির করেছে আসবে যে কোনো এক সুযোগে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে। আগেই বলেছি, সুযোগ পেল সে চতুর্থ দিনে, অর্থাৎ, খোলে যখন আমার দিন কেটে গেছে সাতটা। তারপর পানি বা কোনো খাবার সঙ্গে না নিয়েই নেমেছে সে নিচে, ভেবেছে, দেখা করে আমাকে গুপ্ত দরজাটার কাছে নিয়ে গিয়ে আমার হাতে কিছু খাবার তুলে দিলেই চলবে। কিন্তু নিচে নেমে আসতে সে দেখেছে যে আমি গভীর ঘুমে

আচ্ছন্ন, রীতিমতো নাক ডাকাচ্ছি। তার বর্ণনা অনুসারে হিসেব করে দেখলাম, এই ঘুমটা আমি ঘুমিয়েছি গুপ্ত দরজার কাছ থেকে ঘড়ি নিয়ে ফিরে আসার পরপরই, আর সেই ঘুম স্থায়ী হয়েছে অন্তত পুরো তিন দিন তিন রাত। পরে নিজের অভিজ্ঞতা আর অন্যের নিশ্চয়তা মিলিয়ে বুঝেছি, একটানা অত লম্বা একটা ঘুম আমি দিয়েছি জাহাজের বদ্ধ খোলে রাখা পুরনো মাছের তেলের গন্ধে ; তবু ভালো যে ঘুমটা তিন দিন তিন রাতের ওপর দিয়েই গিয়েছে, ওই ঘুম আমার চিরঘুম হয়ে যায়নি।

প্রথমে গুপ্ত দরজাটা খুলে রেখেই চাপা গলায় আমাকে ডেকেছে অগাস্টাস – কিন্তু আমি কোনো জবাব দিইনি। তারপর গুপ্ত দরজা বন্ধ করে ডেকেছে সে জোরে, কথাও বলেছে জোরে জোরে, শেষমেশ চেঁচিয়েছে – কিন্তু আমি অবিরাম নাক ডাকিয়েছি। তখন সে আর বুঝতে পারেনি এবার কী করা উচিত। তক্তাগুলোর ভেতর দিয়ে আমার বাক্সের কাছে আসতে বেশ খানিকটা সময় লেগে যাবে তার, ইতিমধ্যে ক্যাপটেন বার্নার্ড হয়ত লক্ষ করবে তার অনুপস্থিতি, কারণ, তখন নানারকম আয়োজন আর অভিযান-সংক্রান্ত কাগজপত্র নকল করার জন্যে ক্যাপটেনের তাকে মিনিটে মিনিটে প্রয়োজন পড়ছে। তবু সুযোগ মতো আরেক বার নিচে নামবে বলে মনস্থির করেছে সে। ওই সময় তার মনে হয়েছে, যেহেতু শান্তিতে নাক ডাকাচ্ছি, আমি বেশ আরামেই আছি, কোনো জিনিসের অভাবে পড়িনি, সুতরাং এই মুহূর্তে আমার কাছে না এলেও চলবে। এসব ভাবতে ভাবতেই শুনতে পেয়েছে সে অস্বাভাবিক এক হইচই যা ভেসে আসছে কেবিন থেকে। একলাফে গুপ্ত দরজা দিয়ে ওপরে উঠেছে সে, ওটা বন্ধ করে, খুলে দিয়েছে স্টেটরুমের দরজা। চৌকাঠের ওপর পা দিতে না দিতেই তার মুখের সামনে নেচে উঠেছে একটা পিস্তল, পরমুহূর্তেই লুটিয়ে পড়েছে সে একটা হ্যান্ডস্পাইকের আঘাতে।

শক্তিশালী একটা হাত তাকে চেপে ধরেছে কেবিনের মেঝেতে, গলাও টিপে ধরেছে কে যেন – তবু সে দেখতে পেয়েছে তার চারপাশের অবস্থা। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তার বাবা পড়ে আছে কম্প্যানিয়ন-ওয়ের সিঁড়ির পাশে, কপালের একটা গভীর ক্ষত থেকে গলগল করে বেরোচ্ছে রক্ত। মুখে তার কোনো কথা নেই, স্পষ্টতই মারা যাচ্ছে। শয়তানের মতো চোখে তাকিয়ে তার পকেট হাতড়ে চলেছে ফার্স্ট মেট, আর হাতড়াতে হাতড়াতেই সে পকেট থেকে বের করে আনল বড় একটা ওয়ালেট আর একটা ক্রনোমিটার। অস্ত্রের সন্ধানে লারবোর্ডের স্টেটরুমগুলো তছনছ করছে

সাতজন নাবিক (তাদের মাঝে নিগ্রো পাচকটাও আছে), আর দেখতে দেখতে মাস্কেট আর গুলিতে সজ্জিতও হলো তারা। অগাস্টাস আর ক্যাপটেন বার্নার্ড ছাড়া কেবিনে ছিল নয়জন লোক, জাহাজের সমস্ত লোকের মাঝে এই কয়জনই একদম পিশাচ ধরনের। আমার বন্ধুর হাত পিছমোড়া করে বেঁধে এবার পিশাচগুলো গেল ডেকে। সোজা এগোল তারা বন্ধ ফোকাসলের দিকে – কুড়াল হাতে ওটার পাশে দাঁড়াল দুজন বিদ্রোহী– অন্য দুজন দাঁড়াল মেইন হ্যাচের পাশে। এবার মেট চিৎকার করে বলল, 'নিচে যারা আছ তারা শুনতে পাচ্ছ আমার কথা ? এক এক করে উঠে এসো ওপরে, খবরদার – কোনো হইচই করবে না কেউ !' কয়েক মিনিট কাউকে দেখা গেল না – শেষমেশ উঠে এল এক ইংরেজ, জাহাজে যাকে কাজ দেওয়া হয়েছিল অনভিজ্ঞ হিসেবে, অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে করুণভাবে প্রাণভিক্ষা চাইল সে মেটের কাছে। জবাবে কুড়ালের আঘাতে দুই ফাঁক হয়ে গেল তার খুলি। একটা গোঙানি ছেড়েই হতভাগ্য মানুষটা লুটিয়ে পড়ল ডেকের ওপর, নিগ্রো পাচকটা তাকে তুলে নিল ঠিক একটা শিশুর মতো, তারপর ছুড়ে ফেলে দিল সাগরে। কুড়ালের আঘাত আর দেহটা পানিতে পড়ার ঝপাস শব্দ শুনে কোনো হুমকি বা প্রতিশ্রুতিতেই কেউ আর উঠে আসতে চাইল না ডেকে, যতক্ষণ না ধোঁয়া ছাড়া হলো ভেতরে। এবার পাওয়া গেল এগিয়ে আসার হুড়মুড় শব্দ, মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, জাহাজটা বোধ হয় শয়তানগুলোর কবল থেকে উদ্ধার পাবে। কিন্তু প্রতিপক্ষের ছয়জন উঠে আসতে না আসতেই ফোকাসল বন্ধ করে দিল বিদ্রোহীরা। তারা ছিল বিদ্রোহীদের তুলনায় সংখ্যায় অনেক অল্প আর নিরস্ত্র, তাই ছোটখাটো একটা সংঘর্ষের পরই আত্মসমর্পণ করল সবাই। কোনো দুর্ব্যবহার না করে মেট তাদের সঙ্গে বলল ভালো ভালো কথা – বোঝাই যাচ্ছিল এটা নিচের লোকদের তুলে আনার কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ, তার কথা নিচের সবাই স্পষ্ট শুনতে পাবে। শয়তানের মিষ্টি কথায় ভুলে এক এক করে ওপরে উঠে এল তারা, আর এক এক করে পিছমোড়া করে বেঁধে, আগের ছয়জনের সঙ্গে তাদের ফেলে রাখা হলো ডেকে। বিদ্রোহে যারা যোগ দেয়নি সবসুদ্ধ সেই নাবিকদের সংখ্যা দাঁড়াল সাতাশে।

তারপর শুরু হলো অতি ভয়ংকর এক হত্যাকাণ্ড। পিছমোড়া করে বাঁধা নাবিকদের নিয়ে যাওয়া হলো গ্যাংওয়েতে। অন্য বিদ্রোহীরা হতভাগ্য এক একজন মানুষকে জাপটে ধরে রাখল জাহাজের পাশে, আর নিগ্রো পাচকটার কুড়ালের কোপে ফাঁক হয়ে গেল তাদের মাথা। এভাবে খতম হয়ে গেল

বাইশজন মানুষ, প্রাণের আশা ত্যাগ করে প্রতি মুহূর্তে অগাস্টাস ভাবতে লাগল যে এবার আসবে তার পালা। কিন্তু হাবভাবে মনে হলো, হয় শয়তানেরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, নয়ত তাদের ঘৃণা এসেছে রক্তাক্ত এই কারবারের প্রতি ; কারণ, আমার বন্ধুসহ অন্য চারজনকে ডেকের ওপর ফেলে রেখে, নিচে থেকে রাম আনতে বলল মেট, আর হত্যাকারীর দল মেতে উঠল মদ্যপানোৎসবে, যা চলল সূর্যাস্ত পর্যন্ত। জীবিত কয়েকজনের নিয়তি নিয়ে তর্কবিতর্ক শুরু করল তারা, মাত্র ধাপ চারেক দূরে পড়ে থেকে তাদের প্রত্যেকটা কথা শুনল পাঁচ বন্দী। মদের নেশায় বিদ্রোহীদের মন বোধ হয় তখন অনেকটা নরম হয়ে এসেছে, কারণ, অনেকেই বন্দীদের মুক্তি দিয়ে তাদের লুটের ভাগ দিতে চাইছিল এই শর্তে যে বন্দীদের ভিড়তে হবে বিদ্রোহীদের দলে। কালো পাচকটা অবশ্য কারো কথাই শুনতে চাইল না (সবদিক দিয়ে বিচার করলে ওটা ছিল খাঁটি শয়তান, এবং অন্যদের ওপর তার প্রভাবও ছিল মেটের চেয়ে বেশি ; না হলেও অন্তত সমান সমান), আর বারবার লাফিয়ে উঠতে লাগল গ্যাংওয়েতে গিয়ে তার কাজের বাকিটুকু শেষ করার জন্যে। সৌভাগ্যক্রমে, মদ্যপান তাকে অনেকটা দুর্বল করে ফেলেছিল, তাই দলের অপেক্ষাকৃত কম রক্তপিপাসুরা তাকে সহজেই নিবৃত্ত করতে পারল। এই কম রক্তপিপাসুদের মাঝে ছিল ডার্ক পিটার্স নামক একজন লাইন-ম্যানেজার। লোকটা ছিল আপসারোকা উপজাতির এক ইন্ডিয়ান মহিলার ছেলে, যে উপজাতি বাস করে মিসৌরির উৎপত্তিস্থলের নিকটবর্তী ব্ল্যাক হিলসের সুরক্ষিত অঞ্চলে। তার বাবা ছিল পশুলোমের ব্যবসায়ী, কিংবা অন্তত কোনোভাবে যুক্ত ছিল লুইস নদীর তীরবর্তী ইন্ডিয়ান ট্রেডিং-পোস্টের সঙ্গে। পিটার্স আমার দেখা হিংস্রতম চেহারার মানুষদের অন্যতম। ছোটখাটো একজন মানুষ – উচ্চতা চার ফুট আট ইঞ্চির বেশি হবে না – কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন হারকিউলিসের মতো। বিশেষ করে তার হাত ছিল এতই মোটা আর চওড়া যা মানুষের হাত বলে মেনে নেওয়া কঠিন। তার বাহু আর পা ছিল অত্যন্ত আজব ধরনের বাঁকানো, দেখে মনে হতো ওগুলোতে বুঝি নমনীয়তার লেশমাত্র নেই। তার মাথাও ছিল বিকৃত আকারের, প্রকাণ্ড, চাঁদিতে খাঁজ (যেমনটা বেশিরভাগ নিগ্রোর মাথাতেই থাকে), আর পুরোটাই টাক। শরীরের এই খুঁতটা সে ঢেকে রাখত পরচুলা দিয়ে – আর পরচুলা হিসেবে ব্যবহার করত স্প্যানিশ কুকুরের কিংবা আমেরিকান গ্রিজলি ভালুকের চামড়া। যেদিনের কথা বলছি সেদিনও তার মাথায় ছিল ভালুকের চামড়ার পরচুলা, ফলে তার চেহারায় ফুটে উঠেছিল

আপসারোকা উপজাতির স্বাভাবিক হিংস্রতা। তার মুখ এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত বিস্তৃত ; পাতলা ঠোঁট, শরীরের অন্যান্য অঙ্গগুলোর মতোই অস্বাভাবিক, তাই তার অভিব্যক্তির কোনো পরিবর্তন হয় না, মনের গভীরে যে আবেগের খেলাই চলুক না কেন, সবসময় তার চেহারা থাকে একইরকম। তার দাঁতগুলো অতিরিক্ত লম্বা, কখনোই ঠোঁটের নিচে ঢাকা পড়ে না। তার বেরিয়ে থাকা দাঁত একনজর দেখলে যে কেউ মনে করবে, লোকটা বুঝি হাসছে – কিন্তু দ্বিতীয় বার ভালোভাবে তাকালে আতঙ্কে শিউরে উঠে সে ভাববে, হাসিই যদি হয় তাহলে অবশ্যই এটা দানবের হাসি। অদ্ভুত এই লোকের নানা ছোটখাটো গল্প ন্যানটাকেটের সাগরগামী মানুষদের মুখে মুখে ফিরত। এসব গল্পে প্রমাণ হতো যে উত্তেজিত হলে তার শরীরে ভর করে আসুরিক শক্তি, কিছু গল্পে সন্দেহ জাগৎ তার মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে। কিন্তু গ্রামপাসে সেই বিদ্রোহের দিনে সমস্ত আবেগকে ছাপিয়ে তার ভেতরে সম্ভবত জেগে উঠেছিল উপহাসের প্রবণতা। ডার্ক পিটার্সকে নিয়ে এত কথা বললাম এজন্যে যে দেখতে হিংস্র হোক আর যা-ই হোক, সে-ই মূলত অগাস্টাসের জীবন বাঁচিয়েছে, তাছাড়া মাঝেমাঝেই তার উল্লেখ করতে হবে আমার গল্পে – বলা দরকার, এটা এমন এক গল্প যার শেষের দিকে যোগ হবে এমন সব ঘটনা যেগুলো মানুষের অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বাইরে, আর যা অভিজ্ঞতার বাইরে মানুষ সেটাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে না, তাই দারুণ অসহায়ত্ব নিয়েই অগ্রসর হচ্ছি আমার গল্পে যে মানুষ এগুলো বিশ্বাস করবে কি না, তবু সময় আর উন্নতিশীল বিজ্ঞানের ওপর রাখছি গভীর আস্থা যেন মানুষ এগুলোর সহায়তায় আমার গল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর অবিশ্বাস্য অংশগুলোর সত্যতা যাচাই করে নিতে পারে।

অনেক সিদ্ধান্তহীনতা আর দু-তিন বার প্রচণ্ড ঝগড়ার পর, অবশেষে স্থির হলো যে সব বন্দীকে (অগাস্টাস ছাড়া, রসিকতার ভঙ্গিতে পিটার্স বলেছিল যে সে তাকে রেখে দিতে চায় তার কেরানি হিসেবে) ছোট একটা হোয়েলবোটে করে ভাসিয়ে দেওয়া হবে সাগরে। মেট নিচের কেবিনে দেখতে গেল ক্যাপটেন বার্নার্ড এখনো বেঁচে আছে কি না, কারণ, বিদ্রোহীরা ওপরে উঠে আসার সময় সে নিচেই ছিল। খানিক পরেই এসে উপস্থিত হলো দুজন, ক্যাপটেন মড়ার মতো ফ্যাকাশে, তবে তার জখম অনেকটা সামলে উঠেছে। প্রায় দুর্বোধ্য এক স্বরে সে কথা বলতে লাগল বিদ্রোহীদের সঙ্গে, অনুরোধ করল সাগরে ভাসিয়ে না দিয়ে তাকে যেন ফিরে যেতে দেওয়া হয় তার দায়িত্বে, কথা দিল যেখানে নামতে চায় সেখানেই তাদের

নামিয়ে দেবে সে, আর বিদ্রোহ করার জন্যে তাদের কোনো শাস্তি দেবে না। বিদ্রোহীদের হাবভাবে মনে হলো, ক্যাপটেন যেন এতক্ষণ কথা বলেছে বাতাসের সঙ্গে। মেট নিচে থাকার সময় জাহাজের পাশে যে নৌকা নামানো হয়েছিল, দুই শয়তান ক্যাপটেনের বাহু চেপে ধরে তাকে ছুড়ে ফেলল সেই নৌকায়। ডেকে পড়ে থাকা চারজনের বাঁধন খুলে দিয়ে তাদের নৌকায় ওঠার আদেশ দেওয়া হলো, এবং বিনা প্রতিবাদে তারা গিয়ে উঠল নৌকায় – অগাস্টাস কেবল পড়ে রইল তার কষ্টকর অবস্থানে, যদিও ইতিমধ্যে সে একবার অনুরোধ করেছে, যেন তাকে তার বাবাকে বিদায় জানাবার অনুমতি দেওয়া হয়। নিচের নৌকায় দেওয়া হলো কিছু সি-বিস্কিট ; কিন্তু মাস্তুল, পাল, দাঁড়, কম্পাস কিচ্ছু নয়। জাহাজের পেছনে বেঁধে নৌকাটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো কিছুক্ষণ, ইতিমধ্যে বিদ্রোহীরা সেরে নিল আরেকটা আলাপ – অবশেষে দড়ি কেটে নৌকাটাকে ভাসিয়ে দেওয়া হলো। এদিকে ততক্ষণে নেমে এসেছে রাত – চাঁদ বা তারা কোনোটাই দেখা যাচ্ছে না – কুচকুচ করছে কেবল সাগরের পানি, তবে বাতাসের তেমন বেগ নেই। নৌকাটা সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল চোখের আড়ালে, ওটার হতভাগা যাত্রীদের কোনো আশা রইল না বললেই চলে। যাই হোক, ঘটনাটা ঘটল অক্ষাংশ ৩৫°৩০′ উত্তর, আর দ্রাঘিমাংশ ৬১°২০′ পশ্চিমে, যা বারমুডা দ্বীপপুঞ্জ থেকে খুব বেশি দূরে নয়। আর তাই অগাস্টাস নিজেকে সান্ত্বনা দিল এই ভেবে যে নৌকাটা হয় সফলভাবেই তীরে পৌঁছবে নয়ত পড়বে উপকূলের কাছাকাছি কোনো জাহাজের দৃষ্টিতে।

এবার তুলে দেওয়া হলো সবগুলো পাল, আর জাহাজ আবার চলল তার দক্ষিণ-পশ্চিমের আসল পথ ধরে – বিদ্রোহীরা চালাতে চায় জলদস্যুসুলভ একটা অভিযান, আর যতদূর বোঝা গেল, তারা কেপ ভার্ড দ্বীপপুঞ্জ থেকে পোর্টোরিকোগামী কোনো জাহাজের পথরোধ করবে। অগাস্টাসের ওপর কোনো নজর দেওয়া হলো না, বাঁধন কেটে তাকে ইচ্ছে মতো ঘোরাফেরা করার সুযোগ দেওয়া হলো কেবিনের সামনের কম্প্যানিয়ন-ওয়েতে। তার প্রতি কিছুটা সহানুভূতি দেখাল ডার্ক পিটার্স, আর একবার তাকে রক্ষা করল পাচকটার হিংস্রতা থেকে। তার ভাগ্য এখনো সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, মাঝেসাঝেই মাতাল হলো বিদ্রোহীরা, ফলে তাদের অবিরাম রসিকতা কিংবা তার ব্যাপারে অসতর্কতা – কোনোটার ওপরেই ভরসা করা গেল না। তবে, অগাস্টাসের বর্ণনা অনুসারে, তার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা রইল আমাকে ঘিরে ; এবং, আমার এই বন্ধুটির আন্তরিকতা সম্বন্ধে

আমি কখনোই বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করিনি। একাধিকবার সে ভেবেছে বিদ্রোহীদের কাছে জাহাজে আমার উপস্থিতি ফাঁস করে দেওয়ার কথা, কিন্তু কাজটা করা থেকে পিছিয়ে গিয়েছে, খানিকটা তাদের পৈশাচিকতার কথা ভেবে, আবার খানিকটা এই আশায় যে সে শিগগিরই নিজেই আমাকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারবে। আশা নিয়ে রইল সে সুযোগের অপেক্ষায় ; কিন্তু সবসময় চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও শেষমেশ সুযোগ এল নৌকাটা সাগরে ভাসিয়ে দেওয়ার তিন দিন পর। সেদিন রাতের বেলা পুবদিক থেকে ধেয়ে এল ঝোড়ো বাতাস, সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে ডেকে পাঠানো হলো পাল গুটিয়ে ফেলার জন্যে। এই হইচই আর দৌড়াদৌড়ির মাঝে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে নেমে এল সে স্টেটরুমে। কিন্তু আতঙ্ক আর দুঃখের সঙ্গে দেখল যে রুমটাতে গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে সাগর অভিযানের উপযোগী মজুত আর জাহাজের আসবাবপত্র, এবং অনেক ফ্যাদম লম্বা পুরনো যে চেইন কেবলটা ছিল কম্প্যানিয়ন ল্যাডারের নিচে, একটা সিন্দুক রাখার জায়গা বের করার খাতিরে, সেটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ঠিক গুপ্ত দরজাটার ওপর ! কারো চোখে ধরা না পড়ে ওটা সরানো অসম্ভব, তাই যথাসম্ভব দ্রুত সে ফিরে এল ডেকে। আসামাত্র তার টুঁটি টিপে ধরে মেট জানতে চাইল, কেবিনে সে এতক্ষণ কী করছিল, আর মেট যখন ল্যারবোর্ড বুলওয়ার্কের ওপর দিয়ে তাকে ছুড়ে ফেলে দিতে গেল পানিতে, আবার তার জীবন রক্ষা পেল ডার্ক পিটার্সের হস্তক্ষেপে। এবার অগাস্টাসের হাতে পরানো হলো হাতকড়া (অনেক জোড়া হাতকড়া ছিল জাহাজে), শক্ত করে বাঁধা হলো পা। তারপর তাকে স্টিরেজে নিয়ে গিয়ে, ফেলে রাখা হলো ফোকাসল বাল্কহেডের পাশের একটা লোয়ার বার্থে ; ওখানে রাখার পর নিগ্রো পাচক তাকে হুমকি দিয়ে বলল, সে যেন ভুলেও আর ডেকে পা দেওয়ার সাহস না দেখায় 'যতদিনে জাহাজটা আর জাহাজ থাকবে না।' পাচকটার এই কথার অর্থ সে বুঝতে পারেনি। তবে পুরো ঘটনাটাই গেছে আমাকে মুক্ত করার পক্ষে, আর সেটাই আমি এখন বলব।

অধ্যায় ৫

পাচক ফোকাসল ছেড়ে চলে যাবার কয়েক মিনিট পর হতাশায় ভেঙে পড়ে অগাস্টাস ভাবল, জীবিত অবস্থায় এই বার্থ ছেড়ে সে বুঝি আর কখনোই বেরোতে পারবে না। মনস্থির করল যে প্রথম যে লোক নিচে নামবে তাকেই সে জানিয়ে দেবে আমার কথা, জাহাজের খোলে পিপাসায় ধুঁকে ধুঁকে মরার চেয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলাপ করে আমি যেন বেঁচে থাকার মতো একটা সুযোগ
অন্তত নিতে পারি – কারণ, আমি বন্দী হবার পর দশ দিন কেটে গেছে, আর জগে করে আমাকে যে পানি দেওয়া হয়েছিল তা এমনকি চার দিনের পক্ষেও যথেষ্ট নয়। কথাটা ভাবতে ভাবতেই তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল যে আমার সঙ্গে সরাসরি দেখা করার একটা সুযোগ সে পেলেও পেতে পারে। অন্য অবস্থায় থাকলে ঝামেলা আর ঝুঁকির কথা ভেবে কাজটা করার সাহসই সে পেত না ; কিন্তু যখন জীবনেরই কোনো ভরসা নেই, আর তার হারাবার মতোও নেই এমনকিছু – কাজটা করতে চাইল সে মনপ্রাণ দিয়ে।

কাজ করতে হলে সর্বপ্রথমে খুলতে হবে হাতকড়া। প্রথমে তার মনে হলো, এটা খোলার আশা দুরাশা ছাড়া আর কিছুই নয় ; কিন্তু ভালোভাবে লক্ষ করতেই বুঝতে পারল, সামান্য কষ্ট সহ্য করলে হাতটাকেই চাপ দিয়ে হাতকড়ার ভেতর দিয়ে গলিয়ে বের করে নেওয়া সম্ভব। এই ধরনের হাতকড়া বয়স্কদের– বড় বড়, শক্ত হাড়ে চেপে বসে থাকে, কিন্তু কম বয়েসীদের অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট, নমনীয় হাড়কে আটকে রাখতে পারে না। হাতকড়া থেকে মুক্ত হবার পর খুলল সে পায়ের বাঁধন, আর দড়িটা রেখে দিল এমনভাবে যেন কেউ বার্থের পাশে বাল্কহেডের কাছে নেমে এলে সহজেই আবার পা বেঁধে ফেলা যায়। এখানকার পার্টিশনটা একইঞ্চি পুরু নরম পাইন কাঠের তৈরি, ফলে এটা কেটে বেরিয়ে যাওয়া তার পক্ষে এমন

কষ্টকর কিছু হবে না। হঠাৎ একটা গলা শোনা গেল ফোকাসল কম্প্যানিয়ন-ওয়েতে আর সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাত ঢুকিয়ে নিল হাতকড়ার ভেতরে, দড়িটাও পেঁচিয়ে নিল গোড়ালির চারপাশে, ঠিক তখনই নেমে এল ডার্ক পিটার্স, আর তার পেছনে পেছনে টাইগার এসে, একলাফে বার্থে উঠে শুয়ে পড়ল অগাস্টাসের পাশে। কুকুরটাকে অগাস্টাসই এনেছিল জাহাজে, সে জানত পশুটার প্রতি আমার টান আর তাই ভেবেছিল, অভিযানের সময় ওটার সঙ্গ আমাকে আনন্দ দেবে। আমাকে জাহাজের খোলে জায়গা করে দেওয়ার পরপরই টাইগারকে আনতে সে গিয়েছিল আমাদের বাড়ি, কিন্তু ঘড়িটা রেখে যাবার সময় সেই কথা বলতে ভুলে গেছে। ডার্ক পিটার্সের সঙ্গে আসার আগ পর্যন্ত টাইগারকে দেখতে পায়নি অগাস্টাস, তাকে পাবার আশাও ত্যাগ করেছিল, ভেবেছিল মেটের দলের কোনো শয়তান বেচারিকে সাগরে ফেলে দিয়েছে। পরে জানা গেছে, নৃশংস ওই হত্যাকাণ্ড দেখে হাঁচড়ে পাঁচড়ে টাইগার গিয়ে ঢুকেছিল একটা হোয়েলবোটের তলার গর্তে, কিন্তু সেখানে ঘোরার মতো কোনো জায়গা না থাকায় নিজে নিজে আর বেরিয়ে আসতে পারেনি। অবশেষে ওই অবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করেছে ডার্ক পিটার্স আর কুকুরটাকে রেখে যেতে এসেছে অগাস্টাসের সঙ্গী হিসেবে ; খানিকটা লবণ, কয়েকটা আলু, আর একপাত্র পানিও নিয়ে এসেছে সে। জিনিসগুলো রেখে আবার উঠে গেল সে ডেকে, যাবার আগে বলে গেল পরদিন আবার আসবে আরও কিছু খাবার নিয়ে।

ডার্ক পিটার্স চলে যাবার পর অগাস্টাস আবার তার হাত হাতকড়া থেকে মুক্ত করে পায়ের বাঁধন খুলে দিল। তারপর তার তোশকের মাথার দিকটা ভাঁজ করে, পেন নাইফ দিয়ে (শয়তানেরা তাকে তল্লাশি করার প্রয়োজন বোধ করেনি) মেঝের কাছের পার্টিশনের একটা তক্তা কাটতে লাগল। কাটার জন্যে সে এই জায়গাটা বেছে নিয়েছিল এ কারণে যে হঠাৎ কেউ এসে পড়লে তোশকটা আগের মতো নামিয়ে দিয়ে জায়গাটা যেন ঢেকে ফেলা যায়। দিনের বাকি সময়ে আর কোনো বাধা এল না, তাই রাত নামতে নামতে তক্তাটা দুই ভাগ করে ফেলল সে। এখানে বলা দরকার যে বিদ্রোহের পর থেকে কেউ আর ফোকাসলে ঘুমায় না, সবাই থাকে কেবিনে, আর ক্যাপটেন বার্নার্ডের মজুত থেকে খাবার খায় আর ওয়াইন গেলে, জাহাজ চালানোর ক্ষেত্রে নেহাত অপরিহার্য বিষয় ছাড়া অন্য কোনো দিকে নজর দেয় না। এই পরিস্থিতি আমার আর অগাস্টাস উভয়ের পক্ষেই সৌভাগ্য হয়ে দেখা দিল কারণ, ঘটনা অন্যরকম হলে তার পক্ষে আমার

কাছে আসা সম্ভব হতো না। পরিস্থিতির সুবিধে পেয়ে সারারাতও কাঠ কাটল সে। ভোরের দিকে দ্বিতীয় আরেকটা জায়গা (প্রথম যেখানটায় কেটেছিল তার একফুট মতো ওপরে) কাটা হয়ে গেল তার, যেদিক দিয়ে সে অনায়াসেই যেতে পারবে মেইন অরলপ ডেকে। ওখানে যাবার পর মোটামুটি সহজেই সে গেল লোয়ার মেইন হ্যাচে, তবে যেতে হলো তাকে কোনো মতে প্রায় আপার ডেক পর্যন্ত একটার ওপর আরেকটা তুলে রাখা তেলের পিপেগুলোর মাঝখান দিয়ে। হ্যাচের কাছে পৌঁছতে সে দেখল, দুই সারি পিপের ফাঁক দিয়ে টাইগারও এসেছে তার পেছনে পেছনে। খোলের নিচের দিকে গুদাম বন্ধ থাকায় অগাস্টাস বুঝতে পারল, ওই বাধা পেরিয়ে সে ভোরের আলো ফোটার আগে আমার কাছে আসতে পারবে না। তাই ঠিক করল, আপাতত ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করবে আগামী রাতের জন্যে। এই পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে সে ঢিলে করতে গেল হ্যাচটা, যেন এবার এলে তাকে এখানে বেশি দেরি করতে না হয়। ঢিলে করতে কি না করতেই ছোট্ট ফাঁকটার সামনে লাফ দিয়ে পড়ল টাইগার, শুঁকল দু-এক মুহূর্ত, তারপর পা দিয়ে আঁচড়াতে আঁচড়াতে একটানা কুঁইকুঁই করতে লাগল, যেন ঢাকনাটা খুলে ফেলতে চায়। কুকুরটার আচরণে স্পষ্ট বোঝা গেল, খোলে যে আমি আছি এটা টের পেয়েছে সে, তাই অগাস্টাস ভাবল যে নিচে নামিয়ে দিলে ওটা সম্ভবত আমার কাছে চলে আসতে পারবে। এই সময়েই তার মাথায় খেলে গেল আমাকে চিরকুট পাঠাবার কথা ; যেহেতু আমি নিজে থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছি না, আর আগামীকাল সে-ই যে আমার কাছে আসতে পারবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই, চিরকুট পাঠানোটাকেই মনে হলো সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত। ভাগ্যিস তার মাথায় খেলেছিল চিরকুট পাঠাবার বুদ্ধিটা ; কারণ, ওই চিরকুট না পেলে, মরিয়া হয়ে আমি এমন কোনো পরিকল্পনা করতাম যাতে নাবিকেরা জেনে যেত আমার উপস্থিতির কথা, আর তাতে খুব সম্ভব আমাদের দুজনেরই জীবন যেত।

চিরকুট লেখার ব্যাপারে মনস্থির করার পর ঝামেলা দেখা দিল কাজটা করার জিনিসপত্র নিয়ে। দুই ডেকের মাঝখানে নিকষ অন্ধকার, তাই হাতড়ে হাতড়ে পুরনো একটা টুথপিক পেল সে কলমের কাজ চালাবার জন্যে। যথেষ্ট কাগজ পাওয়া গেল একটা চিঠির পেছন থেকে – মি. রসের তরফ থেকে বাবাকে লেখা জাল চিঠিটার ডুপ্লিকেট। প্রথমে এটাই মুসাবিদা করেছিল সে ; কিন্তু হাতের লেখাটাকে মি. রসের যথেষ্ট নকল মনে না

হওয়ায়, অগাস্টাস লিখেছিল আরেকটা চিঠি আর এটাকে গুঁজে রেখেছিল কোটের পকেটে। কালি পাবার কোনো উপায় না থাকায় পেন-নাইফ দিয়ে চিরে ফেলেছিল একটা আঙুলের পেছনটা। তারপর রক্ত দিয়ে অন্ধকারেই লিখেছিল সে চিরকুটটা। খুব সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিয়েছিল, একটা বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে ; ক্যাপটেন বার্নার্ডকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে সাগরে ; খাবার-দাবার পেয়ে যাব শিগগিরই, কিন্তু আমি যেন নিজে থেকে কিছু করার চেষ্টা না করি। চিরকুটটা শেষ করেছিল সে এভাবে 'লেখার জন্যে চিরকুটে ব্যবহার করলাম আমার রক্ত – চুপচাপ না থাকলে বাঁচতে পারবে না।'

সুতো দিয়ে কাগজটা টাইগারের গায়ে বেঁধে, ওটাকে হ্যাচওয়ে দিয়ে নিচে নামিয়ে, অগাস্টাস ফিরে গিয়েছিল ফোকাসলে, এমন কোনো চিহ্নও পায়নি যে সেখানে তার অনুপস্থিতিতে কোনো নাবিক এসেছিল। পার্টিশনের ফোকরটা ঢাকার জন্যে সে ছুরিটা গেঁথেছিল ঠিক তার ওপরে, তারপর ছুরিতে ঝুলিয়ে দিয়েছিল বার্থে পাওয়া একটা পি-জ্যাকেট। অবশেষে হাতে সে পরেছিল হাতকড়া আর পা বেঁধেছিল দড়ি দিয়ে।

কাজটা করতে কি না করতেই আমার বন্ধুর দিনের খাবার নিয়ে নিচে নেমে এল ডার্ক পিটার্স, ভীষণ মাতাল হয়ে আছে, কিন্তু রসিকতায় পূর্ণ। খাবার হলো, পোড়ানো বড় বড় গোটা বারো আইরিশ আলু আর এক কলসি পানি। বার্থের পাশে একটা সিন্দুকের ওপর বসে রইল সে কয়েক মিনিট, বকরবকর করে বলল মেট আর জাহাজের নানারকম গল্প। তার আচরণ ছিল যেমন খেয়ালি তেমনই অদ্ভুত। একসময় অগাস্টাস বেশ ভয়ই পেয়ে গেল। যাই হোক, শেষমেশ উঠে গেল সে ডেকে, যাবার আগে বিড়বিড় করে বলে গেল যে আগামীকাল বন্দীর জন্যে সে ভালো ডিনার নিয়ে আসবে। দিনের বেলা নেমে এল দুজন নাবিক (হারপুনার), আর পাচক, তিনজনেই একেবারে পাঁড় মাতাল। পিটার্সের মতোই তারাও তাদের পরিকল্পনা গড়গড় করে বলে গেল কোনোরকম রাখঢাক না করে। তাদের বকবকানিতে বোঝা গেল, কেপ ভার্ড দ্বীপপুঞ্জ থেকে আসা জাহাজটার ওপরে আক্রমণ চালানো ছাড়া আর সব ব্যাপারে তারা দুই ভাগ হয়ে গেছে। বিদ্রোহটা লুটের মাল ভাগাভাগি নিয়ে হয়নি ; বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল ক্যাপটেন বার্নার্ডের সঙ্গে চিফ মেটের ব্যক্তিগত শত্রুতা। নাবিকেরা যে ভাগ হয়ে গেছে তার একদলের নেতৃত্বে আছে মেট, আরেক দলের পাচক। এক দলের ইচ্ছে প্রথম যে জাহাজটাকে পাওয়া যায় সেটাই দখল করে সেটা দিয়ে জলদস্যুদের মতো লুটপাট চালাবে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ার দ্বীপগুলোতে। আরেক দল যেটা বেশি

শক্তিশালী আর সেই দলেই আছে ডার্ক পিটার্স – চায় মূল পরিকল্পনা অনুসারে যাবে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ; তারা হয় সেখানে তিমি শিকার করবে নয়ত অবস্থা বুঝে অন্য কিছু। ডার্ক পিটার্স অনেক বার গেছে ওই অঞ্চলে, আর তার বেশ প্রভাব রয়েছে বিদ্রোহীদের ওপর, এবং বিদ্রোহীদের মতো সে-ও দুলছে লাভ আর আনন্দের অর্ধ-প্রসবিত দোলায়। পিটার্স বাস করেছে প্রশান্ত মহাসাগরের অসংখ্য দ্বীপের অভিনবত্ব আর আনন্দের মাঝে, নিখুঁত নিরাপত্তা আর অপার স্বাধীনতার কোলে, তবে বিশেষভাবে উপভোগ্য সেখানকার তৃপ্তিকর পরিবেশ, প্রাণ ধারণের অফুরন্ত রসদ, আর মেয়েদের কামনাজাগানিয়া সৌন্দর্য। কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে এখনো সম্পূর্ণ স্থির হয়নি ; তবে দোআঁশলা লাইন-ম্যানেজারের বর্ণনা আগুন জ্বেলে দিয়েছে নাবিকদের কল্পনায়, সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে, তার পরিকল্পনাই শেষমেশ বাস্তবায়িত হবে।

ঘণ্টাখানেকের মাঝেই বিদায় নিল তিনজন, সারাদিন আর কেউ ফোকাসলে ঢুকল না। প্রায় রাত না নামা পর্যন্ত চুপচাপ পড়ে রইল অগাস্টাস। তারপর নিজেকে দড়ি আর হাতকড়া থেকে মুক্ত করে নিল তার প্রচেষ্টার প্রস্তুতি। বার্থে পাওয়া একটা বোতল ভরিয়ে নিল সে পিটার্সের কলসির পানি দিয়ে, পকেট ভরিয়ে নিল ঠান্ডা আলুতে। ছোট্ট একটুকরো মোমবাতিসহ একটা লণ্ঠন পেয়ে হলো সে আনন্দে আটখানা। সঙ্গে একবাক্স ফসফরাসের দেশলাই থাকায় এটা সে যখন খুশি জ্বালিয়ে নিতে পারবে। অন্ধকার যথেষ্ট গাঢ় হতে বেরিয়ে গেল সে বাল্কহেডের ফোকর দিয়ে, তবে যাবার আগে বার্থের বিছানার চাদর এমনভাবে জড়িয়ে রাখল যেন হঠাৎ দূর থেকে দেখলে যে কেউ মনে করে, কোনো মানুষ শুয়ে আছে চাদর মুড়ি দিয়ে। বেরিয়ে যাবার পর ছুরিতে পি-জ্যাকেটটা ঝুলিয়ে আবার ফোকর বন্ধ করে দিল সে, আর কাজটা সহজেই পারল কাটার পর তক্তাটা যথাস্থানে বসিয়ে দেয়নি বলে। এবার সে গেল মেইন অরলপ ডেকে, এবং সেখান থেকে আগের মতোই আপার ডেক আর তেলের পিপেগুলোর মাঝখান দিয়ে এগোল মেইন হ্যাচওয়ের দিকে। সেখানে পৌঁছার পর মোমবাতির টুকরোটা জ্বালিয়ে নিয়ে, গাদাগাদি করা নানান জিনিসের মাঝ দিয়ে অতি কষ্টে হাতড়াতে হাতড়াতে সে নামতে লাগল খোলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার নাক কুঁচকে গেল অসহনীয় দুর্গন্ধ আর বদ্ধ পরিবেশে। এই দূষিত বাতাসে শ্বাস নিয়ে আমার এত দীর্ঘ সময় বাঁচা অসম্ভব মনে হলো তার কাছে। বারবার সে ডাকল আমার নাম, কিন্তু আমি কোনো সাড়া দিলাম না, আর তার ভয়টাকে

সে প্রায় সত্য বলে ধরে নিল। জাহাজ তখন ভীষণভাবে দুলছে, ফলে শ্বাস নেওয়া বা নাক ডাকানোর মতো দুর্বল শব্দ তার কানে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। সুযোগ পেলেই লণ্ঠনটা খুলে সে তুলে ধরতে লাগল মাথার যথাসম্ভব ওপরে, যেন আমি বেঁচে থাকলে ওই আলো দেখে বুঝতে পারি, কেউ এসেছে আমাকে উদ্ধার করতে। তারপরেও আমার কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে তার তীব্র ভয় পরিণত হতে লাগল বদ্ধমূল আতঙ্কে। তবুও তার অনুমান পুরোপুরি সত্যি কি না তা যাচাই করতে মরিয়া হয়ে সে পৌছতে চাইল আমার বাক্সের কাছে। খানিকটা এগোল সে ভয়াবহ দুশ্চিন্তায়, তারপর দেখল, পথ এমনভাবে বন্ধ হয়ে আছে যে অন্তত সেদিক দিয়ে কোনো মতেই আর এগোনো সম্ভব নয়। দুশ্চিন্তার চাপ আর সইতে না পেরে বসে পড়ল সে তক্তাগুলোর মাঝে, আর হুহু করে কাঁদতে লাগল শিশুর মতো। ঠিক এইসময় সে শুনতে পেল মেঝেতে আছড়ে আমার বোতল ভাঙার শব্দ। ভাগ্যিস ঘটনাটা ঘটেছিল – কারণ, এই তুচ্ছ ঘটনাটাই তাকে আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ করে তুলল। অনেক বছর পর ঘটনাটা আমি পুরোপুরি বুঝতে পেরেছি। মানসিক দুর্বলতা আর সিদ্ধান্তহীনতার স্বাভাবিক লজ্জা আর অনুতাপে ওই মুহূর্তে অগাস্টাস আর আমার কাছে এগিয়ে আসতে পারেনি। পথের বাধা পেরিয়ে তৎক্ষণাৎ এগিয়ে আসাটাও সম্ভব ছিল না বলে সে তখনই ফোকাসলে ফিরে যাবার মনস্থ করেছে। তাকে এ ব্যাপারে দোষী করার আগে তার বিব্রতকর অবস্থাটাকেও বিবেচনা করতে হবে। রাত দ্রুত শেষ হয়ে আসছিল, যে কেউ আবিষ্কার করে ফেলতে পারত ফোকাসলে তার অনুপস্থিতি দিনের আলো ফোটার আগে সে বার্থে ফিরে যেতে না পারলে অবশ্যই সেরকম কিছু ঘটত। ফুরিয়ে আসছিল তার মোমবাতি, গাঢ় ওই অন্ধকারে হ্যাচওয়েতে ফিরে যেতে অসুবিধের কোনো শেষ থাকত না। এটাও মানতে হবে যে আমাকে মৃত ভাবার পক্ষে তার সঙ্গত কারণ ছিল ; সেক্ষেত্রে হাজারটা বিপদ ঠেলে আমার বাক্সের কাছে এলেও তার কোনো লাভই হতো না। সে বারবার ডেকেছে, কিন্তু তার ডাকে কোনো সাড়া দিইনি আমি। মাত্র একজগ পানি সম্বল করে আমি কাটিয়ে দিয়েছি এগারো দিন এগারো রাত। স্টিরেজের খোলা বাতাস থেকে এসে জাহাজের খোলের পরিবেশকে স্বাভাবিকভাবেই তার মনে হয়েছে চরম দূষিত – আমি এসে বাক্স দখল করার আগে মাসের পর মাস হ্যাচওয়ে খোলা ছিল বলে প্রথম দিকে বাতাস তবু অনেকটা সহনীয় ছিল, দিনে দিনে যা হয়েছে প্রায় বিষাক্ত। এসবের পাশাপাশি আরও বিবেচনা করতে হবে আমার বন্ধুর দেখা

ভয়াবহ রক্তপাত ; তার বন্দিত্ব, বঞ্চনা, অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে যাওয়া ; আর বাঁচার পরেও এখন পর্যন্ত টিকে থাকার কোনো নিশ্চয়তা না পাওয়া – মানসিক শক্তি নিঃশেষ করে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট – সুতরাং সব মিলিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকেরাও নিশ্চয় একমত হবেন যে আমার বন্ধুটি যদি বন্ধুত্বের কোনো অবমাননাই করে থাকে, তাহলে করেছে তা শোকে-দুঃখে, রাগে নয়।

বোতল ভাঙার শব্দটা স্পষ্টই শুনতে পেল সে, তবে নিশ্চিত হতে পারল না শব্দটা খোল থেকেই এসেছে। তবে এই শব্দ তার মনে জাগাল একটা সন্দেহ যা তাকে ধৈর্য ধারণে সহায়তা করল। অরলপ ডেকের কাছাকাছি যাবার পর মুহূর্তের জন্যে সে ভুলে গেল যাবতীয় বিপদের কথা, তাই ওপর থেকে নাবিকেরা শুনে ফেলতে পারে এটা ভাবা সত্ত্বেও গলা ফাটিয়ে ডাকল আমার নাম ধরে। এবার আমি ডাকটা শুনতে পেলাম, কিন্তু ভীষণ মানসিক বিক্ষোভে সে ডাকের জবাব দিতে পারলাম না। তখন সে প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেল যে তার আশঙ্কাই সত্য, তাই নিচে নেমে এল আর একটা মুহূর্তও দেরি না করে ফোকাসলে ফিরে যাবার জন্যে। এই তাড়াহুড়োয় ছোট ছোট কয়েকটা বাক্স ফেলে দিল সে যার শব্দ পেলাম আমি। ফিরতি পথ ধরে যখন অনেকটা এগিয়ে গেছে অগাস্টাস, পড়ে যাওয়া ছুরির শব্দ আবার তার মনে সন্দেহ জাগাল। ফিরে এল সে দ্বিতীয় বার, আগের মতোই গলা ফাটিয়ে আবার ডাকল আমার নাম ধরে। এবার আমি জবাব দেওয়ার মতো শক্তি খুঁজে পেলাম। আমি এখনো জীবিত আছি দেখে আনন্দে আটখানা অগাস্টাস আর কোনো বাধার কথা চিন্তা না করে আসতে চাইল আমার কাছে। পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল তক্তার গোলকধাঁধা, কিন্তু কষ্টেসৃষ্টে তার ভেতরেও একটা ফাঁক বের করে ফেলল সে, আর সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে ক্লান্তির শেষ পর্যায়ে পৌঁছে এসে উপস্থিত হলো আমার বাক্সের কাছে।

অধ্যায় ৬

এই বর্ণনার মূল কথাগুলো কেবল বলেছিল আমাকে অগাস্টাস, পরে বলেছে সমস্ত খুঁটিনাটি। পাছে তার অনুপস্থিতি কেউ আবিষ্কার করে ফেলে সেই ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিল সে, আমিও অস্থির হয়ে উঠেছিলাম এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। স্থির হলো, আপাতত আমি গিয়ে থাকব বাল্কহেডের গর্তের কাছে। টাইগারকে এভাবে ছেড়ে যেতে আমাদের কারোরই মন চাইল না ; তবে, অন্য কী করা যাবে সেটাও একটা প্রশ্ন। এখন কুকুরটাকে সম্পূর্ণ শান্ত মনে হচ্ছে, বাক্সের গায়ে কান লাগিয়েও তার শ্বাসের কোনো শব্দ শুনতে পেলাম না আমরা। টাইগার মরে গেছে ভেবে দরজা খুলতে চাইলাম। বাক্সের দরজা খুলতে দেখা গেল, আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে টাইগার, তবে বেঁচে আছে এখনো। একটা মুহূর্তও নষ্ট করার উপায় নেই, কিন্তু যে পশুটা দুই দুই বার আমার জীবন রক্ষা করেছে, তাকে রক্ষার অন্তত কিছু চেষ্টা না করে এভাবে মৃত্যুর মুখে ফেলে যেতে পারি না। টেনে-হেঁচড়ে কুকুরটাকে কোনো মতে নিয়ে চললাম দুজনে, অগাস্টাসকে আবার মাঝে মাঝে পথের বাধা সরাতে হলো – ভীষণ দুর্বল এই শরীরে যা করার ক্ষমতা আমার নেই। অবশেষে বাল্কহেডের কাছে আসতে পারলাম আমরা। তারপর সবকিছু নিরাপদে আছে দেখে সম্ভাব্য বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম ঈশ্বরকে। আপাতত বাল্কহেডের গর্তের কাছে থাকাটাই ঠিক হলো আমার, এতে প্রতিদিনের খাবারের খানিকটা অংশ আমাকে দিতে পারবে অগাস্টাস, এদিকে খোলা জায়গায় থাকার ফলে আমি পাব সতেজ বাতাস।

পাঠকদের মাঝে যাঁরা সঠিক এবং সুশৃঙ্খল জাহাজের খোল দেখেছেন, তাঁদের কাছে জাহাজের খোলের আমি যে বর্ণনা দিয়েছি তা খানিকটা আজব ঠেকতে পারে, কারণ, তিমি শিকার সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা না থাকায়

ক্যাপটেন বার্নার্ড গ্রামপাসের খোল যেমন বিশৃঙ্খল অবস্থায় রেখেছিল সেটা তার দায়িত্বে চরম অবহেলার পরিচায়ক। এমনকি আমার অভিজ্ঞতাতেও দেখেছি, বিশৃঙ্খল খোল ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটায়। উপকূলের যেসব জাহাজ দ্রুত মালপত্র ওঠানামা করায়, বিশৃঙ্খল খোলের কারণে সেসবেই দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে সবচেয়ে বেশি। লক্ষ করতে হবে, মালগুলো যেন এমনভাবে থাকে যাতে ঝড়ের দোলায় জাহাজ যতই দুলুক, সেগুলো নড়াচড়া করার কোনোরকম সুযোগ না পায়। কতটা মালপত্র তোলা হবে, পুরো নাকি আংশিক, এছাড়া মালপত্রের ধরনও লক্ষ করতে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মালপত্র মেঝের সঙ্গে আটকে রাখা হয় স্ক্রু দিয়ে। তামাক বা ময়দা এত শক্ত করে স্ক্রু এঁটে রাখা হয় যে নামানোর সময় দেখা যায়, পিপে বা হগসহেডগুলো একদম চ্যাপটা হয়ে গেছে, আর সেগুলো স্বাভাবিক আকার ফিরে পেতে খানিকটা সময় লাগে। যাই হোক, খোলের মালপত্রে অবশ্য স্ক্রু আঁটা হয় প্রধানত আরও বেশি জায়গা বের করার লক্ষে ; কারণ, মালপত্রের পুরোটাই যদি ঠাসা থাকে তামাক কিংবা ময়দাতে, তাহলে সেগুলো নড়াচড়ার কোনো ভয় থাকে না। আবার তুলা শক্ত করে স্ক্রু এঁটে রাখলে অনেক সময় চাপের চোটে এত প্রসারিত হয়ে যায় যে জাহাজ টুকরো টুকরো করে ফেলে মাঝসাগরে।

আংশিক মালপত্রের ক্ষেত্রে সেগুলো সুশৃঙ্খলভাবে রাখাটা সবচেয়ে জরুরি। ঝড়ের সময়ে বা ঝড় কেটে যাবার পরেও অনেক জাহাজ কাত হয়ে যায়, আর সোজা হতে না পেরে ডুবে যায়। ঢিলে মালপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঢিলে অবস্থায় রাখার ফলে ঝড়ের দাপটে জাহাজ কাত হওয়ামাত্র সেগুলো গড়িয়ে গিয়ে জড়ো হয় জাহাজের সেই পাশে। ফলে কাত হয়ে থাকতে থাকতে শেষমেশ জাহাজ তলিয়ে যায় পানিতে। ঢিলে মালপত্র খোলের মেঝেতে সেঁটে রাখতে হয় ওপরে কাঠের পাটাতন ফেলে, তারপর আবার সেই পাটাতনের ওপর খুঁটি দিয়ে সিলিঙের সঙ্গে ঠেস লাগিয়ে। এতে ঝড়ে জাহাজ যতই দুলুক, ঢিলে মালপত্র আর নড়েচড়ে স্থানচ্যুত হবে না। পিপে ভরতি শস্য রেখে অনেক সময় জাহাজ বন্দরে ভেড়ার পর দেখা গেছে, বেশ খানিকটা কমে গেছে শস্যের পরিমাণ। তবে এসব ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে নানারকমের কৌশল আছে।

মজার ব্যাপার হলো, আমাদের উপকূল থেকে শত শত জাহাজ, আর তারচেয়েও অনেক বেশি ইয়োরোপ থেকে, বন্দর ছেড়ে প্রতিদিন রওনা দেয় আংশিক মালপত্র নিয়ে, যেগুলোর ভেতরে থাকে নানা বিপজ্জনক জিনিস,

অথচ কোনোরকম সাবধানতা অবলম্বন না করা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা কিন্তু তেমন একটা ঘটে না। আমার জানামতে, অসাবধানতার জন্যে ভয়াবহ মাসুল দিতে হয়েছিল ক্যাপটেন জোয়েল রাইসের স্কুনার – ফায়ারফ্লাইকে। ১৮২৫ সালে শস্য ভরে নিয়ে, ভার্জিনিয়ার রিচমন্ড থেকে জাহাজটা যাচ্ছিল ম্যাডেইরা। অনেক বার অনেক জায়গায় গেছে ক্যাপটেন, সবসময় খোলের মালপত্র বেঁধেছে সাধারণভাবে, কিন্তু কখনোই বড় দুর্ঘটনার মুখে পড়েনি। এবারেই প্রথম জাহাজের খোলের অর্ধেক সে ভরে নিয়েছে শস্যে, আর সেগুলোকে ঢিলেঢালাভাবে রেখে রওনা দিয়েছে। যাত্রার প্রথম ভাগ জুড়ে রইল মৃদুমন্দ বাতাস ; কিন্তু ম্যাডেইরা যখন আর মাত্র একদিনের পথ, তীব্র বাতাস ধেয়ে এল উত্তর আর উত্তর-পূর্ব থেকে। তারপরেও ঝড়ের অনুকূলে ঘুরিয়ে নিতে জাহাজ বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে চলল। রাত নামতে কমে গেল ঝড়ের বেগ, কিন্তু তখনই জাহাজ দুলতে লাগল আগের চেয়ে বেশি। হঠাৎ জাহাজ ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে, এবার শস্য গড়িয়ে যাবার শব্দ শোনা গেল স্পষ্ট, ভেঙে ফাঁক হয়ে গেল মেইন হ্যাচওয়ে, গুলির মতো পানিতে তলিয়ে গেল স্কুনার। ম্যাডেইরা থেকে ছাড়া ছোট ছোট কয়েকটা জাহাজের একেবারে নাকের ডগায় ঘটল দুর্ঘটনাটা, কিন্তু তারা উদ্ধার করতে পারল মাত্র একজন নাবিককে (ওই একজনই কেবল বেঁচেছিল)।

গ্রামপাস এই ব্যাপারে কোনো সাবধানতা অবলম্বন করেনি, তিমি শিকারি জাহাজে তেল রাখার জন্যে যেখানে ব্যবহার করা হয় লোহার ট্যাঙ্ক, সেখানে এরা গাদাগাদি করে রেখেছিল কেবল রাশি রাশি পিপে আর জাহাজের আসবাব। অরলপ ডেকে রাখা তেলের পিপের মাঝখান দিয়ে কোনোরকমে যেতে পেরেছি আমি ; মেইন হ্যাচওয়ে ঘিরে ছিল একটা খোলা জায়গা ; আর বড় বড় বেশ কয়েকটা খোলা জায়গা। স্টোয়েজ বাল্কহেডের কাছে যে গর্তটা কেটেছে অগাস্টাস, সেখানে রয়েছে একটা পুরো পিপে রাখার জায়গা, আর আপাতত আরাম করে সেই জায়গাটাই দখল করলাম আমি।

ইতিমধ্যে আমার বন্ধু বার্থে ঢুকে হাতে হাতকড়া আর পায়ে দড়ির ফাঁস পরে নিয়েছে। সূর্য উঠে গেছে। অল্পের জন্যে আজ বেঁচে গেলাম আমরা ; কারণ, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডার্ক পিটার্স আর পাচকসহ নেমে এল মেট। কিছুক্ষণ তারা আলাপ করল কেপ ভার্ড দ্বীপপুঞ্জ থেকে ছাড়া জাহাজটার কথা, আর মনে হলো, ওটার উপস্থিতি নিয়ে তারা যেন বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। একসময় পাচক অগাস্টাসের বার্থে ঢুকে বসে পড়ল তার মাথার

কাছে। ফোকরের ওপর কাঠটা জুড়ে দেওয়া হয়নি বলে আমি আমার লুকানোর জায়গাটা থেকে সবকিছু দেখতে আর শুনতে পাচ্ছি, তবে ভয়ে আছি যে নিগ্রোটা বোধ হয় যে কোনো মুহূর্তে পি-জ্যাকেট সরিয়ে আবিষ্কার করে ফেলবে ফোকরটা, এবং সেক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ আমাদের দুজনেরই জীবনটা যাবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, জাহাজ দুলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকবার তার হাত জ্যাকেটে লাগলেও ওটা ফোকর আবিষ্কারের পক্ষে যথেষ্ট সরে গেল না। অগাস্টাস জ্যাকেটের নিচের দিকটা বেঁধে দিয়েছিল বাল্কহেডের সঙ্গে, যেন দুলে উঠে একপাশে সরে গিয়ে ফোকরটা বেরিয়ে না পড়ে। টাইগার শুয়ে আছে বার্থের পায়ের দিকে, মাঝেসাঝে চোখ মেলে তার লম্বা শ্বাস নেওয়া দেখে বুঝতে পারছি, কুকুরটা কিছুটা সেরে উঠেছে।

কয়েক মিনিট পর মেট আর পাচক চলে যেতেই ডার্ক পিটার্স এসে বসল মেটের জায়গায়। অগাস্টাসের সঙ্গে তার সহজ ভঙ্গিতে আলাপ শুনে বুঝলাম, মেট আর পাচকের সামনে সে এতক্ষণ মাতলামির ভান করছিল। আমার সঙ্গীর সব প্রশ্নেরই খোলাখুলি জবাব দিল সে ; বলল, তার বাবা নিশ্চয় এতক্ষণে কোনো জাহাজে জায়গা পেয়ে গেছে, কারণ যেদিন ক্যাপটেন বার্নার্ডকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, সেদিন সূর্যাস্তের আগেই চোখে পড়েছে পাঁচ পাঁচটা জাহাজ এসব ছাড়াও আরও অনেক সান্ত্বনার কথা শোনাল সে অগাস্টাসকে যা আমাকে বিস্মিত করার চেয়ে আনন্দিতই করল বেশি। মনে আশা জাগল যে পিটার্সকে দলে টানা গেলে হয়ত আবার জাহাজটাকে দখল করতে পারব আমরা, আর সুযোগ পাওয়ামাত্র কথাটা বললাম অগাস্টাসকে। ব্যাপারটা তার কাছেও সম্ভব মনে হলো, তবে এগোতে হবে খুব সাবধানে, চট করে দোআঁশলাটাকে কোনো প্রস্তাব দেওয়া যাবে না ; কারণ, বেশিরভাগ সময়েই সে চলে খেয়ালের ঝোঁকে, ঠিক কখন যে পুরোপুরি সুস্থ মাথায় থাকে বলা খুবই কঠিন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পিটার্স উঠে গেল ডেকে, তারপর দুপুরে অগাস্টাসের জন্যে নিয়ে এল বিরাট একটুকরো গরুর মাংস আর পুডিং। সে চলে যাবার পর বার্থে ঢুকে মাংস নিয়ে ওখানেই আমি বসে গেলাম অগাস্টাসের সঙ্গে। দিনের বেলা কেউই আর নেমে এল না ফোকাসলে, রাতে অগাস্টাসের বার্থে ঘুমালাম শান্তিতে, ভোরের দিকে ডেকের ওপর একটা হইচই শুনতে পেয়ে আমাকে জাগিয়ে দিল অগাস্টাস, আর আমিও তৎক্ষণাৎ গর্ত দিয়ে বেরিয়ে এসে গা ঢাকা দিলাম। দিনের আলো পুরো ফুটে উঠতে আমরা দেখলাম, টাইগার প্রায় সুস্থই হয়ে উঠেছে, জলাতঙ্কের আর কোনো চিহ্ন তার মাঝে নেই, পানি

দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খেল আগ্রহভরে। দিনটা কাটতে কাটতে টাইগার পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেল। তাহলে তার অদ্ভুত আচরণের জন্যে দায়ী ছিল খোলের ক্ষতিকর বাতাস, কোনো কুকুরসুলভ পাগলামি নয়। তাকে বাক্স থেকে নিয়ে আসার জন্যে আমি যে গোঁ ধরেছিলাম সেজন্যে যতটা আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল ততটা আনন্দিত আমি হতে পারলাম না। সেদিন ছিল তিরিশ জুন, ন্যানটাকেট থেকে গ্রামপাস ছেড়ে আসার তেরোতম দিন।

জুলাইয়ের দুই তারিখে নেমে এল মেট, যথারীতি মাতাল, তবে টগবগ করছে ফুর্তিতে। অগাস্টাসের বার্থে ঢুকে তার পিঠ চাপড়ে জানতে চাইল, বাঁধন খুলে দিলে সে কেবিনে না গিয়ে শান্ত হয়ে থাকবে কি না। বলা বাহুল্য, আমার বন্ধু এতে রাজি হলো, আর কোটের পকেট থেকে রামের একটা ফ্লাস্ক বের করে অগাস্টাসকে কয়েক ঢোক খাইয়ে, সত্যিই তার বাঁধন খুলে দিল শয়তানটা। দুজনেই উঠে গেল ডেকে, তিন ঘণ্টার মধ্যে আর অগাস্টাসের দেখা পেলাম না। তারপর নেমে এসে সে শুভ সংবাদ দিল যে জাহাজের যেখানে খুশি যাবার অনুমতি পেয়েছে সে, তবে ঘুমাতে হবে যথারীতি ফোকাসলেই। আমার জন্যে ভালো ভালো খাবারও এনেছে আর প্রচুর পানি। আমাদের জাহাজটা তখনো রয়েছে কেপ ভার্ড দ্বীপপুঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা জাহাজটার অপেক্ষায়, আর এখন দূরে একটা পাল দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত এটাই সেই জাহাজ। পরের আট দিনের ঘটনা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে, আর যেহেতু আমার বিবরণের মূল ঘটনাগুলোর সঙ্গে তার কোনো সরাসরি যোগাযোগ নেই, তাই সেগুলোকে একেবারে বাদ না দিয়ে একটা জার্নালের আকারে সংক্ষেপে লিখে রাখছি।

জুলাই ৩. আমাকে তিনটে কম্বল দিয়ে গেছে অগাস্টাস, আর সেগুলো দিয়ে আরামদায়ক একটা বিছানা তৈরি করে নিয়েছি লুকানোর জায়গাটায়। সারাদিন আমার সঙ্গী ছাড়া আর কেউ নিচে আসেনি। টাইগার ফোকরের কাছে বার্থে শুয়ে পড়ে গভীর ঘুম দিয়েছে, মনে হচ্ছে শরীর তার পুরোপুরি সারেনি এখনো। রাতের দিকে দমকা একটা বাতাস জাহাজে আঘাত হেনেছে পাল গুটিয়ে নেওয়ার আগেই, এবং ডুবতে ডুবতে অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে জাহাজ। বাতাসটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি, ফলে একটা পাল ছেঁড়ার ওপর দিয়েই রক্ষা পাওয়া গেছে এ যাত্রা। সারাদিন অগাস্টাসের সঙ্গে চমৎকার ব্যবহার করেছে ডার্ক পিটার্স, দীর্ঘ আলাপ করেছে প্রশান্ত মহাসাগর আর ওই অঞ্চলে তার ভ্রমণ করা দ্বীপগুলো নিয়ে। জানতে চেয়েছে, ওই অঞ্চলে আনন্দভ্রমণে গেলে সে-ও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যাবে কি

না, সেইসঙ্গে এটাও বলেছে যে দলের বেশিরভাগ লোকই ধীরে ধীরে মেটের পরিকল্পনাতে সায় দিচ্ছে। অগাস্টাস এই জবাব দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেছে যে আনন্দের সঙ্গেই সে এমন একটা অভিযানে যেতে রাজি, যেহেতু এটার চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না, বিশেষ করে জলদস্যুর জীবন বেছে নেওয়ার চেয়ে যে কোনো কাজই ভালো।

জুলাই ৪. পালটা আসলে লিভারপুল থেকে আসা ছোট একটা জাহাজের, তাই আক্রমণ না করেই ওটাকে যেতে দেওয়া হয়েছে। বেশিরভাগ সময় ডেকেই কাটিয়েছে অগাস্টাস, যেন বিদ্রোহীদের মনোভাব সম্বন্ধে সব তথ্য পাওয়া যায়। মাঝেসাঝেই তাদের হয়েছে তুমুল ঝগড়া, যার একটার জের হিসেবে হারপুনার জিম বোনারকে ফেলে দেওয়া হয়েছে পানিতে। ক্রমেই মেটের দল ভারী হচ্ছে। জিম বোনার ছিল পাচকের দলে, ডার্ক পিটার্সও সেই দলেরই একজন।

জুলাই ৫. ভোরের দিকে পশ্চিম থেকে বাতাস বইতে শুরু করেছিল জোরে জোরে, দুপুরে সেটা পরিণত হয়েছে ঝড়ে। সামনের বড় পালটা গোটাবার সময় পাচকের দলের সিমস নামের এক নাবিক নেশার ঘোরে পানিতে পড়ে ডুবে মারা গেছে – তাকে বাঁচাবার কোনো চেষ্টা করা হয়নি। এখন জাহাজে মোট মানুষের সংখ্যা তেরো, যথা ডার্ক পিটার্স, নিগ্রো পাচক সেমুর, জোনস, গ্রিলি, হার্টম্যান রজার্স, আর উইলিয়াম অ্যালেন, এরা পাচকের দলের, মেট, যার নামটা আমি কখনোই জানতে পারিনি, এবসালম হিকস ; উইলসন, জন হান্ট, আর রিচার্ড পার্কার, এরা মেটের দলের – তার সঙ্গে অগাস্টাস আর আমি।

জুলাই ৬. সারাদিন চলেছে ঝড়ের দাপট, তার সঙ্গে বৃষ্টি। বেশকিছু পানি ঢুকেছিল জাহাজে, একনাগাড়ে পাম্প চালিয়ে বের করে দিতে হয়েছে পানি, বাধ্য হয়ে হাত লাগাতে হয়েছে অগাস্টাসকেও। গোধূলির সময় চোখে পড়েছে বড় একটা জাহাজ, যেটা একদম কাছে এসে পড়ার আগে দেখা যায়নি। সম্ভবত এতদিন এই জাহাজটার অপেক্ষাতেই ছিল বিদ্রোহীরা। মেট সেটাকে ডেকেছে কিন্তু তাদের জবাব শোনা যায়নি ঝড়ের গর্জনে। রাত এগারোটায় সাগর ঝাঁপিয়ে পড়ে ভেঙে ফেলেছে লারবোর্ড বুলওয়ার্কের বেশ বড়সড় একটা অংশ, পাশাপাশি ছোটখাটো ক্ষতিও বাদ যায়নি। সকালের দিকে শান্ত হয়ে এসেছে আবহাওয়া, সূর্যোদয়ের সময় বাতাস ছিল না বললেই চলে।

জুলাই ৭. সারাদিন উথালপাতাল করেছে সাগর, জাহাজও দুলেছে ভয়ংকরভাবে, লুকানোর জায়গা থেকেই স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি খোলে মালপত্র গড়াগড়ি যাবার শব্দ। সি-সিকনেসে বেশ ভুগেছি। আজ অগাস্টাসের সঙ্গে লম্বা আলাপ করেছে ডার্ক পিটার্স, বলেছে যে তার দলের দুজন — গ্রিলি আর অ্যালেন, চলে গেছে মেটের দলে, তারা জলদস্যু হতে চায়। অগাস্টাসকে অনেক প্রশ্ন করেছে যা ওই মুহূর্তে সে বোঝেনি। সন্ধের কোনো এক সময়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জাহাজে ঢুকতে শুরু করেছে পানি, একটা পাল নামিয়ে গুঁজে দিয়ে কোনো মতে বন্ধ করা গেছে ফুটোটা।

জুলাই ৮. সূর্যোদয়ের সময়েই পুবদিক থেকে বইতে শুরু করেছে ঝিরঝিরে একটা বাতাস, মেট জাহাজ ঘুরিয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমে, ওয়েস্ট ইন্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জগুলোর কয়েকটাতে গিয়ে সে লুটতরাজ চালাতে চায়। পিটার্স বা পাচক কোনো বাধা দেয়নি ; অন্তত অগাস্টাস সেরকম কিছু শোনেনি। কেপ ভার্ড দ্বীপপুঞ্জ থেকে আসা জাহাজটাকে লুট করার পরিকল্পনা একদম বাদ দেওয়া হয়েছে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট অন্তর অন্তর পাম্প চালিয়ে এখন সহজেই পানি বের করে দেওয়া যাচ্ছে ফুটো দিয়ে। সারাদিনে দেখা গেছে ছোট দুটো স্কুনার।

জুলাই ৯. চমৎকার আবহাওয়া। সবাই হাত লাগিয়েছে বুলওয়ার্ক মেরামতের কাজে। অগাস্টাসের সঙ্গে আবার লম্বা আলাপ করেছে পিটার্স। তবে যা বলার এবার খোলাখুলিই বলেছে, এর আগে যা কখনোই করেনি। এতদিন ধরে সে এমনভাবে কথা বলত যার সঠিক অর্থ বোঝা বড় কঠিন। বলেছে, কিছুতেই সে মেটের পরিকল্পনায় সায় দিয়ে জলদস্যু হতে চায় না, এমন ইঙ্গিতও করেছে যে প্রয়োজনে মেটের কাছ থেকে সে জাহাজ দখল করে নেবে। আমার বন্ধুর কাছে সে জানতে চেয়েছে, তেমন পরিস্থিতি দেখা দিলে সে তার ওপরে নির্ভর করতে পারে কি না, যার জবাবে অগাস্টাস নির্দ্বিধায় 'হ্যাঁ' বলেছে। তখন দলের অন্যান্যদেরও এ ব্যাপারে ইঙ্গিত করবে বলে বিদায় নিয়েছে পিটার্স। দিনের বাকি সময়ে তার সঙ্গে আর ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করার সুযোগ পায়নি অগাস্টাস।

অধ্যায় ৭

জুলাই ১০. রিও থেকে নরফোকগামী একটা জাহাজ আসছে শুনলাম। আবহাওয়া ঝাপসা, পুবদিক থেকে বইছে এলোমেলো একটা হালকা বাতাস। আজ হার্টম্যান রজার্স মারা গেল, আট তারিখে একগ্লাস গ্রগ খাবার পরেই তার খিঁচুনি শুরু হয়েছিল। লোকটা ছিল পাচকের দলের, যার ওপরে ছিল পিটার্সের প্রধান ভরসা। সে অগাস্টাসকে বলেছে, মেট রজার্সকে বিষ খাইয়েছে এটা তার দৃঢ় বিশ্বাস, আর চোখকান খোলা না রাখলে শিগগিরই আসবে তার পালা। এখন তার দলে রইল কেবল সে নিজে, জোনস আর পাচক – বিপক্ষ দলে যেখানে রয়েছে পাঁচজন। মেটের হাত থেকে জাহাজ ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সে আলাপ করেছে জোনসের সঙ্গে। কিন্তু পরিকল্পনাটা নিয়ে জোনস কোনো উৎসাহ দেখায়নি, তাই সে-ও আলাপটাকে বেশি দূর গড়াতে দেয়নি, কিংবা কথাটা বলতে যায়নি পাচককে। বুদ্ধিমানের কাজই করেছে সে। কারণ, সেদিন বিকেলেই পাচক বলল যে সে মেটের দলে যোগ দেবে ; ওদিকে অযথা এক ছুতো বের করে তার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাল জোনস আর রাগের মাথায় একসময় ইঙ্গিত করল, পরিকল্পনার কথাটা সে মেটকে জানিয়ে দেবে। পরিষ্কারই বোঝা গেল, নষ্ট করার মতো সময় আর হাতে নেই, তাই অগাস্টাসের সহায়তা পেলে যে কোনো মূল্যে জাহাজ দখল করবে বলে মনস্থ করল পিটার্স। আমার বন্ধু বলল যে এজন্যে সে সব করতে রাজি, আর সুযোগ বুঝে তাকে বলে দিল আমার জাহাজে থাকার কথা। শুনে দোঁআশলা বিস্মিত হবার চেয়ে আনন্দিতই হলো বেশি, জোনসের ওপর ভরসা হারিয়ে ফেলেছিল সে, আর ইতিমধ্যেই তাকে ধরে নিয়েছিল মেটের দলের একজন হিসেবে। তক্ষুনি দুজনে নেমে এল নিচে, অগাস্টাস আমার নাম ধরে ডাকল, শিগগিরই

পরিচিত হলাম পিটার্স আর আমি। তিনজনে মিলে ঠিক করলাম, প্রথম উপযুক্ত সুযোগ পাওয়ামাত্র জাহাজটা দখল করে নেব আমরা, জোনসকে রাখলাম আমাদের দলের সম্পূর্ণ বাইরে। যদি সফল হই, জাহাজ চালিয়ে আমরা যাব সবচেয়ে কাছের বন্দরে, তারপর গ্রামপাসকে তুলে দেব উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হাতে। দলের সবাই ত্যাগ করে যাওয়ায় প্রশান্ত মহাসাগরে অভিযান চালানোর বিষয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিল পিটার্স — নাবিকবিহীন কোনো জাহাজ নিয়ে এই ধরনের অভিযান সম্ভব নয়। তাই সে ঠিক করেছে, ধরা দেবে নিজে থেকেই ; বলবে, সাময়িকভাবে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ায় সে বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়েছিল ; বিচারে ছাড়া পেলে তো ভালোই, আর যদি দোষী প্রমাণিত হয়, তাহলেও আশা করে যে অগাস্টাস আর আমার বিবৃতিতে শাস্তি থেকে ক্ষমা পেয়ে যাবে। আমাদের ভাবনাচিন্তার জাল আপাতত ছিন্ন হয়ে গেল, 'সবাই দৌড়ে এসে পাল সামলাও,' এই চিৎকারে, এবং তৎক্ষণাৎ দৌড়ে ডেকে চলে গেল পিটার্স আর অগাস্টাস।

যথারীতি নাবিকদের প্রায় সবাই ছিল মাতাল, তাই পাল ঠিক মতো গুটিয়ে ফেলার আগেই প্রচণ্ড বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ল জাহাজের ওপর। যাই হোক, বেশ খানিকটা পানি উঠে পড়া সত্ত্বেও জাহাজটাকে সামলানো গেল। সব ঠিকঠাক হতে না হতেই এল বাতাসের আরেক প্রবল ঝাপটা, আর তার পরপরই আরেকটা — তবে তেমন কোনো ক্ষতি হলো না। সারাদিন এভাবে বাতাস ধেয়ে ধেয়ে এল উত্তর আর পশ্চিম থেকে। রাত নামতে বাতাসের মাতামাতি আরও বাড়ল, উত্তাল হয়ে উঠল সাগর। অগাস্টাসকে নিয়ে পিটার্স নেমে এল ফোকাসলে, আবার শুরু হলো আমাদের জল্পনাকল্পনা।

সবাই একমত হলাম যে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পক্ষে এরকম অনুকূল সময় আর আসবে না, কারণ, কেউই অনুমান করতে পারবে না এমন সময়ে কোনো আক্রমণের কথা। প্রধান অসুবিধে হলো আমাদের দুই দলের শক্তির তারতম্য। আমরা মাত্র তিনজন, যেখানে কেবিনে রয়েছে নয়জন। জাহাজের সব অস্ত্রও রয়েছে তাদের দখলে, পিটার্সের কাছে আছে কেবল ছোট একজোড়া পিস্তল আর কোমরে গোঁজা নাবিকদের বড় একটা ছুরি। কুড়াল বা হ্যান্ডস্পাইক যেখানে থাকার কথা সেখানে পাওয়া যায়নি, যার অর্থ হলো, মেট খুব সম্ভব সন্দেহ করতে শুরু করেছে, সুযোগ পাওয়ামাত্র খতম করে

দেবে পিটার্সকে। সুতরাং আমরা যা করতে চাই তা খুব সহজে করা যাবে না, এগোতেও হবে খুব সাবধানে।

পিটার্স বলল যে সে ডেকে গিয়ে পাহারায় থাকা অ্যালেনকে ফেলে দেবে পানিতে ; তখন আমি আর অগাস্টাস ওপরে গিয়ে ডেক থেকে যা অস্ত্র পাওয়া যায় নিয়ে, কোনো বাধা আসার আগেই দখল করে নেব কম্প্যানিয়ন-ওয়ে। আমি পিটার্সের এই প্রস্তাবে সায় দিলাম না, কারণ, মেটের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, মানুষও সে চালাক, এত সহজে আমাদের ফাঁদে পা দেবে বলে মনে হয় না। জাহাজের নিয়মকানুন সম্বন্ধে আমি অতটা ওয়াকিফহাল না হলেও অন্তত এটুকু জানি যে ঝড় শুরু হলে ডেকে পাহারা বসানো হয়, কিন্তু মেট কখনোই সেই নিয়ম মানেনি। তাহলে হঠাৎ করে এখন সে পাহারা বসাল কেন ? নিশ্চয় তার মনে সন্দেহ জেগেছে, আর এই সন্দেহ জাগার অর্থ হলো, প্রথম সুযোগেই বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সে খতম করে দেবে পিটার্সকে।

অগাস্টাস পরামর্শ দিল যে পিটার্স যদি কোনো কৌশলে গুপ্ত দরজার ওপর থেকে চেইন-কেবলটা সরিয়ে দিতে পারে, তাহলে খোলের দিক থেকে আমরা আক্রমণ চালাতে পারি তাদের অসতর্ক অবস্থায়। কিন্তু সবাই মিলে ভেবে দেখলাম, ঝড়ে জাহাজ যেভাবে দুলছে আর লাফাচ্ছে তাতে কিছুতেই এই পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব নয়।

সৌভাগ্যক্রমে, হঠাৎ আমার মাথায় খেলে গেল একটা বুদ্ধি। ঠিক করলাম, মেটের কুসংস্কারাচ্ছন্ন আতঙ্ক আর অপরাধবোধকে ব্যবহার করব। আগেই বলেছি, দুই দিন আগে স্পিরিট আর পানি খেয়ে খিঁচুনিতে আক্রান্ত হবার পর আজ সকালে হার্টম্যান রজার্স নামক একজন নাবিক মারা গেছে। পিটার্স আমাদের বলেছে যে সে বিশ্বাস করে, মেট বিষ খাইয়ে রজার্সকে মেরেছে, তবে কেন বিশ্বাস করে এটা আর ব্যাখ্যা করেনি – এই দুর্বোধ্যতা তার অদ্ভুত চরিত্রবৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম। তবে সন্দেহ করার পক্ষে তার সঙ্গত কারণ আছে কি না তা পরিষ্কার না বুঝেও আমরা আমাদের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাব বলে মনস্থ করলাম।

রজার্স এগারোটার দিকে মারা গেছে মারাত্মক খিঁচুনিতে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই লাশটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সত্যি বলতে কী, এত ভয়াবহ লাশ আমি জীবনে দেখিনি। পেটটা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে ঠিক

যেমন হয় কোনো লাশ অনেক সপ্তাহ পানির নিচে থাকলে। হাত দুটোরও একই অবস্থা, কিন্তু মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে আর তা চকের মতো সাদা ; তবে সেই সাদার মাঝে ফুটে আছে লাল টকটকে দু-তিনটে ছোপ, যেমনটা হয় কেউ ইরিসিপেলাসে ভুগলে একটা ছোপ মুখের ওপর দিয়ে কোনাকুনিভাবে গিয়ে একটা চোখ ঢেকে ফেলেছে লাল ভেলভেটের ফিতার মতো। বীভৎস সেই লাশ পানিতে ফেলে দেওয়ার জন্যে কেবিন থেকে বের করে আনতেই, মেট একনজর দেখে (সে এই প্রথম দেখেছে), তার অপরাধের অনুশোচনাতেই হোক কিংবা বীভৎস ওই দৃশ্যের আতঙ্কে, নাবিকদের আদেশ দিয়েছে যে সাগর-সমাধির যথাযথ নিয়ম পালন করেই ওটার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হোক। আদেশ দিয়েই তড়িঘড়ি নিচে নেমে গেছে মেট, ভাবখানা যেন লাশটাকে তার আর না দেখতে হয়। তার আদেশ পালনের জন্যে যখন জোগাড়যন্ত্র চলছে, তখনই ঝড় এসে পড়ায় আপাতত কাজটা বাদ দিতে হলো। লারবোর্ডে পড়ে পড়ে ভিজতে লাগল লাশটা, আর ওলট-পালট করতে লাগল জাহাজ দোলার তালে তালে।

যথাসম্ভব দ্রুত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা চালালাম আমরা। পিটার্স ডেকে যেতেই মুখোমুখি হলো অ্যালেনের, নজর রাখছিল সে ফোকাসলের দিকে। দ্রুতই নির্দিষ্ট হয়ে গেল শয়তানটার নিয়তি ; যেন আলাপ জুড়বে এমন ভঙ্গিতে তার দিকে এগিয়ে গেল পিটার্স, তারপর খপ করে তার টুঁটিটা চেপে ধরে কোনো চিৎকার ছাড়ার আগেই বুলওয়ার্কের ওপর দিয়ে ফেলে দিল পানিতে। এবার তার ডাকে ওপরে গেলাম আমরা। প্রথম কাজ হলো, কোনো একটা অস্ত্রে নিজেদের সজ্জিত করা। জাহাজ এত দুলছে যে ডেকের ওপর দিয়ে এগোতে হলো খুব সাবধানে। এদিকে কাজও সারতে হবে একমুহূর্ত নষ্ট না করে, জাহাজে দ্রুত পানি ঢুকছে বলে পাম্প চালাতে যে কোনো সময় মেট উঠে আসতে পারে ওপরে। কয়েক মিনিট খোঁজ করার পর অস্ত্র বলতে পাওয়া গেল দুটো পাম্প-হ্যান্ডেল, যার একটা নিল অগাস্টাস আর একটা আমি। এবার লাশটার কাপড়চোপড় খুলে নিয়ে ওটাকে ফেলে দিলাম আমরা পানিতে। তারপর অগাস্টাসকে ডেকের ওপর পাহারায় রেখে নিচে গেলাম আমি আর পিটার্স। অ্যালেনের স্থান দখল করে, কেবিন কম্প্যানিয়ন-ওয়ের দিকে পেছন ফিরে এমনভাবে দাঁড়াল অগাস্টাস, যেন মেটের দলের কেউ হঠাৎ ওপরে উঠে এলে তাকেই পাহারাদার মনে করে।

নিচে যাওয়ামাত্র আমি নিতে লাগলাম রজার্সের লাশের ছদ্মবেশ। খুলে নেওয়া শার্টটা আমাদের খুব সাহায্যে এল, যা সে পরেছিল তার অন্য পোশাকের ওপরে– আঙরাখামার্কা শার্টটা যে কেউ চিনতে পারবে একনজরে। আসলে এটা একটা নীল স্টকিনেট, ওপরে আড়াআড়িভাবে বড় বড় সাদা ডোরা। শার্টটা পরার পর লাশটার ভয়াবহ বিকৃতির আদলে বিছানার চাদর গুঁজে ফুলিয়ে নিলাম পেটটা। এবার হাতও ফুলিয়ে নিলাম ভেতরে সাদা পশমি দস্তানা আর আজেবাজে ন্যাকড়া ঢুকিয়ে। সবশেষে পিটার্স আমার মুখে ঘষল সাদা চক, আর লাল ছোপ দিল নিজের আঙুল চিরে রক্ত বের করে। চোখের ওপর দিয়ে কোনাকুনি লাল দাগটার কথাও ভুলল না সে, এবং সব মিলিয়ে আমার চেহারা হলো রীতি মতো ভয়াবহ।

অধ্যায় ৮

কেবিনে যে আয়নার টুকরো ঝোলানো আছে, লণ্ঠনের স্বল্প আলোয় সেখানে আমার প্রতিবিম্ব দেখে এমন আঁতকে উঠলাম যে আপাদমস্তক কাঁপতে লাগল থরথর করে, এমন ঘাবড়ে গেলাম যে পরিকল্পনামাফিক কাজ করার কথা ভাবতেই পারলাম না। তারপরেও কাজ তো করতেই হবে, তাই পিটার্স আর আমি ডেকে গেলাম।

সেখানকার পরিস্থিতি নিরাপদ দেখে, বুলওয়ার্কের পাশ ঘেঁষে আমরা তিনজনে গেলাম কেবিন কম্প্যানিয়ন-ওয়ের কাছে। জায়গাটা আংশিক বন্ধ, হঠাৎ করে কিছু গড়িয়ে এসে যেন কেবিনের মুখ বন্ধ করে দিতে না পারে, তাই সিঁড়ির ওপরে ফেলে রাখা হয়েছে কাঠের টুকরো। কবজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম কেবিনের ভেতরটা। ভাগ্যিস তাদের হঠাৎ আক্রমণ করতে যাইনি, কারণ, তারা সজাগ হয়ে আছে। মাত্র একজনই ঘুমাচ্ছে, পাশে একটা মাস্কেট নিয়ে শুয়ে আছে সে কম্প্যানিয়ন-ল্যাডারের নিচে। বাকিরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে বার্থ থেকে এনে মেঝেতে বিছানো বেশ কয়েকটা তোশকের ওপর। নিজেদের মধ্যে গভীর আলাপে ব্যস্ত তারা আর শূন্য দুটো জগ এবং গড়াগড়ি যাওয়া কয়েকটা টিনের টাম্বলার দেখে এখানে মদ্যপানোৎসব হয়েছে মনে হলেও অন্যান্য দিনের মতো আজ তারা অতটা মাতাল নয়। সবার কাছে ছুরি আছে, দু-একজনের কাছে পিস্তল, আর পাশের বার্থেই আছে অনেকগুলো মাস্কেট।

রজার্সের ভূত হয়ে ভয় দেখানো ছাড়া তখনো আক্রমণের আর কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি আমরা, তাই চুপচাপ শুনতে লাগলাম তাদের আলাপ। তারা আঁটছে জলদস্যুগিরির পরিকল্পনা – প্রথমে তারা হাত করার চেষ্টা

করবে হর্নেট নামক একটা জাহাজের নাবিকদের, তারপর সেই জাহাজ দিয়েই চালাবে জলদস্যুতা। তবে ঠিক কীভাবে তারা কাজটা করবে তা আমরা কেউই বুঝতে পারলাম না।

একজন তুলল পিটার্সের কথা, যার জবাবে মেট এত গলা নামিয়ে কথা বলল যে কিছুই শোনা গেল না, তবে শেষের দিকে সে গলা চড়িয়ে বলল, 'ফোকাসলের কাছে ক্যাপটেনের ছোঁড়াটার সঙ্গে ব্যাটার ফিসফিসানি আমার ভালো লাগেনি, দুটোকেই যত শিগগির সম্ভব পানিতে ফেলে দেওয়াই মনে হয় ভালো।' মেটের কথার জবাব দিল না কেউ, তবে বুঝতে আমাদের অসুবিধে হলো না, তার ইশারা নাবিকেরা বেশ পরিষ্কারই বুঝেছে, বিশেষ করে জোনস। যখন দেখলাম, অগাস্টাস বা পিটার্স কেউই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছে না কীভাবে করবে কাজটা, ভীষণ অস্থির হয়ে উঠলাম আমি। তাই শেষমেশ স্থির করলাম, আতঙ্কের এই জ্বালা আমি আর সহ্য করব না, প্রয়োজনে বিলিয়ে দেব জীবনটা।

ঝড়ের সোঁ সোঁ আর ডেকে পানি ওঠার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ছাপিয়ে বিদ্রোহীদের আলাপ খুব একটা শোনা যাচ্ছিল না, ঝড়ের শব্দ কমে এলেই কেবল মাঝেসাঝে কানে আসছিল কিছু কথা। এমনই একবার আমাদের সবার কানে এল, মেট একজন নাবিককে আদেশ দিচ্ছে, 'যাও, এক্ষুণি ওই দুটোকে কেবিনে আসতে বলো, তাহলে আমরা সবাই ওদের ওপর চোখ রাখতে পারব, আড়ালে কোনো ষড়যন্ত্র করার সুযোগ ব্যাটাদের দেওয়া যাবে না।' আদেশ পালন করার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল পাচক, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আদেশ পালনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াল ঝড়। তীব্র এক ঝাপটায় হঠাৎ কাত হয়ে গেল জাহাজ, মাথা নিচু করে ছিটকে গিয়ে পাচক ধাক্কা খেল লারবোর্ডের একটা স্টেটরুমের দরজায়, দুটো পাল্লাই হাট হয়ে খুলে গেল দুদিকে। ভাগ্যিস আমরা কেউ ছিটকে যাইনি, তাই ডেকে না এসে পাচক কম্প্যানিয়ন-হ্যাচ দিয়ে মাথা বের করার আগেই দ্রুতপায়ে আমরা ফিরে এলাম ফোকাসলে। পাচক যেখানটায় এসে দাঁড়াল সেখান থেকে তার পক্ষে অ্যালেনকে দেখা সম্ভব নয়, তাই সে কেবল পুনরাবৃত্তি করল মেটের আদেশ। পিটার্স তখন অ্যালেনের গলা নকল করে বলল, 'পাঠিয়ে দিচ্ছি, হ্যাঁ, এক্ষুণি,' আর তা শুনেই পাচক নেমে এল নিচে, কোথাও উল্টোপাল্টা কিছু ঘটেছে এমন কোনো সন্দেহ তার মনে জাগল না।

আমার দুই সঙ্গী এবার গটগট করে গিয়ে ঢুকল কেবিনে, দরজাটা লাগিয়ে দিল পিটার্স। তাদের সঙ্গে সম্ভাষণের ভান করে, মেট অগাস্টাসকে

বলল যে সে যেহেতু কোনো গোলমাল পাকায়নি, এখন থেকে সে কেবিনে থাকতে পারে তাদেরই একজন হয়ে। তারপর তাকে এগিয়ে দিল সে আধ টাম্বলার রাম। তারা দুজন কেবিনে ঢোকামাত্র আমি আগের জায়গাতেই অবস্থান নিয়েছিলাম বলে সবই দেখতে আর শুনতে পেলাম। সঙ্গে করে আনা পাম্পের হ্যান্ডেল দুটোর একটা আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম কম্প্যানিয়ন-ওয়ের কাছে।

নিজেকে এবার প্রস্তুত করলাম, পরিকল্পনামাফিক পিটার্স সঙ্কেত দেওয়ামাত্র আমার ভূমিকাটুকু পালন করার জন্যে আমি ঢুকে পড়ব কেবিনে। প্রথম থেকেই আলাপ জুড়েছিল পিটার্স, এবার কৌশলে আলাপটাকে সে এমনভাবে ঘুরিয়ে দিল বিদ্রোহীদের হত্যাকাণ্ড আর রক্তারক্তির দিকে যে ধীরে ধীরে তারাও শুরু করে দিল নাবিকদের মাঝে চালু হাজাররকম কুসংস্কারের গল্প। সব কথা শুনতে পেলাম না, তবে স্পষ্ট দেখতে পেলাম নাবিকদের চেহারায় ফুটে ওঠা আতঙ্কের ছাপ। সবচেয়ে আতঙ্ক ফুটল মেটের চেহারায়, আর ঠিক সেইসময় কোন নাবিক যেন তুলল রজার্সের বীভৎস লাশের কথা ; হাবভাবে মনে হলো, মেট যে কোনো মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। এবার পিটার্স তার কাছে জানতে চাইল, বীভৎস যে লাশটার দিকে তাকানো পর্যন্ত যাচ্ছে না, সেটাকে ওভাবে গড়াগড়ি খেতে না দিয়ে সাগরে ফেলে দেওয়াটাই কি ভালো নয় ? প্রশ্নটা শুনে প্রায় হাঁসফাঁস করতে লাগল শয়তানটা, একবার এই নাবিক আরেকবার ওই নাবিকের মুখের দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগল যেন বলতে চায়, ওদেরই কেউ একজন গিয়ে সেরে আসুক কাজটা। কিন্তু জায়গা ছেড়ে একচুলও নড়ল না কোনো নাবিক, তাদের সবাই ভুগতে শুরু করেছে চরম মানসিক উত্তেজনায়। এবার আমাকে সঙ্কেত দিল পিটার্স। তৎক্ষণাৎ কম্প্যানিয়ন-ওয়ের দরজাটা খুলে নিঃশব্দে আমি গিয়ে দাঁড়ালাম দলটার মাঝখানে।

নানারকম পরিস্থিতি বিবেচনা করলে ভূতের হঠাৎ আবির্ভাব ওখানে যে ভয়ংকর প্রতিক্রিয়াটা ঘটিয়েছিল তা নিয়ে মোটেই অবাক হবার মতো কিছু নেই। সাধারণত এরকম পরিস্থিতিতে দর্শকের মনে ক্ষীণ একটা সন্দেহ থেকে যায় যে সে যা দেখছে তা বুঝি বাস্তব নয় ; যত দুর্বলই হোক, এরকম একটা আশা জেগে থাকে যে তার চোখ তাকে ছলনা করছে, ভূতটাকে সামনে ঘোরাফেরা করতে দেখলেও ওটা ঠিক ছায়ার জগৎ থেকে আসেনি। এই ধরনের প্রায় সব দৃশ্যেই থাকে সন্দেহের লেশ, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দোলার চেয়ে মনই আতঙ্ক ফুটিয়ে তোলে যে ভূতটা বোধ হয় রীতি

মতো বাস্তব, কোনো অবাস্তব দৃশ্য নয়। কিন্তু বিদ্রোহীদের মনে সেরকম সন্দেহের কোনো লেশও রইল না যে এটা রজার্সের লাশের কোনো ছদ্মবেশ নাকি সত্যিই এসে উপস্থিত হয়েছে তার অশরীরী আত্মা। জাহাজটার নিঃসঙ্গতা, ঝড়ের মাতামাতি মিলিয়ে এমনিতেই তৈরি হয়েছিল একটা গা ছমছমে পরিবেশ। অন্য কারো উপস্থিতি সম্বন্ধে তাদের সন্দেহ করারই কোনো উপায় ছিল না, কারণ, ডেকে পাহারায় থাকা অ্যালেন ছাড়া নাবিকদের আর সবাই ছিল কেবিনে ; তার বিশাল শরীরটাও (সে ছিল সাড়ে ছয় ফুট লম্বা) ছিল সবার সুপরিচিত, সুতরাং অত বড় অ্যালেন তো আর ছোটখাটো রজার্সের ভূত সাজতে পারে না। এসবের পাশাপাশি যোগ হয়েছিল পিটার্সের গল্পে নাবিকদের মনে জাগা আতঙ্ক ; ভূত হিসেবে আমার নিখুঁত ছদ্মবেশ ; দুলতে থাকা কেবিন-লণ্ঠনের আধো আলো আধো ছায়া ; জাহাজে আমার উপস্থিতির বিষয়টা নাবিকদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকা। তোশকের ওপর থেকে লাফিয়ে উঠল আধশোয়া মেট, পরমুহূর্তেই দড়াম করে আছড়ে পড়ল তার প্রাণহীন দেহ, জাহাজ দুলে ওঠায় কাঠের গুঁড়ির মতো গড়িয়ে গেল একপাশে। বাকি সাতজনের তিনজন ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে অসাড় হয়ে গেলেও বুদ্ধি পুরোপুরি গুলিয়ে যাবার হাত থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা করতে পারল নিজেদের। কিন্তু অন্য চারজন পাথরের মূর্তির মতো মেঝেতে বসে কেবল তাকিয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে। বাধার সম্মুখীন হলাম আমরা পাচক, জন হান্ট, আর রিচার্ড পার্কারের তরফ থেকে ; তবে সে বাধা সবলও নয়, যথেষ্টও নয়। প্রথম দুজন লুটিয়ে পড়ল পিটার্সের গুলিতে, আর আমি পার্কারকে শুইয়ে দিলাম মাথায় পাম্প-হ্যান্ডেলের বাড়ি মেরে। ইতিমধ্যে মেঝেতে পড়ে থাকা একটা মাস্কেট তুলে নিয়ে অগাস্টাস গুলি চালাল আরেক বিদ্রোহীর (উইলসন) বুকে। ফলে রইল বাকি তিন ; ইতিমধ্যে ঘোর কাটিয়ে উঠে তারা সম্ভবত আঁচ করতে পারল প্রতারণার ব্যাপারটা, তাই সর্বশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের ওপর ; পিটার্সের আসুরিক শক্তি সহায়তায় না এলে আমরা সম্ভবত সেদিন তাদের সঙ্গে পেরে উঠতাম না। এই তিনজন হলো – জোনস, গ্রিলি আর এবসালম হিকস। অগাস্টাসকে মেঝেতে ফেলে তার ডান বাহুর বেশ কয়েকটা জায়গায় ছুরি চালাল জোনস, আর অবশ্যই তাকে খতমও করে ফেলত শিগগির (যেহেতু পিটার্স আর আমি নিজ নিজ শত্রুর হাত থেকেই ছাড়া পাইনি তখনো), যদি না একজন বন্ধুর সাহায্য পেতাম যথাসময়ে, যার সাহায্যের ওপর আমরা নির্ভরই করিনি। সেই বন্ধুটা হলো টাইগার। চরম

সঙ্কটময় একটা মুহূর্তে চাপা এক গর্জন ছেড়ে টাইগার ছুটে এল কেবিনে, আর জোনসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে প্রায় গেঁথে ফেলল মেঝেতে। আমার বন্ধু তখন এতটাই আহত যে আমাদের কোনোরকম সহায়তায় আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়, আর ছদ্মবেশের বোঝা নিয়ে আমিও কাউকে সহায়তা করার অবস্থায় নেই বললেই চলে। জোনসের টুঁটি কামড়ে ধরে পড়ে রইল টাইগার, বাকি দুজন লোকের পক্ষে পিটার্সই যথেষ্ট, লড়ার জায়গাটা সঙ্কীর্ণ না হলে আর ঝড়ে জাহাজ ভীষণভাবে না দুললে, অনেক আগেই তাদের খতম করে ফেলত সে। মেঝেতে পড়ে থাকা ভারী টুলগুলোর একটা তুলে নিল পিটার্স আর গ্রিলি একটা মাস্কেট দিয়ে আমাকে গুলি করার আগের মুহূর্তে চুরমার করে দিল তার খুলি, তার পরপরই জাহাজের দোলায় সে ছিটকে গিয়ে পড়ল হিকসের গায়ে, এবং চোখের পলকে গলা টিপে খতম করে দিল তাকে। এভাবে, বর্ণনা দিতে যে সময় ব্যয় করলাম, তারচেয়েও কম সময়ে জাহাজটা এসে গেল আমাদের দখলে।

প্রতিপক্ষের বেঁচে রইল কেবল রিচার্ড পার্কার। লড়াইয়ের শুরুতেই তাকে আমি শুইয়ে দিয়েছিলাম পাম্প-হ্যান্ডেলের বাড়িতে। নিশ্চল হয়ে পড়েছিল সে বিধ্বস্ত স্টেটরুমের দরজার কাছে ; কিন্তু পিটার্স তাকে পা দিয়ে নাড়া দিতেই হাউমাউ করে উঠে প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগল সে। মাথার সামান্য একটা অংশ কেটে গেছে তার, এছাড়া আর কোথাও জখম হয়নি, হ্যান্ডেলের আঘাতে কেবল অচেতন হয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে। সে উঠে দাঁড়াতে, আমরা তার হাত বাঁধলাম পিছমোড়া করে। কুকুরটা তখনো জোনসকে ধরে গজরাচ্ছে ; কিন্তু পরীক্ষা করতে আমরা দেখলাম, মারা গেছে সে, টাইগারের কামড়ে টুঁটি ছিঁড়ে যাওয়ায় গভীর ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে গলগল করে।

একটা বাজে অবস্থা এখন, বাতাস বয়েই চলেছে তীব্রবেগে। ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠছে জাহাজের অবস্থা। শিগগিরই কিছু একটা না করলেই নয়। ঝড়ের এক একটা ঝাপটায় পানি উঠে পড়ছে জাহাজে। মড়মড় শব্দ ভেসে আসছে মূল মাস্তুল থেকে, ভেঙে পড়তে পারে ওটা যে কোনো মুহূর্তে। মোট কথা, লড়াই চলাকালীন খুবই খারাপ হয়ে গেছে জাহাজের অবস্থা, যেগুলোর মাঝে সবচেয়ে খারাপ হলো অন্তত সাত ফুট পানি জমে যাওয়া।

নাবিকদের লাশ কেবিনেই ফেলে রেখে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আমরা পাম্প নিয়ে – আমাদের সহায়তা করার জন্যে ইতিমধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল

পার্কারকে। অগাস্টাসের বাহু যথাসাধ্য ব্যান্ডেজ করে দিলাম আমরা, কাজে হাতও লাগাল সে, কিন্তু ওই জখম নিয়ে তেমন একটা কাজ করতে পারল না। যাই হোক, একটা পাম্প অবিরাম চালাতে খানিকটা রেহাই পাওয়া গেল। এখন আমরা অবশিষ্ট আর মাত্র চারজন বলে মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম হলো ; কিন্তু মনোবল চাঙ্গা রাখলাম আমরা, আর অপেক্ষায় রইলাম সকালের, যখন মূল মাস্তুলটা কেটে দিয়ে জাহাজটাকে আমরা খানিকটা হালকা করব বলে ভাবছি।

এভাবেই কাটল ভয়ংকর এক দুশ্চিন্তা আর অবসাদের রাত, কিন্তু অবশেষে যখন ফুটল দিনের আলো, না কমল ঝড় বা পাওয়া গেল ঝড় কমার কোনো চিহ্ন। লাশগুলো ডেকে টেনে এনে ফেলে দিলাম আমরা সাগরে। এবার মূল মাস্তুল কেটে ফেলার পালা। কেবিন থেকে কুড়াল এনে মাস্তুল কেটে দিল পিটার্স, জাহাজের তেমন কোনো ক্ষতি না করে সেটা সাগরে পড়ে ডুবে গেল কাঠ আর দড়িদড়াসুদ্ধ। জাহাজ খানিকটা হালকা হলো, কিন্তু আমাদের অবস্থার কোনো উন্নতি হলো না, ফুটো দিয়ে পানি ঢোকার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে দুটো পাম্পই চালু করা ছাড়া উপায় রইল না। খুব কমই আমাদের সহায়তা করতে পারল অগাস্টাস। দুর্দশা আরও বাড়াবার জন্যেই যেন উত্তাল সাগর জাহাজটাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল বাতাসমুখী, কিছুক্ষণের জন্যে মনে হলো, ডুবে মরার কবল থেকে কেউ আমাদের উদ্ধার করতে পারবে না। যাই হোক, অতি কষ্টে জাহাজটাকে আবার সোজাপথে আনতে পারলেও পাম্প চালানোর শক্তি আমাদের আর তেমন রইল না। পাম্প চালানোর অভ্যেস না থাকায় ইতিমধ্যেই আমাদের হাত কেটে রক্ত ঝরতে শুরু করেছিল দরদর করে।

এবার পার্কের নিষেধ করা সত্ত্বেও কেটে দিলাম আমরা সামনের মাস্তুলটা। ওটা সাগরে গিয়ে পড়ার সময় ভেঙে নিয়ে গেল জাহাজের সামনের খানিকটা অংশ।

এত ঝড়েও এ যাবৎ লংবোটটা সম্পূর্ণ অক্ষত থাকায় অন্তত একটা আনন্দ নিয়ে ছিলাম আমরা। কিন্তু এই আনন্দ আর বেশিক্ষণ থাকল না ; সামনের মাস্তুলটাই যথাসম্ভব সোজা করে রাখত জাহাজটাকে, তাই ওটার সঙ্গে সামনের পালটাও সাগরে চলে যাওয়ায় পানি উঠতে লাগল আরও বেশি বেশি করে, খুলে গেল লংবোট আর স্টারবোর্ড বুলওয়ার্ক, টুকরো টুকরো হয়ে গেল চরকিটাও। আমাদের অবস্থা হলো শোচনীয়।

দুপুরের দিকে ঝড়টা একটু কমল মনে হলো, কিন্তু সেটা ছিল স্রেফ সাময়িক একটা বিরতি, কয়েক মিনিট পরেই যেন আবার নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করে ফুঁসে উঠল ঝড়। বিকেল চারটের দিকে ঝড়ের ঝাপটা চলে গেল আমাদের সহ্যের বাইরে ; আর ধীরে ধীরে যখন নেমে আসতে লাগল রাত, মনে হলো, সকাল পর্যন্ত জাহাজটা আর টিকবে না।

মাঝরাতের দিকে পানি উঠে গেল অরলপ ডেক পর্যন্ত। তারপরেই ভেঙে গেল হাল। জাহাজের পেছনে লোহার পাত দিয়ে এত মজবুতভাবে হালটা আটকানো ছিল যে ওটা ভেঙে যাবার কথা আমরা কখনোই কল্পনা করিনি।

দম নেওয়ার ফুরসত পেতে না পেতেই প্রবল গর্জনে ঢেউ এবার সোজা আছড়ে পড়ল জাহাজের ওপর, কম্প্যানিয়ন-ওয়েটাকে পুরোপুরি ভাসিয়ে দিয়ে, ছুটে গেল হ্যাচওয়ের দিকে, জাহাজের পুরোটাই ডুবিয়ে দিল পানিতে।

অধ্যায় ৯

ভাগ্যিস রাত নামার আগেই আমরা চারজনেই নিজেদের বেঁধে নিয়েছিলাম চরকির সঙ্গে। এই সাবধানতাই আমাদের ধ্বংস হবার হাত থেকে রক্ষা করল। পানির চাপে আমরা সবাই বোধ হয় কিছুক্ষণের জন্যে অচেতন হয়ে গিয়েছিলাম, দম ফিরে পেতেই চিৎকার ছাড়লাম আমার সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে। কিন্তু কেবল অগাস্টাস জবাব দিল, 'আমরা এখন মৃত্যুর মুখোমুখি, ঈশ্বর আমাদের আত্মাকে শান্তি দান করুন।' ধীরে ধীরে অন্যেরাও কথা বলার শক্তি ফিরে পেয়ে আমাদের সাহস দিল যে এত সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার কিছু নেই, আশা এখনো ফুরিয়ে যায়নি। কথাগুলো যেন আমার ভেতরে নতুন জীবনের সঞ্চার করল, নানারকম দুশ্চিন্তায় মাথা তালগোল পাকিয়ে যাওয়াতে ভুলেই গিয়েছিলাম, খোলে তেলের শূন্য কয়েকটা পিপে নিয়ে জাহাজ ডুবতে পারে না। আশা ফিরে পেতে আরও ভালোভাবে নিজেকে বাঁধতে লাগলাম চরকির সঙ্গে, দেখলাম আমার সঙ্গীরাও ওই একই কাজে ব্যস্ত। গাঢ় কালো রাত আর চারপাশ ঘিরে বাতাসের গর্জন ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমাদের ডেক এখন সাগরের সমান্তরালে। আশা আর সাহস জাগিয়ে রাখার খাতিরেই খানিক পরপর আমরা কথা বলতে লাগলাম একে অপরের সঙ্গে। আহত বাহু নিয়ে অগাস্টাস নিজেকে কতটা ভালোভাবে বাঁধতে পেরেছে জানি না ; আশঙ্কা করছিলাম যে কোনো মুহূর্তে সে বুঝি ভেসে যাবে সাগরে – এদিকে আমরা যে তার দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেব তারও কোনো উপায় নেই। সৌভাগ্যক্রমে, তার অবস্থানটা আমাদের চেয়ে অনেক ভালো। চরকির নিচের দিকের ভালো অবস্থানে না থাকলে অবশ্যই সে মারা যেত সকাল হবার আগেই। সারারাত পানি বয়ে গেল আমাদের ওপর দিয়ে, প্রতি তিন সেকেন্ডে শ্বাস নিতে পারলাম এক সেকেন্ডের জন্যে – উহ, এ যে কী কষ্ট, ভুক্তভোগী ছাড়া আর কারো পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয়।

ভয়াবহ এই পরিস্থিতিতে রাতটা কেটে ভোরের আলো ফুটতে চারপাশের অবস্থা দেখে আরও আতঙ্কিত হলাম আমরা। জাহাজটা এখন বড় একটুকরো কাঠ ছাড়া আর কিছুই নয়, তীব্র স্রোতে ভেসে চলেছে পাক খেতে খেতে, ঝড় ক্রমশ বেড়েই চলেছে, উদ্ধারের বাস্তব কোনো চিন্তা করাও কঠিন। বেশ কয়েক ঘণ্টা নীরব হয়ে রইলাম আমরা, মনে হলো, যে কোনো মুহূর্তে ছিঁড়ে যাবে আমাদের বাঁধন, সাগরে তখন এতটাই তলিয়ে যাব যে পানির নিচ থেকে ওঠার আগেই বন্ধ হয়ে যাবে আমাদের দম। ঈশ্বরের কৃপায় অবশ্য আসন্ন এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেলাম আমরা, দুপুরের দিকে যেন আশীর্বাদ হয়ে উঁকি দিল সূর্যালোক। তার পরপরই কমে গেল বাতাসের বেগ, গতরাতের পর প্রথম বারের মতো মুখ খুলল অগাস্টাস, পিটার্সের কাছে জানতে চাইল, আমাদের রক্ষা পাবার কোনোরকম সম্ভাবনা আছে কি না। কোনো জবাব ভেসে না আসাতে ভাবলাম, চরকিতে বাঁধা থাকা অবস্থাতেই বুঝি মারা গেছে দোআঁশলাটা ; কিন্তু আমাদের অত্যন্ত আনন্দিত করে মিনমিন করে সে বলল যে পেটের ওপরে বাঁধন কেটে বসায় তার খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, এক্ষুণি বাঁধনটা কেটে না দিলে সে মারা যাবে, এই কষ্ট তার পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব নয়। মুশকিলে পড়ে গেলাম, কারণ, আমাদের পক্ষে এখন তাকে সহায়তা করা অসম্ভব। তাই বললাম, দাঁতে দাঁত চেপে সে আর খানিকটা সহ্য করুক, সুযোগ পাওয়ামাত্র তার বাঁধন আলগা করে দেব আমরা। পিটার্স জবাব দিল, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে, আমাদের সহায়তা তার কোনো কাজে আসবে না ; তারপর কয়েক মিনিট গুঙিয়ে নীরব হয়ে গেল, আমরা ধরে নিলাম যে মারা গেল সে।

সন্ধে নেমে আসতে বাতাসের বেগ প্রায় পড়েই গেল, মিনিট পাঁচেক অন্তর অন্তর কেবল একটা করে ঝাপটা দিচ্ছে এই যা। গত কয়েক ঘণ্টা আমার সঙ্গীদের তরফ থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাইনি বলে অগাস্টাসকে ডাকলাম। সে এতই ক্ষীণ গলায় জবাব দিল যে একটা কথাও বুঝতে পারলাম না। তখন আমি ডাকলাম পিটার্স আর পার্কারকে, কিন্তু কোনো জবাব দিল না তাদের কেউ।

এই ঘটনার পর খানিকটা অচেতনের মতো হয়ে পড়লাম, কল্পনা জুড়ে ভেসে বেড়াল আনন্দদায়ক কিছু ছবি ; যেমন, সবুজ গাছপালা, পাকা শস্য দোলানো খেত, নাচুনে মেয়ের দল, অশ্বারোহী সারি সারি সেনা, আরও নানারকম সব কাল্পনিক দৃশ্য। তবে যে দৃশ্য দেখলাম তার সবগুলোই চলমান। নিশ্চল কোনো দৃশ্য, যেমন, বাড়ি, পাহাড়, কিংবা ওই ধরনের

কিছুই আমি দেখিনি ; সারি বেঁধে এল অসংখ্য চলমান দৃশ্য – উইন্ডমিল, জাহাজ, বিশাল বিশাল পাখি, বেলুন, অশ্বারোহী মানুষ, দ্রুত ধাবমান্ ক্যারিজ। ঘোর কেটে যাবার পরেও সহজে বর্তমান পরিস্থিতির কথা স্মরণ করতে পারলাম না, মনে হলো, এখনো আমি যেন শুয়ে আছি জাহাজের খোলে, আর পার্কারের শরীরটা যেন টাইগারের শরীর।

যখন পুরোপুরি চেতনা ফিরে পেলাম, তখন ঝড় থেমে গিয়ে বইছে মৃদুমন্দ বাতাস। বাঁধন খুলে গিয়ে আমার বাম বাহুটা ঝুলছে, আর কেটে গেছে কনুইয়ের কাছটায় ; ডান বাহু পুরো অবশ, কাঁধের পাশ থেকে নিচের দিকে বাঁধা দড়িটার চাপে ভীষণভাবে ফুলে উঠেছে হাত আর কবজি। কোমরে বাঁধা আরেকটা দড়িও কেটে বসে গিয়ে খুব যন্ত্রণা দিচ্ছে। পিটার্স এখনো বেঁচে আছে, কটির চারপাশে মোটা একটা দড়ি এমনভাবে কেটে বসেছে যেন প্রায় দুই ভাগ হয়ে গেছে তার দেহ ; আমি নড়ে উঠতেই দুর্বলভাবে হাত তুলে সে দেখিয়ে দিল দড়িটা। অগাস্টাস বেঁচে আছে বলে মনে হলো না, তার দেহটা ভাঁজ হয়ে ঝুঁকে আছে সামনে। আমাকে নড়াচড়া করতে দেখে পার্কার বলল, কোনোভাবে আমি তাকে মুক্ত করতে পারব কি না ; যদি পারি, তাহলেই কেবল আমাদের বাঁচার সম্ভাবনা আছে। তাকে মুক্ত করার চেষ্টা করব এই আশ্বাস দিয়ে সাহস বজায় রাখতে বললাম। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে, পেন-নাইফটা চেপে ধরে, বেশ কয়েক বার ব্যর্থ চেষ্টার পর খুলতে পারলাম ফলাটা। তারপর বাম হাতে প্রথমে কাটলাম ডান হাতের দড়ি, আর তারপর অন্য দড়িগুলো। কিন্তু পা এত অবশ হয়ে গিয়েছিল যে নিজের অবস্থান ছেড়ে নড়তেই পারলাম না, ডান বাহুটাও নড়াতে পারলাম না কোনো দিকে। কথাটা পার্কারকে বলতে সে উপদেশ দিল, কিছুক্ষণ উপুড় হয়ে থাকতে হবে আমাকে, রক্ত চলাচল শুরু হলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তার কথা মতো কাজ করতে অবশ ভাবটা কেটে যেতে লাগল, প্রথমে এক পা নড়াতে পারলাম, তারপর আরেকটা ; ডান বাহুও খানিকটা নড়াতে সক্ষম হলাম। এবার হামাগুড়ি দিয়ে পার্কারের কাছে গিয়ে, কেটে দিলাম তার সব বাঁধন, সে-ও কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে ফিরে পেল তার হাত-পা নড়াবার শক্তি। তারপর শিগগিরই আমরা কাটলাম পিটার্সের বাঁধন। দড়ি বসে গিয়েছিল তার পশমি প্যান্টের বেল্ট আর দুটো শার্ট কেটে কটির ভেতরে, তাই বাঁধনগুলো সরাতেই রক্ত ঝরতে লাগল দরদর করে। কিন্তু

পার্কার বা আমার চেয়ে সে নড়াচড়া করতে পারল অনেক সহজে, তাৎক্ষণিক আরাম পাবার একটা ভাবও ফুটে উঠল তার চেহারায় – নিঃসন্দেহে সবই ঘটল তার রক্তক্ষরণের কারণে।

কোনো নড়াচড়া না দেখে অগাস্টাসের ব্যাপারে আমরা আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলাম ; কিন্তু, কাছে যেতে আমরা দেখলাম, বেশি রক্তক্ষরণের ফলে সে কেবল মূর্ছা গেছে, জখম হাতের ব্যান্ডেজগুলো ছিঁড়ে গেছে পানির ধাক্কায় ; চরকির সঙ্গে তাকে বাঁধা দড়িগুলো এত চেপে বসেনি যা তার মৃত্যুর কারণ ঘটাতে পারে। বাঁধন খুলে তাকে আমরা নিয়ে গেলাম শুকনো একটা জায়গায়, তারপর তিনজনে মিলে ঘষতে লাগলাম তার হাত-পা। আধা ঘণ্টাখানেক পরে খানিকটা সুস্থ হলো সে, কিন্তু পরদিন সকালের আগে আমাদের কাউকেই চিনতে পারল না, এমনকি পেল না কথা বলার মতো কোনো শক্তি। আমাদের বাঁধন খুলতে খুলতেই নেমে এসেছিল অন্ধকার, মেঘও জমতে শুরু করেছিল আকাশে, তাই আবার ভয় পেলাম সবাই। আমরা এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে আজ রাতে যদি আবার ঝড় ওঠে, তাহলে মৃত্যুর হাতে নিজেদের সঁপে দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায়ই থাকবে না। কিন্তু যতই সময় গেল শান্ত হয়ে আসতে লাগল সাগর, আমাদেরও আশা বাড়তে লাগল। সারারাত মৃদু একটা বাতাস বইল উত্তর-পশ্চিম থেকে, কিন্তু আবহাওয়া মোটেই ঠান্ডা নয়। নিজে থেকে কিছু ধরার ক্ষমতা ছিল না বলে সাবধানে অগাস্টাসকে আমরা বেঁধে রাখলাম বাতাসমুখো করে। আমাদের তেমন কোনো প্রয়োজন ছিল না, তাই বসে রইলাম কাছাকাছি, আর মাথা খাটাতে লাগলাম এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে। কাপড়চোপড় খুলে সেগুলো চিপে পানি বের করে ফেলায় অনেকটা আরাম পেলাম আমরা, পরে সেগুলো গায়ে দিলে বেশ গরমও লাগল। অগাস্টাসের কাপড়গুলোও চিপে আবার তাকে পরিয়ে দিলে আরাম পেল সে-ও।

এবার নতুন যন্ত্রণা হয়ে দেখা দিল খিদে আর পিপাসা, আর, খাবারদাবার খুঁজতে গিয়ে হতাশ হয়ে পড়লাম আমরা। মনে হলো, বিপদের কিছুই এখনো কাটেনি। তবু এই আশায় সবাই বুক বাঁধলাম যে শিগগির কোনো জাহাজ এসে তুলে নেবে আমাদের, আর তাই সাহস জোগালাম একে অপরকে।

এল চৌদ্দতম দিনের সকাল, উত্তর-পশ্চিমের মৃদু বাতাসটা অব্যাহত থাকলেও আবহাওয়া পরিষ্কার। সাগর মোটামুটি শান্ত, জাহাজও আর গতকালের মতো ডুবুডুবু হয়ে নেই, ডেকও একরকম শুকনো থাকায় আমরা হাঁটাচলা করতে পারলাম ইচ্ছে মতো। এবার নিচে থেকে কিছু খাবারের জোগাড় দেখতে হবে, কারণ, তিন দিন তিন রাত আমাদের পেটে কিছু পড়েনি। জাহাজ পানিতে ভরে থাকায় কাজটা করাও কঠিন। কম্প্যানিয়ন-হ্যাচের দুটো পেরেক এনে গাঁথলাম একটা কাঠের দুই পাশে, তারপর সেই পেরেকের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ছুড়লাম কেবিনের ভেতরে, যদি তাতে আটকে কোনো খাবার উঠে আসে। সকালের বেশির ভাগ সময়ই কাটল এই করে করে, কিছু পেরেক লেগে উঠে এল কেবল বিছানার কয়েকটা চাদর।

ফোকাসলের কাছে গিয়েও চেষ্টা করলাম আমরা, কোনো লাভ হলো না। তখন পিটার্স বলল, তার কোমরে একটা দড়ি বেঁধে দিলে, সে ডুব মেরে কেবিনের ভেতরে গিয়ে দেখে আসতে পারে। আমরা হইহই করে তার এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানালাম। প্যান্ট ছাড়া আর সব কাপড় খুলে ফেলল সে ; শক্ত একটা দড়ি কোমরে বেঁধে এমনভাবে তার কাঁধের ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো, যেন কিছুতেই ওটার খুলে যাবার সম্ভাবনা না থাকে। পিটার্সের কাজটা বেশ কঠিন এবং বিপজ্জনক ; কেবিনের ভেতরে খাবার পাবার সম্ভাবনা খুবই কম, তাই সেক্ষেত্রে ডুবুরিকে ডানে ঘুরে, পানির নিচের দশ-বারো ফুট সরু একটা রাস্তা ধরে যেতে হবে স্টোররুমে, আবার ফিরে আসতে হবে, আর এই সময়ে সে একবারও শ্বাস নেওয়ার সুযোগ পাবে না।

কম্প্যানিয়ন-ল্যাডার দিয়ে কেবিনে নেমে যেতে, পানি এসে ঠেকল পিটার্সের চিবুকে। তখন পানিতে ডুব মেরে, ডানে ঘুরে, সে যেতে চাইল স্টোররুমে। কিন্তু প্রথম চেষ্টাটা সম্পূর্ণ বিফলে গেল তার। সে পানিতে ডুব দেওয়ার আধ মিনিটের মধ্যেই টান পড়ল দড়িতে (আমাদের কথা হয়েছিল যে টেনে তোলার প্রয়োজনে সঙ্কেত দেবে সে দড়িতে ঝাঁকুনি দিয়ে)। সঙ্গে সঙ্গে তাকে টেনে তুললাম আমরা, কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে তাকে ধাক্কা খাওয়ালাম মইয়ে। কিছু আনতে তো পারেইনি সে, মাঝখান থেকে এত হাঁপিয়ে গেছে যে বিশ্রাম নিতে হলো ঝাড়া পনেরো মিনিট।

দ্বিতীয় চেষ্টার ফল হলো প্রথমটার চেয়েও খারাপ। পানির নিচে এত বেশিক্ষণ ডুব মেরে রইল সে যে তার নিরাপত্তার ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে টেনে

তুললাম আমরা ; আরেকটু হলেই তার দম প্রায় গিয়েছিল, হাঁসফাঁস করতে করতে কোনো মতে বলল, বেশ কয়েকবার সে দড়িতে টান দেওয়া সত্ত্বেও আমরা নাকি বুঝতে পারিনি। সম্ভবত মইয়ের নিচের ব্যালাসট্রেডে দড়িটা প্যাঁচ লাগাতেই এমনটা ঘটেছে, তাই ব্যালাসট্রেডটা আমরা ভেঙে ফেললাম।

তৃতীয় চেষ্টাও ব্যর্থ হতে বোঝা গেল, ডুবুরির গায়ে কোনো ওজন বেঁধে না দিলে সে সোজা হয়ে মেঝের ওপরে হাঁটতে পারবে না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা শেকল পেয়ে আমরা তা বেঁধে দিলাম পিটার্সের গোড়ালির সঙ্গে। চতুর্থ বার ডুব দিয়ে পৌঁছল সে স্টোররুমের সামনে, কিন্তু অবর্ণনীয় দুঃখের সঙ্গে দেখতে পেল, সেটার দরজায় ঝুলছে তালা। তার মুখে সংবাদটা শুনে বাঁচার শেষ ভরসাটাও চলে গেল ভেবে কান্নায় ভেঙে পড়লাম আমি আর অগাস্টাস। কিন্তু এই দুর্বলতা আমরা শিগগিরই কাটিয়ে উঠলাম। তারপর হাঁটু মুড়ে বসে এই বিপদে সহায়তা চেয়ে প্রার্থনা করলাম ঈশ্বরের কাছে ; এবং নতুন আশা আর প্রাণশক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, পার্থিব কোন উপায়ে আমরা এই মহাসঙ্কট থেকে উদ্ধার পেতে পারি।

অধ্যায় ১০

খানিক পরেই এমন একটা ঘটনা ঘটল যা প্রথমে বয়ে আনল চরম আনন্দ আর তারপর চরম আতঙ্ক, আমার পরবর্তী নয় বছরের জীবনে অনেক অভাবনীয় ঘটনা ঘটলেও এরকম ঘটনা আর কখনোই ঘটেনি। কম্প্যানিয়ন-ওয়ের কাছের ডেকে এসে আমরা জল্পনাকল্পনা করছিলাম কীভাবে স্টোররুমে ঢোকা যায়, হঠাৎ সামনে থাকা অগাস্টাসের দিকে তাকাতে দেখলাম, মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার চেহারা, অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে থরথর করে কাঁপছে ঠোঁট। দারুণ শঙ্কিত হয়ে কথা বললাম তার সঙ্গে, কিন্তু সে কোনো জবাব দিল না, তাই যখন কেবল ভাবতে শুরু করেছি যে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছে অগাস্টাস, ঠিক তখনই লক্ষ করলাম, আমার পেছনের কোনো জিনিসের দিকে তাকিয়ে জ্বলজ্বল করছে তার চোখ। মাথা ঘোরাতেই, চরম আনন্দে যেন কেঁপে উঠল আমার সারা শরীর, এদিকেই এগিয়ে আসছে বড় একটা জাহাজ, দূরত্ব দুই মাইলের বেশি হবে না। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম যেন হৃৎপিণ্ডে আঘাত হেনেছে মাস্কেটের একটা বুলেট জাহাজটার দিকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে রইলাম চুপচাপ, কোনো কথা বলতে পারলাম না। আমার মতোই প্রতিক্রিয়া হলো পিটার্স আর পার্কারের ভেতরে, কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ ঘটল ভিন্নভাবে। ডেক জুড়ে পাগলের মতো ধেই ধেই করে নাচতে লাগল পিটার্স, সঙ্গে গুলির বেগে চলল অর্থহীন বকরবকর, চিৎকার আর অভিশাপভরা আহ্বান, ওদিকে বেশ কয়েক মিনিট ধরে পার্কার কাঁদতে লাগল শিশুর মতো।

ওলন্দাজদের তৈরি বিরাট আকারের জাহাজটা কালো রং করা, সামনে গিল্টি করা একটা মূর্তি। এটা হারমাফ্রোদিত শ্রেণীর জাহাজ, যার সামনে থাকে চারকোনা পাল, আর পেছনের পাল স্কুনারের মতো। আমাদের মতো এই জাহাজটাও নিশ্চয় ঝড়ের মুখে পড়েছিল, কারণ, ওটার সামনের মাস্তুল

আর স্টারবোর্ড বুলওয়ার্কের খানিকটা অংশ ভেঙে গেছে। ইতিমধ্যেই বলেছি, প্রথম দেখার সময় জাহাজটা ছিল মাইল দুই দূরে। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, কিন্তু ওটার পালতোলা রয়েছে মাত্র দুটো, আর আসছে এতই ধীরে যে আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। জাহাজটা এগোচ্ছেও আজব ঢঙে, এদিকেই আসতে আসতে হঠাৎ এমনভাবে ঘুরে গেল যে আমাদের মাথা প্রায় খারাপ হবার জোগাড়। আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে ভেবে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগলাম সবাই, তখন জাহাজটা আবার ফিরল আমাদের দিকে – আজব এই ঘটনাটা দু-তিন বার ঘটতে দেখে শেষমেশ আমরা ভাবলাম, হালধারী নাবিকটা সম্ভবত পাঁড় মাতাল হয়ে গেছে।

সিকি মাইলের মধ্যে আসার আগে ওটার ডেকে কাউকে দেখা গেল না। তারপর আমাদের চোখে পড়ল তিনজন নাবিক, পরনের পোশাক দেখে ওলন্দাজই মনে হলো। দুজন ফোকাসলের কাছে শুয়ে আছে গুটিয়ে রাখা পালের ওপর, তৃতীয়জন স্টারবোর্ডের ওপর ঝুঁকে পড়ে আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে দারুণ কৌতূহলে। লোকটা শক্তসমর্থ আর লম্বা, গায়ের রং বেশ কালো। হাবভাবে মনে হলো, আমাদের যেন ধৈর্য ধরতে বলছে লোকটা, আর মাথা দোলাচ্ছে আজব এক ভঙ্গিতে, মুখ থেকে তার হাসি সরছে না, ঝিকমিক করছে সাদা দাঁত। জাহাজ আরও কাছে আসতে, তার মাথার লাল ফ্ল্যানেলের ক্যাপটা পড়ে গেল পানিতে, কিন্তু সেদিকে সে তাকিয়েও দেখল না, তবে মুখে হাসিটা লেগেই রইল। এই ঘটনাটার আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেব, আমরা যেমন দেখেছিলাম, ঠিক তেমনই।

আগের মতোই ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল জাহাজটা, তবে অনেকটা স্থিরভাবে – এই ঘটনাটার বিবরণ আমার পক্ষে শান্তভাবে দেওয়া সম্ভব নয় – আমাদের সবার হৃৎপিণ্ড লাফাতে লাগল আনন্দে, অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তি প্রায় হাতের মুঠোয় এসে যাওয়ায় প্রাণভরে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগলাম ঈশ্বরকে। হঠাৎ নাকে এসে ঝাপটা মারল নারকীয়, শ্বাসরোধী, অসহনীয়, অভাবনীয় এক দুর্গন্ধ। হাঁসফাঁস করতে লাগলাম দম নেওয়ার জন্যে, সঙ্গীদের দিকে তাকাতে দেখলাম, তাদের মুখ শ্বেতপাথরের চেয়েও সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন বা অনুমান করার সময় নেই, জাহাজটা এসে পড়েছে পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে ; হাবভাবে মনে হলো, জাহাজটা আমাদের এত কাছে আসবে যে ওটার ডেকে ওঠার জন্যে কোনো নৌকা পাঠানোর প্রয়োজন পড়বে না। আমরা ছুটে গেলাম পেছনদিকে, আর হঠাৎ জাহাজটা তার পথ থেকে খানিকটা বেঁকে যেতেই চোখ পড়ল ওটার ডেকের ওপর।

বিশ ফুট দূর থেকে দেখা চরম আতঙ্কের ওই দৃশ্য কি কোনদিনও ভুলতে পারব ? ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে পঁচিশ কি তিরিশজন পুরুষ আর নারীর পচাগলা লাশ। অভিশপ্ত সেই জাহাজের কেউ বেঁচে নেই ! তবু সেই মৃতদের কাছেই সহায়তা চেয়ে চিৎকার জুড়ে দিলাম আমরা ! হ্যাঁ, অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণায় গলা ফাটিয়ে, লম্বা প্রার্থনা করলাম আমরা সবাই, যেন নীরব আর ঘৃণিত সেই লাশগুলো থেমে দাঁড়ায় আমাদের জন্যে, যেন আমাদের ছেড়ে না যায় তাদেরই দলে যোগ দেওয়ার অপেক্ষায় রেখে, যেন আমাদের টেনে নেয় তাদের সদয় সংসর্গে ! চরম আতঙ্কে আর তীব্র হতাশায় আমরা পাগলের মতো হয়ে গেলাম।

আমাদের আতঙ্কিত চিৎকারের জবাবে জাহাজটার স্টারবোর্ডের কাছ থেকে ভেসে এল এমন এক চিৎকার, যার সঙ্গে মানুষের চিৎকারের এতটাই মিল যে অতি তীক্ষ্ণ কানও তাতে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। জাহাজটা আবার খানিকটা বেঁকে যেতে ফোকাসলের কাছে আমরা দেখতে পেলাম চিৎকারের উৎস। যেমন দেখেছিলাম এখনো তেমনই ঝুঁকে পড়ে এদিক-সেদিক মাথা দোলাচ্ছে লম্বা সেই লোকটা, তবে আমাদের দিকে পাশ ফিরে থাকায় তার মুখটা আর দেখা যাচ্ছে না। রেলিঙের ওপর দিয়ে তার হাত দুটো ঝুলছে শিথিলভাবে, হাঁটু দুটো দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। তার পিঠের দিকে শার্টটা ছেঁড়া, আর সেখানে বসে ঠুকরে ঠুকরে পচা মাংস খাচ্ছে বিরাট এক গাংচিল, পাখিটার ঠোঁট আর নখর পিঠের গর্তে ঢোকানো, সাদা পালকগুলো লাল হয়ে গেছে রক্তে। জাহাজ আরও কাছে আসতে পিঠের ভেতর থেকে রক্তে লাল-হয়ে-যাওয়া মাথা বের করল পাখিটা, আমাদের দেখে হতবুদ্ধি হয়ে, উড়ে এল গ্রামপাসের ডেকের ওপর, তার ঠোঁট থেকে ঝুলছে কলজের মতো দলা পাকানো কী যেন একটা। পাখিটা শূন্যে থাকতে থাকতেই ভয়াবহ বস্তুটা থপাস করে এসে পড়ল পার্কারের পায়ের কাছে। ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, এই প্রথম মাথায় দোলা দিল একটা চিন্তা, যে চিন্তার কথা আমি এখন উল্লেখ করব না, মনে হলো, এক্ষুণি পা বাড়াই রক্তমাখা সেই বস্তুটার দিকে। মাথা তুলতেই চোখাচোখি হলো অগাস্টাসের সঙ্গে, আর তার আকুল চোখের আগ্রহী দৃষ্টির অর্থ বুঝে তৎক্ষণাৎ ফিরে পেলাম আমার শুভবুদ্ধি। গা ঘিনঘিন করা সত্ত্বেও চকিতে সামনে গিয়ে, ভয়াবহ বস্তুটাকে ফেলে দিলাম সাগরে।

মাংসাশী পাখিটার ঠোঁটের আঘাতেই এদিক-সেদিক দুলছিল লাশটা, আর দূর থেকে প্রথম দেখে আমরা ওটাকে মনে করেছিলাম জীবিত। গাংচিলটা উড়ে যাওয়ায় এখন তার মুখের পুরোটাই দেখা যাচ্ছে। চোখদুটো

খুবলে খেয়ে ফেলেছে পাখিটা, মুখের চারপাশের মাংসও বাদ দেয়নি, তাই দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে বিকটভাবে। এই হাসিই তাহলে জাগিয়ে তুলেছিল আমাদের আশা ! ভয়াবহ নাবিকদের বোঝা নিয়ে ধীরে ধীরে জাহাজটা সরে গেল দূরে, সেই সঙ্গে হারিয়ে গেল আমাদের মুক্তির আনন্দ। চকিত হতাশা আর লাশের স্তূপের আতঙ্ক দেহ আর মনকে অসাড় করে না ফেললে আমরা বোধ হয় জাহাজটায় উঠে পড়তাম। ব্যাপারটা আমাদের মাথায় খেলেছে, কিন্তু সেই অনুসারে কাজ করার কথা মনে পড়েছে যখন, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমাদের বুদ্ধিসুদ্ধি এতই গুলিয়ে গিয়েছিল যে জাহাজটা বহু দূরে চলে যাবার পর মনে হলো, সাঁতরে গিয়ে ওটায় ওঠার চেষ্টা করলে কেমন হয় !

জাহাজটার পরিণতি ঢাকা পড়েছিল যে ভয়াবহ অনিশ্চয়তার গাঢ় অন্ধকারে, সেদিন থেকেই তার একটা সূত্র খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছি আমি। আগেই বলেছি, গড়ন আর আকৃতি দেখে ওটাকে মনে হয়েছে একটা ওলন্দাজ বাণিজ্যিক জাহাজ, নাবিকদের পোশাকও তা-ই নির্দেশ করে। সহজেই আমরা স্টার্নে জাহাজের নামটা পড়ে নিতে পারতাম বা সতর্ক দৃষ্টি মেলে জেনে নিতে পারতাম ওটার পরিচয়-বিষয়ক আরও অনেক কিছু ; কিন্তু তখনকার চূড়ান্ত উত্তেজনা আমাদের যেন অন্ধ করে দিয়েছিল। আধ-পচা লাশগুলোর জাফরানি রং দেখে আমরা ভেবেছি, লোকগুলো মরেছে পীত জ্বর কিংবা ওই জাতীয় অন্য কোনো মারাত্মক রোগে। যদি তা-ই হয়ে থাকে (অন্য কিছু ভাবতে পারছি না), তাহলেও লাশগুলোর অবস্থান বিবেচনা করে বলতে হবে, মৃত্যু তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এমনই প্রচণ্ড আকস্মিকতায়, আমাদের পরিচিত সবচেয়ে মারাত্মক মহামারীও অত দ্রুততার সঙ্গে আক্রমণ করে না। তাদের খাবারে বিষ মিশেও এই ভয়ংকর কাণ্ডটা ঘটতে পারে ; অজানা কোনো বিষাক্ত প্রজাতির মাছ বা সামুদ্রিক প্রাণী কিংবা মহাসাগরীয় পাখি খেয়েও ঘটতে পারে বিষক্রিয়াটা – কিন্তু এসব অনুমান সম্পূর্ণ অর্থহীন, যেখানে সবকিছুই ঢাকা ভয়ংকর এক অতলস্পর্শী রহস্যে, আর চিরকাল ঢাকাই থাকবে।

অধ্যায় ১১

সন্ধের অন্ধকার নেমে জাহাজটা দৃষ্টির আড়ালে চলে না যাওয়া পর্যন্ত ঘোরলাগা চোখে সেদিকেই তাকিয়ে রইলাম আমরা, তারপর যেন সংবিৎ ফিরে পেলাম কিছুটা। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ছাপিয়ে উঠল খিদে আর পিপাসার যন্ত্রণা। সকাল হবার আগে খাবার পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই বলে, চরকির সঙ্গে নিজেদের বেঁধে আমরা একটু বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করলাম। ভাগ্য ভালো বলে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি, সঙ্গীরা অতটা ভাগ্যবান না থাকায় ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই খাবার জোগাড়ের জন্যে জাগিয়ে দিল আমাকে।

সাগর এখন সম্পূর্ণ শান্ত, কোথাও ঢেউয়ের লেশমাত্র নেই– আবহাওয়াও গরম আর আরামদায়ক। জাহাজটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। আবার খুঁজে একটা শেকল বের করে আমরা বেঁধে দিলাম পিটার্সের দুই পায়ে ; সে ভাবল, জাহাজ যেহেতু এখন আর দুলছে না, তাড়াতাড়ি স্টোররুমের কাছে পৌঁছতে পারলে গায়ের জোরেই দরজাটা খুলতে পারবে।

তাড়াতাড়িই স্টোররুমের কাছে গেল সে, একপায়ের গোড়ালি থেকে শেকল খুলে নিয়ে দরজা ভাঙার চেষ্টাও করল, কিন্তু পারল না। অনেকক্ষণ পানির নিচে থাকায় হাঁপিয়ে উঠেছিল পিটার্স, তাই তার পরিবর্তে অন্য কাউকে পাঠানো ছাড়া উপায় রইল না। এবার যেতে রাজি হলো পার্কার ; কিন্তু, তিন বার ডুব মারার পর টের পেল, তার পক্ষে এমনকি দরজার কাছেই যাওয়া সম্ভব নয়। আহত বাহু নিয়ে অগাস্টাসকে পাঠানোর কোনো মানে হয় না, কারণ, স্টোররুমের কাছে যেতে পারলেও দরজা খোলা তার পক্ষে অসম্ভব। তাই খাবার খোঁজার দায়িত্ব পড়ল এখন আমার ওপর।

একটা শেকল পিটার্স ফেলে এসেছিল প্যাসেজে, আর ডুব মারার পর বুঝতে পারলাম, দৃঢ়পায়ে হাঁটার মতো যথেষ্ট ভারসাম্য আমার নেই। তাই

ঠিক করলাম, শেকলটা খোঁজা ছাড়া আর কোনো চেষ্টা আমি করব না। প্যাসেজের মেঝেতে হাতড়াতে হাতড়াতে পেলাম শক্ত কী যেন একটা, সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে চেপে ধরে উঠে এলাম ওপরে। ওটা একটা পোর্ট ওয়াইনে ভরা বোতল, যা দেখে আমাদের আনন্দের সীমা রইল না। যথাসময়ে এই উপহারটা পেয়ে আমরা ধন্যবাদ জানালাম ঈশ্বরকে, আর আমার পেন-নাইফ দিয়ে তড়িঘড়ি ছিপি খুলে, প্রত্যেকেই খেলাম একটু একটু করে, অবর্ণনীয় এক উষ্ণতা, শক্তি, আর তেজ যেন সঞ্চারিত হলো শরীরে। তারপর সাবধানে আবার ছিপি এঁটে, একটা রুমালে জড়িয়ে, এমনভাবে বোতলটাকে ঝুলিয়ে রাখলাম যেন কিছুতেই ওটা না ভাঙে।

সৌভাগ্যময় আবিষ্কারটার পর খানিক বিশ্রাম নিয়ে, আবার ডুব মারলাম আমি, আর শেকলটা খুঁজে পেতে সোজা উঠে এলাম ওপরে। শেকলটা গোড়ালিতে জড়িয়ে নিয়ে ডুব মারলাম তৃতীয়বার, আর এবারে পুরোপুরি নিশ্চিত হলাম যে কোনোভাবেই স্টোররুমের দরজা ভাঙা সম্ভব নয়। সুতরাং ফিরে এলাম হতাশ হয়ে।

আশা বলে যেন আর কিছুই রইল না, সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে মনে হলো যে তারাও মরার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। ওয়াইন তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে একটা বিকারের ভাব। অসংলগ্ন কথাবার্তা শুরু করেছে তারা এমন সব বিষয়ে যার সঙ্গে আমাদের বর্তমান অবস্থার কোনো সম্পর্ক নেই। পিটার্স বারবার আমার কাছে জানতে চাইছে ন্যানটাকেটের কথা। অগাস্টাস গম্ভীর মুখ করে আমার কাছে চেয়েছে একটা পকেট-চিরুনি, তার মাথা নাকি ভরতি হয়ে গেছে মাছের আঁশে, তাই তীরে নামার আগে সেগুলো ঝেড়ে ফেলতে চায়। পার্কার অনেকটা সুস্থির আছে, যে কোনো খাবারের সন্ধানে বারবার ডুব মারতে বলছে আমাকে। তার কথা মতো পানিতে নেমে প্রথম বারে আমি তুলে আনলাম ক্যাপটেন বার্নার্ডের একটা ছোট চামড়ার ট্রাঙ্ক। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ আশা নিয়ে ট্রাঙ্কটা খোলা হলো যে ওটার ভেতরে থাকতে পারে কোনো খাবার বা পানীয়। কিন্তু খুরের একটা বাক্স এবং লিনেনের দুটো শার্ট ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। দ্বিতীয় বারের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো। পানির ওপরে মাথা তুলতেই কানে এল ডেকের ওপরে একটা ভাঙার শব্দ, দেখলাম, আমার অনুপস্থিতিতে বাদবাকি ওয়াইন খেয়ে ফেলেছে অকৃতজ্ঞ সঙ্গীরা, আর সেটা আমার কাছ থেকে লুকাবার চেষ্টায় তাড়াহুড়ো করে আবার যথাস্থানে রাখতে গিয়ে ফেলে দিয়েছে বোতলটা। আমি তাদের এই হৃদয়হীনতা নিয়ে প্রতিবাদ করতেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল অগাস্টাস।

অন্য দুজন এমনভাবে হেসে উঠল যেন পুরো ব্যাপারটাই একটা রসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু বড়ই ভয়ংকর তাদের সেই বিকৃত হাসির ধরন। বুঝলাম, খালি পেটে বেশি মদ পড়ায় তারা পাঁড় মাতাল হয়ে গেছে। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শোয়াতে পারলাম তাদের, শিগগিরই ঘুমে তলিয়ে গিয়ে তারা জোরে নাক ডাকাতে লাগল।

জাহাজে একা জেগে থেকে শুরু করলাম ভয়ংকর সব চিন্তা। আমাদের সামনে এখন রয়েছে কেবল অনাহারে তিলে তিলে কিংবা ঝড়ের কবলে পড়ে মৃত্যু। আমাদের শরীর যতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে, আরেকটা ঝড় এলে টিকতে পারব না আর কেউই।

খিদে এমন আকার ধারণ করেছে যে এই যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার জন্যে আমি বোধ হয় এখন সব করতে পারি। চামড়ার ট্রাঙ্কের একটা টুকরো ছুরি দিয়ে কেটে নিয়ে খাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই ওটা গিলতে পারলাম না ; তবে আমার মনে হলো, চুষে থু থু করে ফেলে দিলে সামান্য হলেও যেন যন্ত্রণা কমছে। রাতের দিকে এক এক করে ঘুম ভাঙল আমার সঙ্গীদের, ওয়াইনের নেশা কেটে গিয়ে এখন তাদের পেয়ে বসেছে অসহনীয় শারীরিক দুর্বলতা। ম্যালেরিয়ার রোগীর মতো কাঁপতে লাগল তারা থরথর করে, সেইসঙ্গে পানির জন্যে জুড়ে দিল করুণ চিৎকার। তাদের অবস্থা দেখে বেশ ভয় পেয়ে গেলাম, তবু নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলাম পরে আর ওয়াইন খাইনি বলে। নিচ থেকে কোনো খাবার আনার আশাটা আমি এখনো পরিত্যাগ করিনি, তবে তাদের মধ্যে অন্তত একজন দড়ির প্রান্ত ধরে আমাকে সহায়তা করার মতো সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তা সম্ভব নয়। তাদের মধ্যে পার্কারকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ মনে হওয়ায় তার ওপরে একটা পরীক্ষা চালাব বলে ঠিক করলাম ; কোমরে দড়ি বেঁধে তাকে নিয়ে গেলাম কম্প্যানিয়ন-ওয়ের কাছে (সে একটুও বাধা দেয়নি), তারপর আচমকা ধাক্কা মেরে পানিতে ফেলে দিয়েই টেনে তুললাম আবার। ভাগ্যিস পরীক্ষাটা করেছিলাম ; পানি থেকে ওঠার পর অনেকখানি তাজা মনে হলো তাকে, জানতে চাইল, আমি তাকে পানিতে ফেলে দিয়ে আবার টেনে তুললাম কেন। ব্যাখ্যা করে যখন বোঝালাম যে তার সুস্থতার লক্ষ্যেই কাজটা করেছি, আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে পার্কার বলল, সত্যিই সে এখন আগের চেয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করছে। এরপর অগাস্টাস আর পিটার্সকেও চোবালাম সাগরের পানিতে, সুস্থতা বোধ করল তারাও। এভাবে পানিতে চোবানোর কথা আমি পড়েছিলাম একটা ডাক্তারি বইয়ে।

দড়ি ধরার ব্যাপারে এখন সঙ্গীদের ওপর ভরসা রাখা যায় দেখে, আবার তিন-চারটে ডুব মারলাম আমি। তুলে আনতে পারলাম দুটো ছুরি, শূন্য একটা তিন গ্যালনের জগ, আর একটা কম্বল, কিন্তু কোনো খাবার নয়। আমি ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ার পর, রাতে পালাক্রমে চেষ্টা করল পার্কার আর পিটার্স, কোনো লাভ হলো না। ফলে ব্যর্থ এই চেষ্টা বাদ দিলাম আমরা।

রাতের বাকি অংশ আমাদের কাটল নিদারুণ শারীরিক আর মানসিক যন্ত্রণায়। ষোলোতম দিনের শুরুতে আশা নিয়ে তাকালাম আমরা দিগন্তে, তাকানোই সার হলো। গতকালের মতোই সাগর সম্পূর্ণ শান্ত। ছয় দিন হলো ওই পোর্ট ওয়াইন ছাড়া আমাদের পেটে কোনো খাবার বা পানীয় পড়েনি। পিটার্স আর অগাস্টাস এতই শুকিয়ে গেছে যে অমন শুকনো মানুষ আমি জীবনে কখনো দেখিনি, আর দেখতেও চাই না। বুকের ওপর থেকে মাথা তোলার শক্তি নেই পার্কারের, তবু সে অন্তত অন্য দুজনের চেয়ে ভালো আছে। সে অসাধারণ ধৈর্য নিয়ে, কোনো অভিযোগ তোলেনি, বরং সাধ্য মতো আমাদের আশা জাগিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। আমি বরাবর হালকা-পাতলা আর খারাপ স্বাস্থ্যের হলেও, তাদের মতো শুকিয়ে যাইনি, বুদ্ধিসুদ্ধিও যথেষ্ট কাজ করছে। বাকি তিনজন যেন এখন প্রবেশ করেছে তাদের দ্বিতীয় শৈশবে, খিলখিল করে হাসছে, গম্ভীর মুখে বলছে আবোলতাবোল সব কথা। মাঝেসাঝে অবশ্য ঘোর কেটে যাচ্ছে তাদের, তখন বেশ বিচারবুদ্ধি নিয়েই কথা বলছে। অবশ্য জানি না, আমি তাদের সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করেছি, তারাও আমার সম্বন্ধে ওই একই ধারণা পোষণ করেছে কি না, অজান্তে শিশুদের মতো আচরণ হয়ত আমিও করেছি – নিশ্চিতভাবে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

দুপুরের দিকে পার্কার হইহই করে উঠল যে লারবোর্ডের দিকে সে ডাঙা দেখতে পেয়েছে, অতি কষ্টে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে বিরত করলাম তাকে। পিটার্স আর অগাস্টাস তার কথায় কানই দিল না, দুজনে এখন ডুবে আছে কিসের যেন চিন্তায়। পার্কারের নির্দেশিত দিকে আমি তীরের কোনো চিহ্ন দেখতে পেলাম না – অবশ্য আশপাশে যে কোনো তীর থাকার কথা নয়, সেটাও জানতাম বেশ ভালোভাবেই। অনেক কষ্টে পার্কারের ভুল ভাঙাতে পারলাম। ভুল ভাঙতেই পার্কার প্রথমে কেঁদে উঠল হাউমাউ করে, তারপর শিশুর মতো কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, দু-তিন ঘণ্টা এভাবে চলার পর শেষমেশ ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পিটার্স আর অগাস্টাস বারবার চেষ্টা করেও চামড়ার টুকরো গিলতে পারল না। আমি তাদের পরামর্শ দিলাম চিবিয়ে থু থু করে ফেলে দেওয়ার জন্যে ; অত্যন্ত দুর্বল শরীরে সেই পরামর্শও মানতে পারল না তারা। আমি মাঝেসাঝেই চিবালাম আর তাতে যেন একটু ভালোও লাগল ; প্রধানত কষ্ট পেলাম পিপাসায়, তারপরেও সাগরের পানি খাওয়ার একান্ত ইচ্ছে থেকে সংবরণ করলাম নিজেকে, কারণ, আমাদের মতো অবস্থায় পড়ে সাগরের পানি খেয়ে অনেকের যে কী ভয়াবহ দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছে তা আমার জানা ছিল।

এভাবেই কাটতে লাগল দিনটা, হঠাৎ আমাদের লারবোর্ডের ওপর দিয়ে পুবদিকে দেখতে পেলাম একটা জাহাজের পাল, বেশ বড়সড় একটা জাহাজ, আড়াআড়িভাবে আমাদের দিকেই আসছে, বারো কি পনেরো মাইল দূর থেকে। সঙ্গীদের কেউই ওটাকে এখনো লক্ষ করেনি, আমি তাদের কিছু বললামও না, পাছে মুক্তির আনন্দ আবার হতাশায় পরিণত হয়। আরও কাছে আসতে, পালগুলো পরিষ্কার চোখে পড়ায় বুঝলাম, আমি কোনো মরীচিকা দেখিনি। চুপ করে থাকা আর সম্ভব হলো না, হাত তুলে সহ-যন্ত্রণাভোগকারীদের দেখিয়ে দিলাম জাহাজটা। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল তারা, আবার শুরু করল অদ্ভুত আচরণ – পাগলের মতো হাসল, কাঁদল, লাফাল, ডেকের ওপর পা ঠুকল, চুল ধরে টানাটানি করল, থেকেই প্রার্থনা করল আবার থেকেই অভিশাপ দিল। উদ্ধারের নিশ্চিত আশ্বাস পেয়ে, এবার আমিও আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না, তাদের মতোই শুরু করে দিলাম পাগলামি – কৃতজ্ঞতায় আর চরম আনন্দে ডেকের ওপর শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি খেলাম, হাততালি দিলাম, চিৎকার করলাম, এবং এই ধরনের আরও আচরণ, তারপর চরম দুর্দশা আর হতাশা নিয়ে হঠাৎ লক্ষ করলাম, আমাদের দিকে ফিরে আছে জাহাজের পেছনদিকটা, অর্থাৎ, আমাদের কাছে না এসে জাহাজটা ক্রমশ সরে যাচ্ছে দূরে।

সত্যিই যা ঘটেছে তা আমার বেচারি সঙ্গীদের বিশ্বাস করাতে বেশ সময় লাগল। আমার দিকে গনগনে চোখে তাকিয়ে তিনজনেই বলল, এতটা ভুল দেখা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অগাস্টাসের অবস্থা হলো একদম শোচনীয়। ঘটনাটা বারবার উল্লেখ করা সত্ত্বেও সে বলতেই থাকল যে জাহাজটা আমাদের দিকেই আসছে, আর সেটায় ওঠার তোড়জোড় শুরু করল। জাহাজটার কাছ দিয়ে কিছু সাগর-শৈবাল ভেসে যাচ্ছিল, সেটাকে নৌকা ভেবে, হৃদয়-বিদারক কান্না আর আর্তনাদ জুড়ে দিয়ে, অগাস্টাস

ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল ওটার ওপর, তখন সাগরে পড়ে মরার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে তাকে আটকে রাখলাম গায়ের জোরে।

খানিকটা শান্ত হবার পর আমরা সবাই তাকিয়ে রইলাম জাহাজটার দিকে, যতক্ষণ না ওটা হারিয়ে গেল দিগন্তে। আবহাওয়া ঝাপসা হয়ে আসছে, বইতে শুরু করেছে একটা ঝিরঝিরে বাতাস। জাহাজটা সম্পূর্ণ মিলিয়ে যেতেই, ঝট করে আমার দিকে ঘুরল পার্কার আর তার চেহারা আমাকে শিউরে তুলল। এই প্রথম লক্ষ করলাম, নিজের ওপর তার বেশ একটা কর্তৃত্ব আছে, আর সে মুখ খোলার আগেই আমার অন্তরাত্মা বুঝতে পারল, সে কী বলতে যাচ্ছে। অল্প কথায় সে সোজাসাপটা বলল, অন্যদের বাঁচিয়ে রাখার খাতিরে আমাদের যে কোনো একজনকে মরতেই হবে।

অধ্যায় ১২

গত কয়েকদিন আমার মাথাতেও খেলা করেছে সর্বশেষ এই চরম ভয়ংকর পথটার কথা, আর গোপনে মনস্থির করে ফেলেছি, এ পথে ছাড়া আর যে কোনো পথে, যে কোনো রূপে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব। বর্তমানের অসহনীয় খিদেও আমাকে সেই সঙ্কল্প থেকে টলাতে পারেনি। কথাটা এখনো পিটার্স বা অগাস্টাসের কানে যায়নি। সুতরাং পার্কারকে সরিয়ে নিয়ে গেলাম একপাশে ; সেই সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম, তিনি যেন আমাকে এই মানসিক শক্তি দেন যাতে তাকে এই ভয়ংকর কাজটা থেকে বিরত করতে পারি। অনেকক্ষণ ধরে তাকে নানারকম যুক্তি দেখালাম, তার কাছে যা কিছু পবিত্র, সেসবের নামে অনুনয়-বিনয় করলাম, যেন চিন্তাটা সে বাদ দেয়, আর অন্য দুজনের কানে একেবারেই না তোলে।

চুপচাপ সব শুনে গেল সে, কোনো পাল্টা যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করল না, তাই আশা জাগতে লাগল যে সে বোধ হয় আমার কথাগুলো মেনে নেবে। কিন্তু আমি চুপ করতে সে বলল, আমার সব কথাই যে সত্য এটা তার জানা আছে, কোনো মানুষ এর চেয়ে ভয়ংকর আর কোনো পথ বেছে নিতে পারে না ; কিন্তু মানুষ যতদূর পর্যন্ত সহ্য করতে পারে তা সে করেছে ; আর, সবার মরে যাবার কোনো অর্থ হয় না, যখন, একজনের মৃত্যুর ফলে বাকিদের বাঁচার সম্ভাবনা আছে ; তাছাড়া আমি তাকে বিরত করার চেষ্টা করলে কী হবে, সে তার মন পুরোপুরি স্থির করে ফেলেছে এমনকি জাহাজটা আসারও আগে, ওটা আসার ফলে তার এই বিষয়ের উল্লেখটা খানিক পিছিয়ে গিয়েছে মাত্র।

তখন আমি আবার অনুনয়-বিনয় করলাম, তাহলে সে অন্তত আর একটা দিন অপেক্ষা করে দেখুক, কোনো জাহাজ আসে কি না। জবাবে সে বলল, কথাটা বলার আগে সম্ভাব্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে অপেক্ষা করেছে ; কোনোরকম

খাবার ছাড়া তার পক্ষে আর টিকে থাকা সম্ভব নয় ; আরও একটা দিন অপেক্ষা করলে বড় দেরি হয়ে যাবে, অন্তত তার বেলায় তো বটেই।

নরম সুরে কোনো কাজই হলো না দেখে, গলা এবার কড়া করে বললাম, সে নিশ্চয় লক্ষ করেছে, সবার চেয়ে কম ধকল সহ্য করতে হয়েছে বলে আমার শক্তি এখন তার, পিটার্স বা অগাস্টাসের চেয়ে বেশি ; মোট কথা, প্রয়োজন হলে আমি শক্তি প্রয়োগ করে তাকে সাগরে ফেলে দেব ; কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে খপ করে আমার গলা চেপে ধরে, একটা ছুরি বের করে, আমার পেটে বসাতে গেল পার্কার, কিন্তু শারীরিক দুর্বলতার কারণে কয়েকবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও কাজটা পারল না। রেগে আগুন হয়ে আমি তাকে ঠেলে জাহাজের একপাশে নিয়ে গেলাম সত্যিই সাগরে ফেলে দেওয়ার জন্যে। ধস্তাধস্তির শব্দে এগিয়ে এসে তাকে রক্ষা করল পিটার্স, আর জানতে চাইল ব্যাপারটা। আমি বাধা দেওয়ার আগেই পার্কার গড়গড় করে তাকে বলে দিল সব।

আমি যা ভেবেছিলাম তারচেয়ে পার্কারের কথার প্রতিক্রিয়া হলো আরও ভয়াবহ। অগাস্টাস আর পিটার্স দুজনেই বোধ হয় ব্যাপারটা ভেবেছিল বেশ আগেই, কেবল পার্কার প্রথমে কথাটা প্রকাশ করেছে এই যা, তাই দুজনেই যোগ দিল তার সঙ্গে, আর তখনই কাজটা করার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করল। ধারণা করেছিলাম, ভয়াবহ কাজটায় বাধা দেওয়ার খাতিরে দুজনের একজন অন্তত আমার পক্ষ নেবে আর, দুজনের যে কোনো একজন পক্ষে থাকলেই আমি নির্ভয়ে কাজটায় বাধা দিতে পারতাম। কিন্তু এখন তো দেখছি, নিজেরই নিরাপত্তার দিকে নজর দিতে হবে। তাদের যে মানসিক অবস্থা, বিরুদ্ধে গেলে তারা আমার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

তাই বললাম যে আমিও তাদের পক্ষে আছি, কেবল এটুকু অনুরোধ, চারপাশে নেমে আসা কুয়াশাটা কেটে যাওয়া পর্যন্ত তারা যেন ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে, বলা তো যায় না, আমরা যে জাহাজটাকে দেখেছি ওটাকে আবারও দেখা যেতে পারে। অনেক কষ্টে তাদের রাজি করালাম ; কুয়াশা কেটে গেল একঘণ্টার আগেই, কোনো জাহাজ দেখা গেল না, তাই লটারি করার প্রস্তুতি নিলাম আমরা।

দীর্ঘ বিবরণ দিয়ে ওই বেদনাদায়ক স্মৃতিকে বেশি জাগাতে চাই না। আমার ওপরেই পড়ল লটারি করার ভার, এখানে যা কেবল আমরা করতে পারি কাঠের ছোট ছোট টুকরো দিয়ে। আমি গেলাম জাহাজের একপাশে, আমার

দিকে পেছন ফিরে তারা রইল অন্য পাশে। মৃত্যুর যে নাটক আমি মঞ্চস্থ করতে যাচ্ছি, তার সঙ্গে অন্যান্য মৃত্যুর কতই না পার্থক্য ! মরতে লেগেছিলাম আমরা ঝড়ের কবলে, কিংবা মরতে যাচ্ছি দীর্ঘ অনাহারে, কিন্তু এটার তুলনায় সেগুলোর ভয়ংকরত্ব অনেক কম – এই মৃত্যু ভয়ংকরতম যার মূলে আবার রয়েছে ভয়ংকরতম এক উদ্দেশ্য। কাঠের টুকরোগুলো ধরে রাখতে অস্বীকৃতি জানাল আমার আঙুল, দুই হাঁটু কাঁপতে লাগল থরথর করে। লটারিটাকে এড়াবার জন্যে হাজাররকম চিন্তা করতে লাগল আমার মন। অনেকটা সময় এভাবে নষ্ট করার পর সংবিৎ ফিরল পার্কারের ডাকে, ভীষণ এই দুশ্চিন্তা থেকে তারা যথা শিগগির মুক্তি চায়। ঠিক হয়েছিল, চারটে টুকরোর মধ্যে সবচেয়ে ছোটটা যে টানবে, তাকেই মরতে হবে বাকিদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তাই ভাবতে লাগলাম, কোনো দারুণ ফন্দিতে সবচেয়ে ছোট কাঠের টুকরোটা ধরিয়ে দেব তিনজনের যে কোনো একজনের হাতে। চরম হৃদয়হীনতার জন্যে কেউ যদি আমাকে দোষারোপ করতে চায়, তাকে হতে বলব অবিকল আমার মতো কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি।

কাঠের চারটে টুকরো নিয়ে পা বাড়ালাম, ফোকাসলে অপেক্ষমাণ আমার সঙ্গীদের দিকে। হাত বাড়িয়ে দিতেই, তৎক্ষণাৎ একটা টুকরো টেনে নিল পিটার্স। বেঁচে গেল সে, অর্থাৎ, তার টুকরোটা সবচেয়ে ছোট নয় ; আমার রেহাই পাবার একটা সুযোগ কমে গেল। এবার হাত বাড়িয়ে দিলাম অগাস্টাসের দিকে। সে-ও তৎক্ষণাৎ টুকরো টানল আর সে-ও বেঁচে গেল ; এখন, আমি বাঁচব নাকি মরব, সেই সম্ভাবনা রয়ে গেল সমান সমান। একটা বাঘের সম্পূর্ণ হিংস্রতা যেন জেগে উঠল আমার বুকে, পার্কারের প্রতি অনুভব করলাম নারকীয় এক ঘৃণা। কিন্তু এই অনুভব বেশিক্ষণ থাকল না ; কাঁপতে কাঁপতে, চোখ বন্ধ করে, অবশিষ্ট দুই টুকরোসহ বাড়িয়ে দিলাম হাত। মনস্থির করতে পুরো পাঁচ মিনিট লেগে গেল তার, আর এই সময়ে দারুণ উত্তেজনায় একবারও চোখ খুললাম না। তারপর ঝট করে সে টেনে নিল একটা টুকরো। সিদ্ধান্ত তাহলে হয়ে গেল, যদিও তখনো জানি না, সেটা আমার পক্ষে গেল নাকি বিপক্ষে। কেউ কোনো কথা বলল না, হাতের একমাত্র টুকরোটার দিকে তাকাবার সাহস হলো না আমার। অবশেষে আমার হাত ধরল পিটার্স, চোখ খুলে পার্কারের চেহারা দেখামাত্র বুঝলাম যে আমি বেঁচে গেছি, আর তার মাথার ওপর নেমে এসেছে করাল মৃত্যু। দম নেওয়ার জন্যে হাঁসফাঁস করতে করতে, অজ্ঞান হয়ে আমি লুটিয়ে পড়লাম ডেকের ওপর।

জ্ঞান ফিরতে দেখলাম তার মৃত্যু, যে নিজেই ছিল ভয়ংকর এই মৃত্যু-নাটকের প্রধান আয়োজক। সে অবশ্য কোনোরকম বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল না, পিটার্স পিঠে ছুরি চালাতেই মুহূর্তে আছড়ে পড়ল তার প্রাণহীন দেহ। তারপর নারকীয় ভোজের যে ঘটনাটা ঘটল সেই বিবরণ না দেওয়াই ভালো। এই ধরনের ঘটনা হয়ত কল্পনা করা যায়, কিন্তু তার অতি ভয়ংকরত্ব কোনোভাবেই ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে উষ্ণ রক্তে পিপাসা মেটাবার পর, সবার সম্মতিক্রমে হাত, পা, মাথা, আর নাড়িভুঁড়ি সাগরে ফেলে দিয়ে, দেহের বাকি অংশ টুকরো টুকরো করে খেলাম আমরা মাসের সতেরো, আঠারো, উনিশ এবং বিশের চিরস্মরণীয় চার দিনে।

উনিশ তারিখে পনেরো-বিশ মিনিটের মতো বৃষ্টি হলো, যা আমরা ধরে রাখলাম ঝড়ের পর কেবিন থেকে টেনে তোলা একটা বিছানার চাদরে। পানির পরিমাণ আধ গ্যালনের বেশি হবে না ; কিন্তু ওটুকুও আমাদের শক্তি আর আশা জোগাল।

একুশ তারিখ আবার আমাদের এগিয়ে দিতে চাইল চরম ভয়ংকর সেই পথের দিকে। আবহাওয়া এখনো উষ্ণ আর আরামদায়ক, মাঝেসাঝে নামছে কুয়াশা আর বইছে ঝিরঝিরে বাতাস, সাধারণত উত্তর থেকে পশ্চিমে।

বাইশ তারিখে গাদাগাদি করে বসে ভাবছিলাম আমরা নিজেদের শোচনীয় পরিস্থিতির কথা, হঠাৎ মাথায় খেলে গেল এমন একটা বুদ্ধি যা আমাকে দেখাল আশার উজ্জ্বল ঝিলিক। সামনের মাস্তুল কাটার পর, পিটার্স একটা কুড়াল দিয়ে অনুরোধ করেছিল, সম্ভব হলে আমি যেন ওটা রেখে দিই নিরাপদ কোনো জায়গায়, আর ঢেউয়ের শেষ ঝাপটা জাহাজটাকে পানিতে ভরিয়ে দেওয়ার কয়েক মিনিট আগে, কুড়ালটাকে ফোকাসলে নিয়ে গিয়ে রেখে দিয়েছিলাম আমি লারবোর্ডের একটা বার্থে। এখন ওই কুড়াল দিয়ে, ওপরের ডেক কেটে স্টোররুমে ঢুকে, আমরা পেতে পারি খাবার।

কথাটা সঙ্গীদের বলতেই তারা ছাড়ল আনন্দের এক দুর্বল চিৎকার, আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই গেলাম ফোকাসলে। দেখলাম, এখানে নামাটা কেবিনে নামার চেয়েও কষ্টকর হবে, কারণ, ঝড়ে কেবিন কম্প্যানিয়ন-হ্যাচের আশপাশের কাঠামো ভেঙে সাগরে চলে যাওয়ায়, ফোকাসল-ওয়েতে অক্ষত জায়গা ছিল মাত্র তিন বর্গফুট। তবু সেদিক দিয়ে নামতে আমি কোনো দ্বিধা করলাম না ;

শরীরে একটা দড়ি পেঁচিয়ে ডুব মেরে, দ্রুত গেলাম আমি বার্থে, এবং কুড়ালটাকে তুলে আনলাম প্রথম চেষ্টাতেই। আনন্দে ফেটে পড়ল অগাস্টাস আর পিটার্স, সহজে কুড়াল নিয়ে আসতে পারাটাকে আমরা মনে করলাম আমাদের প্রাণে বেঁচে যাওয়ার পক্ষে একটা শুভ লক্ষণ।

নতুন আশায় উদ্দীপিত হয়ে সর্বশক্তিতে পালাক্রমে ডেক কাটতে লাগলাম পিটার্স আর আমি, আহত বাহু নিয়ে অগাস্টাস আমাদের কোনো সাহায্যেই এল না। দুর্বল শরীরে দু-এক মিনিট পরপরই বিশ্রাম নিতে হলো বলে বুঝতে পারলাম, ডেক কেটে স্টোররুমে ঢোকার মতো একটা ফোকর তৈরি করতে অনেক সময় লাগবে, কিন্তু এই চিন্তা আমাদের নিরুৎসাহিত করতে পারল না। চাঁদের আলোয় সারারাত কুড়াল চালিয়ে, কাজটা আমরা সেরে ফেললাম তেইশ তারিখ ভোরে।

যথা শিগগির নেমে গেল পিটার্স, আর খানিক পরেই উঠে এল জলপাইভরা একটা বয়াম নিয়ে। গপগপ করে জলপাইগুলো খেয়ে, আবার তাকে নামিয়ে দিলাম আমরা। এবার সে নিয়ে এল বিশাল একটুকরো হ্যাম আর এক বোতল ম্যাডেইরা ওয়াইন। বেশি ওয়াইন খাবার ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়াটা স্মরণ করে খেলাম আমরা দু-এক চুমুক। হ্যামটার হাড়ের কাছের পাউন্ড দুই ছাড়া বাকি মাংস একদম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সাগরের নোনা পানিতে। ভালো মাংসটুকু ভাগ করা হলো তিনজনের মধ্যে। খিদে সামাল দিতে না পেরে পিটার্স আর অগাস্টাস তৎক্ষণাৎ সাবাড় করে ফেলল নিজ নিজ ভাগ ; কিন্তু এরপরেই পিপাসা লাগবে ভেবে আমি খেলাম মাত্র খানিকটা। কঠোর পরিশ্রমের ফলে এবার ঘুম নামল সবার চোখে।

দুপুর নাগাদ বেশকিছুটা চাঙা হয়ে, সূর্যাস্ত পর্যন্ত পালাক্রমে স্টোররুমে নামলাম পিটার্স আর আমি, আর প্রত্যেকবারই পেলাম কিছু না কিছু – ছোট ছোট চারটে বয়ামভরা জলপাই, হ্যামের আরেকটা টুকরো, একটা কারবয়ে প্রায় তিন গ্যালন চমৎকার কেপ ম্যাডেইরা ওয়াইন, আর ছোট জাতের একটা গ্যালিপ্যাগো কচ্ছপ, গ্রামপাস বন্দর ছাড়ার আগে যেগুলোর বেশ কয়েকটা ক্যাপটেন বার্নার্ড তুলে নিয়েছিল প্রশান্ত মহাসাগর থেকে সদ্য ফিরে আসা সিল শিকারি জাহাজ মেরি পিটস থেকে।

আমার বিবরণে পরেও এই জাতের কচ্ছপের কথা বেশ কয়েকবার থাকবে। পাঠকগণের অনেকেই নিশ্চয় জানেন, এগুলো প্রধানত পাওয়া যায়

গ্যালিপ্যাগোস দ্বীপপুঞ্জে, যার নামকরণ করা হয়েছে এই কচ্ছপের নামানুসারে। স্প্যানিশ শব্দ 'গ্যালিপ্যাগো' অর্থ হলো — মিঠে পানির কচ্ছপ। অদ্ভুত আকার আর চালচলনের জন্যে কখনো কখনো তাদের হাতি কচ্ছপও বলা হয়। এগুলো মাঝেসাঝেই বিশাল আকারে পাওয়া যায়। আমি এগুলোর বেশ কয়েকটা দেখেছি যেগুলোর ওজন ছিল বারোশো থেকে পনেরোশো পাউন্ড, যদিও কোনো নাবিকই এগুলোর ওজন আটশো পাউন্ডের বেশি বলেছে এমনটা মনে পড়ে না। এগুলোর চেহারা খুবই অদ্ভুত, এমনকি ঘৃণ্য। হাঁটে তারা খুবই ধীরে, থপথপ করে, তখন শরীরটা উঠে থাকে মাটির প্রায় একফুট ওপরে। তাদের গলা লম্বা আর অত্যন্ত সরু ; সাধারণত আঠারো ইঞ্চি থেকে দুই ফুট, তবে আমি একটাকে মেরেছিলাম যেটার কাঁধ থেকে মাথার ডগা ছিল অন্তত তিন ফুট দশ ইঞ্চি। তাদের মাথার সঙ্গে সাপের মাথার রয়েছে আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য। কোনোরকম খাবার ছাড়া তারা অবিশ্বাস্য সময় ধরে বেঁচে থাকতে পারে ; জানা গেছে, একবার এক জাহাজের খোলে কোনো খাবারদাবার ছাড়া তারা আটকা পড়েছিল দুই বছর, অথচ অতদিন পরেও তারা ছিল একইরকম নাদুসনুদুস। একদিক থেকে তাদের সাদৃশ্য রয়েছে মরুভূমির উটের সঙ্গে। গলার গোড়ার দিকের এক থলেতে কচ্ছপগুলো সবসময় পানি জমিয়ে রাখতে পারে। এক বছর কোনো খাবার পায়নি এমন কচ্ছপের থলেতেও পাওয়া গেছে তিন গ্যালন মিষ্টি আর তাজা পানি। তারা প্রধানত খায় বুনো পার্সলে আর সেলারি, পার্সলেইন, সি-কেলপ, আর গ্যালিপ্যাগোস দ্বীপপুঞ্জের সৈকতসংলগ্ন পাহাড়গুলোতে প্রচুর পরিমাণে থাকা প্রিকলি-পেয়ার নামক একজাতের সবজি। এই কচ্ছপগুলোর চমৎকার আর অত্যন্ত পুষ্টিকর মাংস প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তিমি শিকার বা অন্যান্য অভিযানে আসা হাজার হাজার নাবিককে বাঁচিয়ে রাখে।

আমরা স্টোররুমে যে কচ্ছপটা পেলাম সেটা বড় নয়, ওজন সম্ভবত পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর পাউন্ড হবে। কচ্ছপটা মাদি, খুবই নাদুসনুদুস, থলেতে পাওয়া গেল এক কোয়ার্টেরও বেশি স্বচ্ছ আর মিষ্টি পানি। আমাদের ওই পরিস্থিতিতে ওটা ছিল একটা সম্পদ ; সময়োচিত এই উপহারের জন্যে হাঁটু মুড়ে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম ঈশ্বরকে।

কচ্ছপটা ছিল বেশ শক্তিশালী, অনেক কসরত করার পর আমরা ওটাকে টেনে তুলেছিলাম গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে।

কচ্ছপটার ঘাড়ের থলের পানিটুকু আমরা ধরে রাখলাম একটা জগে। তারপর একটা বোতলের গলা ভেঙে তৈরি করে নিলাম একটা গ্লাস, যেটাতে পানি ধরতে পারে আধ জিলেরও (এক জিল = আড়াই আউন্স) কম। ওই গ্লাসে একবার করে পানি খেলাম আমরা, আর ঠিক করলাম, যতদিন পানি থাকে প্রতিদিন একেকজন আমরা একগ্লাসের বেশি পানি খাব না।

গত দু-তিন দিন ধরে আবহাওয়া শুকনো আর গরম, তাই আমাদের বিছানা, পোশাক সব শুকিয়ে যাওয়ায় অনেকটা জলপাই আর হ্যাম, সঙ্গে সামান্য ওয়াইন খেয়ে রাতটা (তেইশ তারিখ) বেশ ভালোভাবেই কাটিয়ে দিলাম।

অধ্যায় ১৩

জুলাই ২৪. আজ সকালে আমরা সবাই বেশ সতেজ আর প্রাণবন্ত। সাগরে এখন আমরা ঠিক কোথায় আছি জানি না, তবে তীর থেকে নিশ্চয় অনেক দূরে, সঙ্গে যে খাবার আছে তা অত্যন্ত সাবধানে ব্যয় করলেও চলবে আর বড়জোর পনেরো দিন, ভেসে চলেছি বাতাস আর ঢেউয়ের করুণার ওপর নির্ভর করে, আর যাতে ভেসে চলেছি সেটা জাহাজের এক বিষম ব্যঙ্গ – তা সত্ত্বেও আমরা রয়েছি মন্দের ভালো।

সূর্য উঠতে খাবারের সন্ধানে আবার কেবল স্টোররুমে নামতে যাব আমরা, এমন সময় এল বৃষ্টি। বিছানার চাদরের সহায়তায় প্রায় একজগ পানি ধরলাম। তারপরে উত্তরদিক থেকে ধেয়ে এল ঝড়, জাহাজ এমনভাবে দুলতে লাগল যে কেউই আর ডেকে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। তাই শিগগির নিজেদের আমরা বেঁধে নিলাম চরকির সঙ্গে। রাতে ঝড় আরও বাড়ল, বারবার ঢেউ চলে যেতে লাগল ডেকের ওপর দিয়ে। সৌভাগ্যক্রমে, পানি ছিল বেশ গরম।

জুলাই ২৫. সকালে কমে গেল ঝড়ের বেগ, আমরা আবার ডেকের ওপর দাঁড়াতে পারলাম। দুঃখের বিষয়, এত সাবধানে বেঁধে রাখা সত্ত্বেও জলপাইয়ের দুই বয়াম আর হ্যামের পুরোটাই চলে গেছে সাগরে। তবু এক্ষুণি আমরা কচ্ছপটাকে মারব না বলে ঠিক করলাম, নাস্তা হিসেবে কিছু জলপাই খেয়েই সন্তুষ্ট থাকলাম, তার সঙ্গে আধ গ্লাস পানিতে মেশানো আধ গ্লাস ওয়াইন, এতে পোর্ট খেয়ে যে বিশ্রী অবস্থা হয়েছিল, তার পরিবর্তে বরং শরীর চাঙা হয়ে উঠল। সাগর অবশ্য এখনো এতটা শান্ত হয়নি যে স্টোররুমে নামা যাবে। দুপুর নাগাদ সূর্য উঁকি দিতে সেটাকে প্রায় খাড়া অবস্থায় দেখে নিঃসন্দেহে বুঝলাম, উত্তর-পশ্চিম থেকে আসা বাতাসে একনাগাড়ে উত্তরে ভাসতে ভাসতে আমরা এখন চলে এসেছি বিষুবরেখার

কাছাকাছি। সন্ধের দিকে দেখলাম বেশ কয়েকটা হাঙর, বড় একটা সোজা এগিয়ে এল আমাদের দিকে। একবার ঢেউয়ে ডেকটা কাত হতেই শয়তানটা উঠে এসে ছটফট করতে লাগল কম্প্যানিয়ন-হ্যাচের ওপরে, আর লেজ দিয়ে জোর এক বাড়ি কষাল পিটার্সকে। আরেকটা ঢেউয়ের ধাক্কা ওটাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেল সাগরে। আবহাওয়া ভালো থাকলে আমরা সহজেই শয়তানটাকে ধরে ফেলতে পারতাম।

জুলাই ২৬. বাতাসের বেগ অনেকটা কমে যাওয়ায় আর সাগর মোটামুটি শান্ত হয়ে আসার ফলে আবার নামলাম আমরা স্টোররুমে। সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর বোঝা গেল, ওখান থেকে আর খাবার পাবার আশা করা বৃথা, কারণ, গত রাতে রুমটার দেওয়াল ভেঙে যাওয়ায় ওখানকার সবকিছু ভেসে চলে গেছে খোলে। স্বভাবতই আমরা হতাশ হয়ে পড়লাম।

জুলাই ২৭. সাগর প্রায় শান্ত, মৃদু একটা বাতাস বইছে, এখনো উত্তর আর পশ্চিম থেকে। বিকেলে বেরিয়ে এল গরম সূর্য, তাই আমাদের কাপড়চোপড়গুলো শুকিয়ে নিলাম। সাগরে গোসল করায় পিপাসাও অনেক কমল, আরামও পেলাম ; তবে গোসল করেছি আমরা খুব সাবধানে, দিনের বেলায় জাহাজের আশপাশে বেশ কয়েকটা হাঙরকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে।

জুলাই ২৮. আবহাওয়া এখনো ভালো। জাহাজটা এত কাত হয়ে গেছে যে আমরা ভয় পাচ্ছি, শেষমেশ ওটা উল্টে যেতে পারে। জলপাইয়ের বাকি দুটো বয়াম, পানির জগ, আর কচ্ছপটাকে বেঁধে রাখলাম যথাসম্ভব সাবধানে। সাগর সারাদিন শান্ত রইল, বাতাস নেই বললেই চলে।

জুলাই ২৯. আবহাওয়া একইরকম। অগাস্টাসের জখম বাহুতে এখন পচনের স্পষ্ট চিহ্ন। সে বলছে, ঘুম-ঘুম ধরছে তার আর পাচ্ছে ভীষণ পিপাসা, কিন্তু তীব্র কোনো ব্যথা নেই। তার ক্ষতে জলপাইয়ের সামান্য ভিনিগার ঘষা ছাড়া করা গেল না আর কিছুই, আর তাতে কোনো উপকারও হলো না। তার আরামের জন্যে আমরা যথাসাধ্য করলাম, তিনগুণ করে দিলাম তার পানির বরাদ্দ।

জুলাই ৩০. ভীষণ গরম, একফোঁটা বাতাসও নেই। দুপুরের আগ পর্যন্ত জাহাজের কাছ ঘেঁষে রইল বিশাল এক হাঙর। একটা ফাঁস দিয়ে অনেকবার ওটাকে ধরার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম আমরা। কোনো শুশ্রূষা করতে না পারায় আরও খারাপ হয়েছে অগাস্টাসের অবস্থা। এই কষ্ট থেকে

সবসময় মুক্তি চাইছে সে, মৃত্যু কামনা করছে। সন্ধেয় খেলাম আমরা সর্বশেষ কয়েকটা জলপাই, জগের পানি এত পচে গেছে যে ওয়াইন মিশিয়ে ছাড়া খাবার উপায় নেই। আগামীকাল সকালে কচ্ছপটাকে মারতেই হবে।

জুলাই ৩১. জাহাজ কাত হয়ে যাওয়ায় দুশ্চিন্তা আর অবসাদের একটা রাত পার করে, কচ্ছপটাকে মারলাম আমরা। স্বাস্থ্য ভালো হলেও, যতটা ভেবেছিলাম ওটার মাংস হলো তারচেয়ে অনেক কম – বড়জোর দশ পাউন্ড। প্রায় তিন পাউন্ড মাংস যত বেশি দিন সম্ভব সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ভিনিগারে চুবিয়ে রেখে দিলাম জলপাইয়ের বাকি তিনটে বয়াম আর ওয়াইনের বোতলটার ভেতরে। বাকি মাংস শেষ করার আগে এগুলো আমরা ছুঁয়েও দেখব না। ঠিক হলো, প্রতিদিন চার আউন্সের বেশি মাংস খাওয়া চলবে না কিছুতেই ; তাহলে কাটানো যাবে আরও তেরো দিন। বজ্রবিদ্যুৎসহ একপশলা বৃষ্টি হলো গোধূলির সময়, কিন্তু এতই স্বল্পকালীন যে আধ পাইন্টের বেশি পানি ধরা গেল না। সবটুকুই দেওয়া হলো অগাস্টাসকে, কারণ, বোঝা যাচ্ছিল যে তার শেষ সময় প্রায় উপস্থিত।

তবে এই পানি তার তেমন কোনো উপকারে এল না। তার বাহু কবজি থেকে কাঁধ পর্যন্ত একদম কালো হয়ে গেছে, পা বরফের মতো ঠান্ডা। ভয়ংকরভাবে শুকিয়ে গেছে সে ; ন্যানটাকেট ছাড়ার সময় তার ওজন ছিল একশো সাতাশ পাউন্ড, অথচ এখন সে এসে দাঁড়িয়েছে চল্লিশ বা বড়জোর পঞ্চাশ পাউন্ডে। চোখ এত বসে গেছে যে দেখা যায় কি যায় না, গালের চামড়া এমনভাবে ঝুলে পড়েছে যে এখন খাবার চিবিয়ে খাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব, এমনকি গিলে খাওয়াও যথেষ্ট কষ্টের ব্যাপার।

অগাস্ট ১. একইরকম শান্ত আবহাওয়া, সঙ্গে গনগনে সূর্য। পিপাসায় বুক ফাটার জোগাড়, এদিকে জগের পানিতে কিলবিল করছে পোকা। তারপরেও ওয়াইন মিশিয়ে আমরা খেলাম একটু পানি, পিপাসা তাতে সামান্যই কমল। বরং সাগরে গোসল করে অনেক আরাম পাওয়া গেল, তবে গোসল করতে হলো অনেকক্ষণ পরপর, কারণ, আশপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে হাঙরের পাল। এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে অগাস্টাসকে আমরা আর বাঁচাতে পারব না ; সে মারা যাচ্ছে। বেশ কয়েক ঘণ্টা একটাও কথা না বলার পর, তীব্র খিঁচুনি দিয়ে মারা গেল সে বেলা বারোটার দিকে। অগাস্টাসের মৃত্যু বুক ভেঙে দিল আমাদের, লাশের কাছে স্থির হয়ে বসে রইলাম আমরা সারাদিন, দু-চারটে কথা বললাম কেবল ফিসফিস করে। রাত নামার খানিক পর লাশটাকে আমরা ফেলে দিতে গেলাম পানিতে।

ততক্ষণে বর্ণনাতীতভাবে পচে গিয়েছিল লাশটা, পিটার্স তুলতে যেতেই ওটার পুরো একটা পা খসে চলে এল তার হাতে। পচাগলা লাশটা পানিতে পড়তেই, ছুটে এল সাত-আটটা বড় বড় হাঙর, মাংস ছেঁড়ার সময় তাদের চোয়ালের ভয়াবহ শব্দ বোধ হয় শোনা গেল একমাইল দূর থেকে। সেই শব্দে আমাদের দুজনেরই রক্ত হিম হয়ে গেল।

অগাস্ট ২. একই ধরনের ভীতিকর শান্ত আর গরম আবহাওয়া। সকাল হলো অসহ্য শারীরিক ক্লান্তি নিয়ে। জগের পানি এখন আর পানি নেই, পরিণত হয়েছে পোকায় ভরা থিকথিকে আঠাল পদার্থে। ওগুলো ফেলে দিয়ে জগটাকে ভালো করে ধুয়ে নিলাম সাগরের পানিতে, তারপর সেখানে ঢাললাম কচ্ছপের আচারের বোতল থেকে কিছু ভিনিগার। পিপাসা অসহনীয় হয়ে ওঠায় সেটা মিটাতে চাইলাম ওয়াইন খেয়ে, কিন্তু তাতে আগুনে যেন ঘি পড়ল, মাতালের মতো পাক দিতে লাগল আমাদের মাথা। পরে এই কষ্ট দূর করার জন্যে আমরা সাগরের পানি মেশালাম ওয়াইনের সঙ্গে ; কিন্তু ওই বস্তু পেটে পড়তেই এমন বমি বমি ভাব হতে লাগল যে সে চেষ্টা একেবারেই বাদ দিলাম। সারাদিন আমরা গোসল করার একটা সুযোগ খুঁজলাম, কিন্তু কোনো লাভ হলো না ; জাহাজের চারপাশে এখন সাঁতরে চলেছে হাঙরের পাল – আমার হতভাগ্য বন্ধুর লাশ চেটেপুটে খাবার পর যে কোনো মুহূর্তে আরেকটা মহাভোজের আশায়। গোসল করে একটু শান্তি পেতাম, সেই পথও বন্ধ হয়ে গেল। যদি সামান্য পা পিছলে যায়, সোজা আমরা গিয়ে পড়ব রাক্ষুসে মাছগুলোর কবলে। মাঝেসাঝেই তারা উঠে আসছে লিওয়ার্ডে, চিৎকার করলেও সরছে না। বড় একটাকে পিটার্স কুড়ালের কোপে বেশ আহত করার পরেও সেটা তেড়ে আসতে চাইছিল আমাদের দিকে। গোধূলির সময় মেঘ করল, কিন্তু বৃষ্টি না ঝরিয়েই ভেসে চলে গেল মাথার ওপর দিয়ে। সারারাত ঘুম হলো না প্রচণ্ড পিপাসায় আর হাঙরের আতঙ্কে।

অগাস্ট ৩. উদ্ধারের কোনো আশা দেখছি না। জাহাজ আরও কাত হয়ে যাওয়ায় ডেকের ওপর দিয়ে ভালোভাবে হাঁটা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ওয়াইন আর কচ্ছপের মাংস আরও শক্ত করে বেঁধে রাখলাম। সারাদিন কষ্ট পেলাম বুকফাটা পিপাসায় – হাঙরের জন্যে গোসল করারও কোনো উপায় নেই, শয়তানগুলো একটা মুহূর্তও জাহাজের পাশ ছেড়ে নড়েনি। কিছুতেই ঘুমানো গেল না।

অগাস্ট ৪. ভোরের সামান্য আগে আমরা বুঝতে পারলাম, জাহাজটা ধীরে ধীরে উল্টে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎই সবেগে সাগরে নিক্ষিপ্ত হয়ে, তলিয়ে গেলাম আমরা বেশ কয়েক ফ্যাদম পানির নিচে।

জাহাজের একেবারে তলায় চলে গেছি দেখে বাঁচার আশা ত্যাগ করলাম আমি। কিন্তু ভাবতে পারিনি, অতবড় জাহাজটা উল্টে যাওয়ায় সৃষ্ট ঘূর্ণিস্রোত পাক খেতে খেতে উঠে আসবে ওপরে। সেই টানে পানির ওপরে উঠে এলাম, ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজও খানিকটা সোজা হলো, কিন্তু ততক্ষণে পিছিয়ে পড়েছি প্রায় বিশ গজ। প্রবল সেই ঘূর্ণিস্রোতের মাঝে পিটার্সকে দেখতে পেলাম না কোথাও, কয়েক ফুটের ভেতরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে জাহাজের নানা টুকিটাকি জিনিস আর তেলের একটা পিপে।

সবচেয়ে ভয় পেলাম হাঙরগুলোর কথা ভেবে, কারণ, শয়তানেরা আশপাশেই আছে। সর্বশক্তিতে হাত-পা ছুড়ে পানিতে ফেনা তুলে এগোতে লাগলাম জাহাজের দিকে ; কীভাবে সেদিন রক্ষা পেয়েছিলাম ঈশ্বরই জানেন, সাঁতরে আসার সময় অবশ্যই ধাক্কা খেয়েছি চারপাশে গিজগিজ করা দু-চারটে হাঙরের গায়ে। জাহাজের কাছে পৌঁছতে এত ক্লান্ত হয়ে পড়লাম যে মনে হলো, ওটার ওপরে আর উঠতে পারব না, কিন্তু ঠিক সেই সময় উল্টো পাশ থেকে খোলের ওপরে উঠে এল পিটার্স, আর আমার দিকে ছুড়ে দিল একটা দড়ি।

এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতেই মাথা জুড়ে এল অনাহারের বিপদের কথা। সবরকম সাবধানতা সত্ত্বেও আমাদের সমস্ত খাবার ভেসে গেছে সাগরে। খাবার পাবার আর বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই বুঝে, শিশুদের মতো হাউমাউ করে কেঁদে উঠলাম দুজনে। পুরুষের এরকম দুর্বলতা কল্পনাও করা যায় না, যাঁরা অবিকল আমাদের অবস্থায় কখনোই পড়েননি, তাঁদের কাছে অবশ্যই ব্যাপারটা অস্বাভাবিক ঠেকবে।

যাই হোক, ওয়াইন আর কচ্ছপের মাংস হারিয়ে ফেলাটা খুব বড় বিপদ হয়ে দেখা দিল না, অবশ্য বৃষ্টির পানি ধরার বিছানার চাদরটা আর জগ হারিয়ে ফেলাটা হিসেবে না ধরলে। কারণ, জাহাজের তলা জুড়ে আমরা পেলাম চমৎকার স্বাদের, পুষ্টিকর বড় বড় সব গুগলি-শামুক। পরিমিতভাবে খেলে এগুলোতে আমাদের একমাস চলে যাবে দেখে, আতঙ্ক অনেকটা কমে গেল।

অসুবিধে রয়ে গেল পানি নিয়ে। চাদর না থাকায়, গায়ের শার্ট খুলে পানি ধরার প্রস্তুতি নিলাম আমরা – যদিও এভাবে প্রত্যেকবার আধ জিলের

বেশি পানি ধরা যাবে বলে মনে হয় না। সারাদিন পাওয়া গেল না মেঘের কোনো চিহ্ন। রাতে পিটার্স অশান্তভাবে ঘণ্টাখানেক ঘুমালেও, পিপাসায় মুহূর্তের জন্যেও দু-চোখের পাতা এক করতে পারলাম না আমি।

অগাস্ট ৫. আজ ঝিরঝিরে বাতাসে ভেসে এল প্রচুর সাগর-শৈবাল, যার ভেতরে আমরা পেলাম এগারোটা ছোট ছোট কাঁকড়া। খোলা নরম থাকায় সবসুদ্ধই কাঁকড়াগুলোকে খেয়ে ফেললাম আমরা, আর গুগলি-শামুক খেয়ে ক্ষুধা না কমলেও এগুলো খেয়ে পিপাসা কমল। আশপাশে কোনো হাঙর না দেখে, সাগরে নেমে রইলাম আমরা চার-পাঁচ ঘণ্টা, এতে আরও কমে গেল পিপাসার যন্ত্রণা। রাতে দুজনেরই একটু করে ঘুম হলো।

অগাস্ট ৬. আজ দুপুর নাগাদ শুরু হয়ে একনাগাড়ে বৃষ্টি হলো আঁধার নামা পর্যন্ত। জগ আর কারবয়টা থাকলে সেগুলোর দুটো না হলেও অন্তত একটা আমরা বৃষ্টির পানিতে ভরিয়ে নিতে পারতাম। শার্ট ভিজিয়ে সেটা চিপে পানি খেলাম একটু একটু করে। এই কাজেই কেটে গেল সারাটা দিন।

অগাস্ট ৭. ভোর হতেই দুজনেরই চোখে পড়ল, পুব থেকে একটা জাহাজ এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে ! চিৎকার শুরু করলাম আমরা দুর্বল গলায়, বাতাসে শার্ট ওড়ালাম, লাফালাম এই শরীরে যতটা লাফানো সম্ভব ; মোট কথা, কোনো সঙ্কেতই বাদ দিলাম না, যদিও জাহাজটা তখনো অন্তত পনেরো মাইল দূরে। যাই হোক, ওটা এদিকেই আসছে, আর গতিপথ পরিবর্তন না করলে আমাদের দেখতে পাবার মতো কাছে চলে আসবে। ওটাকে প্রথম দেখতে পাবার ঘণ্টাখানেক পর ওটার ডেকে মানুষ চোখে পড়ল আমাদের। লম্বা, নিচু একটা স্কুনার, সামনের পালের ওপর কালো একটা বল, নাবিকে বোঝাই। কিন্তু খোদ শয়তানের মতো নৃশংসতায় দেখেও না দেখার ভান করে আমাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে ওটা চলে যাবে না তো ? যারা সৃষ্টির সেরা জীব বলে পরিগণিত, তাদের দ্বারা কিন্তু সাগরে এরকম কাণ্ড ঘটেছে। বোস্টনের 'পলি' নামক একটা জাহাজ পড়েছিল আমাদেরই মতো দুর্ভোগে। ১৮১১ সালের ১২ ডিসেম্বর একশো তিরিশ টনের জাহাজটা তক্তা আর খাবারের বোঝা নিয়ে, ক্যাপটেন ক্যাসনুর নেতৃত্বে বোস্টন ছেড়েছিল সান্তা ক্রোয়ার উদ্দেশ্যে। জাহাজে ক্যাপটেন ছাড়া ছিল আটজন মানুষ – মেট, চারজন নাবিক, পাচক, জনৈক মি. হান্ট, আর তার সঙ্গের এক নিগ্রো মেয়ে। পনেরো তারিখে দক্ষিণ-পূর্ব থেকে আসা একটা ঝড়ে তলা ফুটো হয়ে জাহাজটা উল্টে গিয়েও শেষমেশ ডুবে যায়নি। এই অবস্থায় সামান্য খাবার নিয়ে একশো একানব্বই দিন কেটে যাবার পর

(পনেরো ডিসেম্বর থেকে বিশ জুন), কেবল টিকে থাকা ক্যাপটেন ক্যাসনু আর স্যামুয়েল ব্যাজারকে উদ্ধার করে 'ফেম' নামক এক জাহাজের ক্যাপটেন ফিদারস্টোন। উদ্ধার করার সময় 'পলি' ছিল অক্ষাংশ ২৮° উত্তর আর দ্রাঘিমাংশ ১৩° পশ্চিমে, এবং ভেসে গিয়েছিল দুই হাজার মাইলেরও বেশি ! সুদীর্ঘ এই পথে তাদের দেখা হয়েছে বারোটারও বেশি জাহাজের সঙ্গে, যার মধ্যে একটা আবার একেবারে কাছে এসেও তাদের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে চলে গেছে ! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের এই চরম নিষ্ঠুরতার মুখোমুখি হতে হলো না। আমাদের চোখে পড়ামাত্র ডেকের ওপরে ছোটাছুটি শুরু করে দিল তারা, আর ব্রিটিশ একটা পতাকা তুলে এগিয়ে এল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা স্থান পেলাম 'জেন গাই'-এর কেবিনে। লিভারপুল থেকে ক্যাপটেন গাই রওনা দিয়েছে দক্ষিণ আর প্রশান্ত মহাসাগরে সিল শিকার আর ব্যবসা করতে।

অধ্যায় ১৪

জেন গাই জাহাজটা বেশ সুন্দর, আবহাওয়া শান্ত থাকলে খুব জোরে ছুটতে পারে। তবে প্রচণ্ড ঝড়ে টিকে থাকার উপযুক্ত জাহাজ এটা নয়। ঝড়ের বিপক্ষে কার্যকর আরও বড় জাহাজ – যেগুলোর ওজন তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো টন, সেখানে জেন গাইয়ের ওজন একশো আশি টন। যথেষ্ট সশস্ত্রও থাকা উচিত ছিল এটার – দশ থেকে বারো পাউন্ডের ক্যারোনেড কামান, আর লম্বা নলের দু-তিনটে পিতলের ব্লান্ডারবাস বন্দুকসহ। শক্তসমর্থ নাবিকও থাকা উচিত ছিল অন্তত পঞ্চাশ-ষাটজন, অথচ মাত্র পঁয়ত্রিশজন রয়েছে এখানে।

ক্যাপটেন গাই খুব ভদ্র একজন মানুষ, জীবনের বেশির ভাগই দক্ষিণের সাগরগুলোতে কাটিয়েছে বলে অভিজ্ঞতাও তার প্রচুর। তবে তার প্রাণশক্তির খানিকটা অভাব রয়েছে যা এই ধরনের অভিযানের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই জাহাজটার সে আংশিক মালিক, আর দক্ষিণের সাগরগুলোতে ইচ্ছেমাফিক যে কোনো পণ্যদ্রব্য নিয়ে যাবার অধিকারী। এবার তার সঙ্গে রয়েছে নানারকম পুঁতি, আয়না, কাঠের জিনিস, কুড়াল, বেলচা, করাত, বাইস, র‍্যাঁদা, বাটালি, তুরপুন, উখা, হাতুড়ি, গজাল, ছুরি, কাঁচি, খুর, সুচ, সুতো, মাটির বাসনপত্র, ভারতীয় সুতি কাপড়, কমদামি গয়না এবং এই ধরনের আরও অনেক জিনিস।

জুলাইয়ের দশ তারিখে লিভারপুল ছেড়ে, জেন গাই পঁচিশ তারিখে কর্কটক্রান্তি অতিক্রম করে, অক্ষাংশ বিশ ডিগ্রি পশ্চিমে, তারপর ঊনত্রিশ তারিখে কেপ ভার্ড দ্বীপপুঞ্জের একটা দ্বীপ শ্যাল-এ পৌঁছে নেয় লবণ এবং অভিযানের জন্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস। তিন অগাস্ট কেপ ভার্ড

ছেড়ে, দক্ষিণ-পশ্চিমে এগিয়ে, বিষুবরেখা অতিক্রম করার জন্যে জাহাজটা যায় ব্রাজিলের উপকূলে। ইয়োরোপ থেকে কেপ অব গুড হোপ বা ইস্ট ইন্ডিজগামী জাহাজগুলো সাধারণত এই পথই ব্যবহার করে। ক্যাপটেন গাই প্রথম যাত্রাবিরতিটা কারগুয়েলেন ল্যান্ডে কেন করতে চাইছে বলতে পারব না। আমাদের তুলে নেওয়ার দিন স্কুনারটা ছিল কেপ সেন্ট রোকে, দ্রাঘিমাংশ একত্রিশ ডিগ্রি পশ্চিমে ; অর্থাৎ, উত্তর থেকে আমরা দক্ষিণে ভেসে গিয়েছিলাম অন্তত পঁচিশ ডিগ্রি !

জেন গাইয়ের কাছে আমরা বেশ ভালো ব্যবহার পেলাম। দক্ষিণ-পুবে যেতে যেতে পনেরো দিনে পিটার্স আর আমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলাম, ঘটে যাওয়া ভয়ংকর সেই দুর্ভোগকে মনে হতে লাগল সুদূর কোনো দুঃস্বপ্ন।

মাঝেসাঝে কোনো তিমি শিকারি জাহাজের সঙ্গে দেখা হওয়া, আর কালো বা রাইট তিমির দেখা পাওয়া ছাড়া তেমন কোনো ঘটনাবিহীন এগিয়ে চললাম আমরা কয়েক সপ্তাহ। ষোলো সেপ্টেম্বরে কেপ অব গুড হোপের কাছে জাহাজ এই প্রথম ঝড়ের মুখোমুখি হলো লিভারপুল ত্যাগ করার পর। এই অঞ্চলে নাবিকদের প্রায়ই প্রচণ্ড উত্তুরে ঝড়ের মোকাবিলা করতে হয়। সেসময় সাগরও হয়ে ওঠে উত্তাল। এখানকার সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপারটা হলো, ঝড়ের ওঠানামা। হারিকেন ধেয়ে আসে উত্তর বা উত্তর-পুব থেকে, খানিক পরেই বাতাস সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে যায়, তারপর আবার অকল্পনীয় বেগে ধেয়ে আসে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে। দক্ষিণে সাদা কোনো বিন্দু দেখলে বুঝতে হবে, হারিকেন আসছে। এই সাদা হয়ে ওঠা বিন্দু দেখেই জাহাজগুলো সাবধান হবার সুযোগ পায়।

উত্তর থেকে ঝড় ধেয়ে এল সকাল ছয়টার দিকে। আটটা নাগাদ ঝড় এত বাড়ল যে উথালপাতাল হয়ে উঠল সাগর। ঢেউ ঠেলে জাহাজ এগোতে লাগল অতি কষ্টে। সূর্যাস্তের ঠিক আগে দক্ষিণ-পশ্চিমে চোখে পড়ল সাদা সেই বিন্দু। দেখতে দেখতে সত্যিই ধেয়ে এল ঝড়, তবে, সৌভাগ্যক্রমে, হারিকেনের রূপে নয়। সকালের দিকে কমে গেল ঝড়ের বেগ। ক্যাপটেন গাই ভাবল, এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেছে অলৌকিকভাবে।

তেরো অক্টোবর আমরা দেখতে পেলাম প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপ, অক্ষাংশ ৪৬°৫৩ দক্ষিণ আর দ্রাঘিমাংশ ৩৭°৪৬ পুবে। দুই দিন পর আমরা

পৌঁছলাম পজেশন দ্বীপের কাছে এবং পেরিয়ে গেলাম ক্রোজেট দ্বীপপুঞ্জ, অক্ষাংশ ৪২°৫৯ দক্ষিণ আর দ্রাঘিমাংশ ৪৮° পুবে। আঠারো তারিখে পৌঁছলাম আমরা দক্ষিণ ভারত মহাসাগরের কারগুয়েলেন বা ডেসোলেশন দ্বীপে, আর জেন গাই নোঙর ফেলল ক্রিসমাস বন্দরে।

এই দ্বীপ বা দ্বীপপুঞ্জটা কেপ অব গুড হোপের দক্ষিণ-পুবে, আর প্রায় আশি লিগ (১ লিগ = প্রায় সাড়ে ৩ মাইল) দূরে। ১৭৭২ সালে এটা প্রথম আবিষ্কার করে ব্যারন দ্য কারগুলেন বা কারগুয়েলেন নামের এক ফরাসি। তার মনে হয়েছিল এই দ্বীপ বিস্তীর্ণ একটা দক্ষিণ মহাদেশের অংশ, আর সংবাদটা সে দেশে পৌঁছে দিলে সেখানে দারুণ একটা হইচই পড়ে যায়। ব্যাপারটা তখন হাতে নেয় সরকার, আর পরবর্তী বছর ব্যারনকে আবার সেখানে পাঠায় দ্বীপটাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণের জন্যে। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার পর ব্যারন বুঝতে পারে যে তার ধারণা ছিল ভুল। ১৭৭৭ সালে সেখানে যায় ক্যাপটেন কুক এবং সেটার নাম দেয় ডেসোলেশন আইল্যান্ড বা নির্জন দ্বীপ। নামকরণটা সার্থক। নাবিকেরা অবশ্য সেটাকে নির্জন দ্বীপ না-ও ভাবতে পারে, কারণ, গেলে তারা দেখতে পাবে, সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত সেখানকার বেশির ভাগ পাহাড়ের পাশই ঢাকা রয়েছে উজ্জ্বল সবুজ গাছপালায়। প্রবঞ্চক এই ধারণার পেছনে কাজ করে এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মানো স্যাকসিফ্রেজ জাতের একটা উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদটা ছাড়া নির্জন দ্বীপে রয়েছে আর কেবল ভঙ্গুর একজাতের শ্যাওলা, বন্দরের কাছের কিছু খসখসে জঘন্য ঘাস, কিছু লাইকেন, আর কটু স্বাদের বাঁধাকপির মতো চেহারার এক ধরনের গুল্ম।

দ্বীপটা পাহাড়ে, যদিও এখানকার কোনো পাহাড়ই বেশি উঁচু নয়। পাহাড়চুড়োগুলো সবসময় বরফে ঢাকা থাকে। এখানকার অনেকগুলো বন্দরের মাঝে যোগাযোগের পক্ষে ক্রিসমাস বন্দরই সবচেয়ে সুবিধেজনক। কেপ ফ্রাঁসোয়া পার হলে দ্বীপের উত্তর-পুবে প্রথমেই এই বন্দরটার স্থান। দ্বীপের উত্তর তীরের কেপ ফ্রাঁসোয়ার অদ্ভুত আকার ক্রিসমাস বন্দরকে বিশিষ্ট করেছে। এখানকার উঁচু পাথরের মাঝের বড় একটা গর্ত সৃষ্টি করেছে প্রাকৃতিক এক খিলান, যার প্রবেশমুখটা রয়েছে অক্ষাংশ ৪৮°৪০ দক্ষিণ আর দ্রাঘিমাংশ ৬৯°৬ পুবে। এই খিলানের নিচ দিয়ে ঢুকে পড়লেই ছোট ছোট অনেক দ্বীপে পাওয়া যাবে নোঙর ফেলার ভালো ভালো জায়গা,

যেগুলো যে কোনো পুবালি ঝড়ের হাত থেকে যথেষ্ট পরিমাণে সুরক্ষিত। এখান থেকে পুবদিকে এগোলে বন্দরের মাথায় পাওয়া যাবে ওয়াস্প বে। এটা পুরোপুরি স্থলবেষ্টিত একটা অববাহিকা। পশ্চিমে, ওয়াস্প বে-র মাথায় রয়েছে মিঠে পানির একটা ঝরনা।

আজও লোমশ আর চুলঅলা প্রজাতির সিল পাওয়া যায় কারগুয়েলেন দ্বীপে, আর হাতি সিল (Sea elephant) প্রচুর পরিমাণে। এখানে রয়েছে চার প্রজাতির অসংখ্য পেঙ্গুইন। সবচেয়ে বড় প্রজাতিটার নাম রয়াল পেঙ্গুইন, এরকম নামকরণ হয়েছে তার আকার আর সুন্দর পালকের জন্যে। তার শরীরের ওপরের অংশ সাধারণত ধূসর রঙের, কখনো কখনো লাইলাকের মতো নীল-লালাভ ছোপ থাকে ; শরীরের নিচের অংশ অকল্পনীয় রকমের ধবধবে সাদা। মাথা আর পা চকচকে কালো। পালকের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হলো, মাথা থেকে বুক পর্যন্ত চওড়া দুটো সোনালি ডোরা। লম্বা ঠোঁট গোলাপি বা টকটকে লাল। পাখিগুলো রাজকীয় ঢঙে সোজা হয়ে হাঁটে। মাথাটা উঁচু হয়ে থাকে, দুই ডানা দুই পাশে ঝোলে দুটো বাহুর মতো, লেজ থাকে পা বরাবর, সব মিলিয়ে মানুষের হাঁটার সঙ্গে তাদের রয়েছে এক আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য, তাই একনজর দেখে বা গোধূলির ঘনায়মান অন্ধকারে পাখিগুলোকে মানুষ বলে ভুল করা স্বাভাবিক। কারগুয়েলেন দ্বীপে আমাদের দেখা রয়াল পেঙ্গুইনগুলো রাজহাঁসের চেয়েও বড়। অন্য প্রজাতিগুলো হলো– ম্যাকারনি, জ্যাকাস, আর রুকারি পেঙ্গুইন। তারা আকারে অনেক ছোট, পালকের সৌন্দর্য কম, রয়েছে আরও নানা পার্থক্য।

পেঙ্গুইনের পাশাপাশি এখানে রয়েছে আরও অনেক রকমের পাখি– যেমন, সি-হেন, নীল পেট্রেল, টিল, হাঁস, পোর্ট এগমন্ট হেন, শ্যাগ পানকৌড়ি, কেপ পিজন, নেলি, সি-সোয়ালো, টার্ন, গাংচিল, মাদার কেরির মুরগি, মাদার কেরির রাজহংসী বা গ্রেট পেট্রেল এবং অ্যালবাট্রস।

গ্রেট পেট্রেল সাধারণ অ্যালবাট্রসের সমানই বড়, আর মাংসাশী। তাদের অনেকেই বলে ব্রেকবোন, কিংবা অসপ্রে পেট্রেল। তারা মানুষকে দেখে মোটেই ভয় পায় না, ভালোভাবে রান্না করতে পারলে তাদের মাংস খেতে বেশ লাগে। ওড়ার সময় কখনো কখনো তারা দুই ডানা মেলে পানির প্রায় সমান্তরালে চলে আসে, আর তখন ডানা প্রায় না ঝাপটিয়েই উড়তে পারে।

দক্ষিণ সাগরের পাখিদের মাঝে অ্যালবাট্রস অন্যতম বড় আর হিংস্র পাখি। তারা গাংচিল জাতের পাখি, বাচ্চার জন্ম দেওয়া বা লালন-পালনের খাতিরে ছাড়া কখনোই ডাঙায় নামে না। তাদের আর পেঙ্গুইনদের মাঝে রয়েছে আজব এক বন্ধুত্ব। দারুণ সঙ্গতিপূর্ণভাবে তারা বাসা বাঁধে পারস্পরিক পরিকল্পনা আর ঐকমত্যের ভিত্তিতে – অ্যালবাট্রস বাসা বাঁধে চারটে পেঙ্গুইনের বাসার মাঝের ছোট এক চৌকো জায়গায়। নাবিকেরা এই সম্মিলিত বাসা বাঁধার ধরনকে বলে রুকারি। এসব রুকারির বিবরণ অনেকেই দিয়েছে, কিন্তু, যেহেতু পাঠকগণের সবাই সেই বিবরণ না-ও দেখে থাকতে পারেন, আর আমি পরেও পেঙ্গুইন আর অ্যালবাট্রস সম্বন্ধে বলব, সুতরাং এখন তাদের বাসা বাঁধার ধরন আর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু বলাটা মনে হয় ভুল হবে না।

ডিমে তা দেওয়ার ঋতু এলেই পাখিগুলো জড়ো হতে থাকে ঝাঁকে ঝাঁকে, খুঁজে নেয় সাগরের যথাসম্ভব কাছের, তিন-চার একরের একটা সমতল জায়গা। সবচেয়ে মসৃণ আর পাথরহীন জায়গায়ই এ ব্যাপারে গুরুত্ব পায়। এবার তারা বাসা বাঁধে নিখুঁত চৌকো আকারে যেখানে কেবল জড়ো হওয়া পাখিগুলোরই স্থান মেলে, অর্থাৎ, বাসা বাঁধায় শ্রম দেয়নি এমন কোনো পাখিকে তারা স্থান দিতে চায় না। পানির প্রান্ত ঘেঁষে একটা জায়গা উন্মুক্ত থাকে ঢোকবার আর বেরোবার জন্যে।

রুকারির সীমানা নির্ধারণের পর উপনিবেশের পাখিরা দূর করে সমস্ত জঞ্জাল, একটা একটা করে পাথর সরিয়ে নিয়ে গিয়ে, সাগরের দিকটা ছাড়া তিনটে দেয়াল তোলে তারা সীমানার তিন দিকে। দেয়ালের ঠিক ভেতরে, বাসস্থান ঘিরে থাকে ছয় থেকে আট ফুট চওড়া সম্পূর্ণ সমতল আর মসৃণ একটা পথ, যে পথে সবাই চলাচল করতে পারে।

এবার পুরো জায়গাটাকে তারা বিভক্ত করে চৌকো চৌকো আকারে, যেগুলোর ফাঁকে থাকে সমকোণে একটা আরেকটাকে ছেদ করা সরু সরু পথ, পুরো রুকারিতে। এই পথগুলোর প্রত্যেকটা মোড়েই থাকে অ্যালবাট্রসের বাসা, আর প্রত্যেকটা চৌকো বিভক্তির মাঝে পেঙ্গুইনের বাসা – এভাবে প্রত্যেকটা পেঙ্গুইনকে ঘিরে থাকে চারটে অ্যালবাট্রস, আবার প্রত্যেকটা অ্যালবাট্রসকে ঘিরে থাকে চারটে পেঙ্গুইন। অত্যন্ত অগভীর একটা গর্ত থাকে পেঙ্গুইনের মাটির বাসাতে, যেখানে কোনো মতে সে পাড়তে

পারে একটামাত্র ডিম। এদিকে ডিম পাড়ার জন্যে এক ফুট মতো উঁচু আর দুই ফুট ব্যাসের একটা টিলার মাথায় বাসা বাঁধে অ্যালবাট্রস। টিলাটা সে তৈরি করে মাটি, সাগর-শৈবাল আর বিভিন্ন জিনিসের খোলা দিয়ে।

ডিমে তা দেওয়ার সময় বা বাচ্চা নিজের দায়িত্ব নেওয়ার উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত পাখিগুলো একমুহূর্তের জন্যেও বাসা ছেড়ে নড়ে না। মদ্দাটা খাবারের সন্ধানে সাগরে গেলে বাসা পাহারা দেয় মাদিটা, আর সঙ্গী ফিরলেই কেবল সে বাসা ছেড়ে যায় এদিক-সেদিক। ডিমে তা দেওয়া কখনোই ব্যাহত হয় না, মাদি আর মদ্দা পালাক্রমে কাজটা করে একে অপরের অনুপস্থিতিতে। অবশ্য ডিম তারা অনাবৃত রাখে না এজন্যে যে এখানকার অধিবাসীদের মাঝেই রয়েছে চোর, যারা সুযোগ পাওয়ামাত্র ডিম চুরি করতে কোনোরকম দ্বিধাবোধ করে না।

কিছু রুকারিতে কেবল পেঙ্গুইন আর অ্যালবাট্রস বাস করলেও, বেশির ভাগেই বাস করে বিভিন্ন প্রজাতির মহাসাগরীয় পাখি, যারা ভোগ করে নাগরিকত্বের যাবতীয় সুবিধে। ফাঁক পেলে সেখানেই বাসা বেঁধে বাস করে তারা বিক্ষিপ্তভাবে, কখনোই বড় প্রজাতির পাখিদের কোনো বিষয়ে নাক গলায় না। দূর থেকে এই উপনিবেশ দেখলে অপূর্ব মুগ্ধতায় যে কেউ আচ্ছন্ন হতে বাধ্য। উপনিবেশের মাথার দিকটা একদম ছেয়ে আছে অসংখ্য অ্যালবাট্রসে, অনবরত উড়ছে তারা, হয় যাচ্ছে সাগরে নয়ত সাগর থেকে ফিরছে বাসায়। একই সঙ্গে রুকারির সরু পথ ধরে হয় পায়চারি করছে পেঙ্গুইনের দল নয়ত কুচকাওয়াজ করছে সেনাদের মতো। মোট কথা, দেখতে দেখতে নিজেদের আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে।

আমরা ক্রিসমাস বন্দরে পৌঁছার পরদিন সকালেই নৌকা নিয়ে সিল শিকারে বেরিয়ে পড়ল চিফ মেট মি. প্যাটারসন। ক্যাপটেন আর তার এক তরুণ আত্মীয় রয়ে গেল দ্বীপের ভেতরে কী যেন একটা কাজ সারবার জন্যে, যার ধরন আমি ঠিক জানি না। ক্যাপটেন গাই রওনা দিল একটা বোতল নিয়ে, যেটার ভেতরে ছিল সিলমোহর করা একটা চিঠি। হয়ত চিঠিটা সে কোথাও রেখে দেবে জেন গাইয়ের পরে আসা কোনো জাহাজের তুলে নেওয়ার অপেক্ষায়। ক্যাপটেন চোখের আড়ালে চলে যেতেই, পিটার্স আর আমি বেরিয়ে পড়লাম সিলের সন্ধানে। এই কাজে আমরা ব্যস্ত রইলাম প্রায়

তিন সপ্তাহ, কেবল কারগুয়েলেন ল্যান্ডই নয়, চষে ফেললাম আশপাশের বেশ কয়েকটা ছোট ছোট দ্বীপ। তবে আমাদের এই শ্রম তেমন একটা সফল হলো না। লোমশ সিল চোখে পড়ল অনেক, কিন্তু সেগুলো এতই লাজুক যে আমাদের দেখামাত্র গা ঢাকা দিল, তাই প্রচুর কষ্টের পর সবসুদ্ধ আমরা পেলাম মাত্র তিনশো পঞ্চাশটা চামড়া। অসংখ্য হাতি সিলের দেখা পেলাম, বিশেষ করে মূল ভূখণ্ডের পশ্চিম উপকূলে, কিন্তু মারতে পারলাম মাত্র বিশটা, সে-ও গলদঘর্ম হবার পর। এগারো তারিখে স্কুনারে ফিরতে, ক্যাপটেন গাই আর তার ভাতিজা অভিযোগের ভঙ্গিতে বলল, এটা পৃথিবীর অন্যতম এক নিরানন্দ আর ঊষর দেশ। সেকেন্ড মেট একটা ভুল বুঝে, স্কুনার থেকে জলি-বোট না পাঠানোয় দ্বীপে তাদের কাটাতে হয়েছে দুই রাত।

অধ্যায় ১৫

বারো তারিখে ক্রিসমাস বন্দর ছেড়ে, পশ্চিমে এগোতে এগোতে, পেরিয়ে গেলাম আমরা ম্যারিয়ন দ্বীপ, এটা ক্রোজেট দ্বীপপুঞ্জের একটা দ্বীপ। তারপর পেরোলাম আমরা বামপাশের প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপ ; তারপর উত্তরে ঘুরে, পনেরো দিনে পৌঁছলাম ত্রিস্তান দ্য কানহা দ্বীপে, অক্ষাংশ ৩৭°৮ দক্ষিণ আর দ্রাঘিমাংশ ১২°৮ পশ্চিমে।

এটা আসলে একটা দ্বীপপুঞ্জ, বর্তমানে সুপরিচিত, আর তিনটে গোলাকার দ্বীপ নিয়ে গঠিত। এটা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করে পর্তুগিজরা, তারপর ১৬৪৩ সালে ওলন্দাজরা, আর ১৭৬৭ সালে ফরাসিরা। দ্বীপ তিনটে একটা ত্রিভুজের সৃষ্টি করেছে, একটা থেকে আরেকটার দূরত্ব প্রায় দশ মাইল, প্রত্যেকটার মাঝে রয়েছে সুন্দর, খোলা যাতায়াতের পথ। তিনটে দ্বীপই বেশ উঁচু, বিশেষ করে ত্রিস্তান দ্য কানহা। এটাই সবচেয়ে বড় দ্বীপ, পরিধি পনেরো মাইল, আর এতটাই উঁচু যে পরিষ্কার আবহাওয়ায় আশি এমনকি নব্বই মাইল দূর থেকে দেখা যায়। দ্বীপটার উত্তর পাশ সাগর থেকে খাড়া উঠে গেছে এক হাজার ফুটেরও ওপরে। এই উচ্চতা থেকে একটা সমমালভূমি দ্বীপের প্রায় কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত, আর এই সমমালভূমি থেকে আবার উঠে গেছে বিশাল এক মোচাকার উচ্চতা। মোচাকার এই উচ্চতার নিচের অর্ধাংশ গাছপালায় ঢাকা, কিন্তু ওপরের অংশটা সম্পূর্ণ পাথুরে, যা বছরের বেশির ভাগ সময়ই থাকে মেঘের আড়ালে, আর বরফে মোড়া। মগ্ন চড়া বা অন্যান্য বিপদ এই দ্বীপে নেই, সৈকত অত্যন্ত শক্ত, পানি গভীর। উত্তর-পশ্চিম উপকূলে রয়েছে একটা উপসাগর, সৈকতে ছড়ানো কালো বালি, দখিনা বাতাস বইলে নৌকায় এসে সহজেই সেখানে নামা যায়। এখানে হাতের কাছেই রয়েছে প্রচুর মিঠে পানি ; আর ছিপ-বড়শি দিয়ে ধরা যায় কড এবং অন্যান্য মাছ।

আকারে দ্বিতীয় আর সবচেয়ে পশ্চিমে ইনঅ্যাকসেসেবল দ্বীপ। এটার নিখুঁত অবস্থান অক্ষাংশ ৩৭°১৭ দক্ষিণ আর দ্রাঘিমাংশ ১২°২৪ পশ্চিমে। এই দ্বীপের পরিধি সাত বা আট মাইল, আর চারপাশ উঁচু, খাড়া পাহাড়ে এমনভাবে ঘেরা, যেন নিষিদ্ধ কোনো অঞ্চল। মাথাটা নিখুঁত সমতল, আর পুরো দ্বীপটাই নিষ্ফলা, বাড়-ব্যাহত কয়েকটা ঝোপ ছাড়া এখানে আর কিছু নেই।

সবচেয়ে ছোট আর সবচেয়ে দক্ষিণে নাইটিঙ্গেল দ্বীপ, অক্ষাংশ ৩৭°২৬ দক্ষিণ আর দ্রাঘিমাংশ ১২°১২ পশ্চিমে। এটার সবচেয়ে দক্ষিণে রয়েছে পাথুরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে গঠিত উঁচু একটা শৈলশিরা ; উত্তর-পুবেও এই একই দৃশ্য। মাটি অসমতল আর নিষ্ফলা, গভীর একটা উপত্যকা দ্বীপটাকে আংশিক বিচ্ছিন্ন করেছে।

উপযুক্ত ঋতুতে এই দ্বীপগুলোর সৈকত সিংহ সিল (Sea lion), হাতি সিল, চুলঅলা আর লোমশ সিল এবং বিভিন্ন প্রজাতির মহাসাগরীয় পাখিতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। আশপাশে তিমিও রয়েছে প্রচুর। আগে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীগুলো এই দ্বীপপুঞ্জে সহজে পাবার জন্যে, পরে অনেকেই এসেছে এখানে। অনেক আগে এখানে মাঝেসাঝেই এসেছে ওলন্দাজ আর ফরাসিরা। ১৭৯০ সালে ফিলাডেলফিয়ার 'ইন্ডাস্ট্রি' নামক জাহাজের ক্যাপটেন প্যাটেন ত্রিস্তান দ্য কানহাতে এসে সাত মাস থেকেছে (১৭৯০ সালের অগাস্ট থেকে ১৭৯১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত) সিলের চামড়া সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। এই সময়ে সে সংগ্রহ করেছে পাঁচ হাজার ছয়শো চামড়া, আর বলেছে যে ইচ্ছে করলে বড় একটা জাহাজ সে তেলে ভরিয়ে দিতে পারে মাত্র তিন সপ্তাহে। সামান্য কয়েকটা বুনো ছাগল ছাড়া এখানে সে কোনো চারপেয়ে জন্তু দেখেনি – কিন্তু পরবর্তীতে আসা নাবিকেরা দ্বীপপুঞ্জে চারপেয়ে জন্তু ছেড়ে যাওয়ায় এখন এখানে আমরা পাই আমাদের সমস্ত অতি প্রয়োজনীয় গৃহপালিত জন্তু।

ক্যাপটেন প্যাটেনের কিছুদিন পরেই, বিশ্রাম নিতে সবচেয়ে বড় দ্বীপটাতে এসেছিল আমেরিকান 'বেটসি' জাহাজের ক্যাপটেন কলকুহুন। সে এখানে চাষ করেছিল পেঁয়াজ, আলু, বাঁধাকপি এবং আরও নানা জাতের সবজি, যেগুলো এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এখন।

১৮১১ সালে ত্রিস্তানে এসেছিল 'নিরেউস' জাহাজের ক্যাপটেন হেউড। সে দ্বীপটাতে দেখেছিল তিনজন আমেরিকান, যারা সিলের চামড়া আর তেলের ব্যবসায় ব্যস্ত। তাদের একজনের নাম ছিল জোনাথান ল্যামবার্ট,

আর নিজেকে সে ঘোষণা করেছিল সেই দ্বীপের রাজা বলে। প্রায় ষাট একর জমিতে সে করেছিল কফি আর আখের চাষ, আর এই ব্যাপারে তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়েছিল রিও জেনিরোর আমেরিকান মন্ত্রী। উপনিবেশটা অবশ্য শেষমেশ পরিত্যক্ত হয়, আর ১৮১৭ সালে কেপ অব গুড হোপ থেকে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দ্বীপপুঞ্জটা দখল করে নেয় ব্রিটিশ সরকার। সেনাবাহিনী অবশ্য সেখানে বেশি দিন থাকেনি কিন্তু ব্রিটিশ অধিকার অপসারিত হবার পর সরকারের দুই-তিনটে ইংরেজ পরিবার দ্বীপে এসে বসবাস করতে থাকে স্বাধীনভাবে। ১৮২৪ সালের পঁচিশ মার্চ 'বারউইক' জাহাজের ক্যাপটেন জেফরি লন্ডন থেকে রওনা দিয়ে, ভ্যান ডিয়েমেন ল্যান্ড হয়ে, সেখানে এসে দেখতে পায় গ্লাস নামের এক ইংরেজকে, যে একসময় ছিল ব্রিটিশ গোলন্দাজবাহিনীর একজন কর্পোরাল। সে নিজেকে দ্বীপপুঞ্জের সর্বোচ্চ শাসক বলে দাবি করে, যার অধীনে রয়েছে একুশজন পুরুষ আর তিনজন নারী। সে বিবরণ দেয় যে এখানকার আবহাওয়া যেমন স্বাস্থ্যকর মাটিও তেমনই উর্বরা। এখানকার অধিবাসীরা কেপ অব গুড হোপে সিলের চামড়া আর হাতি সিলের তেলের ব্যবসা করে, আর গ্লাসের আছে ছোট একটা স্কুনার। আমরা যখন দ্বীপপুঞ্জটাতে গেলাম, গ্লাস তখনো বাস করছে সেখানে, কিন্তু ত্রিস্তানে তার গোষ্ঠী ততদিনে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছাপ্পান্নজনে, পাশাপাশি সাতজনের ছোট একটা উপনিবেশ গড়ে উঠেছে নাইটিঙ্গেল দ্বীপে। সেখানে সহজেই পেলাম আমরা প্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিস — ভেড়া, শুয়োর, গরু, খরগোশ, হাঁস-মুরগি, ছাগল, নানা জাতের মাছ, আর প্রচুর শাকসবজি। ত্রিস্তানে নোঙর ফেলে জিনিসগুলো জাহাজে তুলে নিলাম আমরা। গ্লাসের কাছ থেকে ক্যাপটেন গাই কিনল পাঁচশো সিলের চামড়া আর কিছু হাতির দাঁত। আমরা এখানে থাকলাম এক সপ্তাহ, সেইসময় বাতাস বইল উত্তর আর পশ্চিম থেকে, আবহাওয়া কিছুটা ঝাপসা। পাঁচ নভেম্বর আমরা রওনা দিলাম দক্ষিণে আর পশ্চিমে, অরোরা নামক এক দ্বীপপুঞ্জ তন্নতন্ন করে খোঁজার উদ্দেশ্যে, যে দ্বীপপুঞ্জের অস্তিত্ব নিয়ে আছে অনেক মতভেদ।

কথিত আছে যে সেই ১৭৬২ সালেই দ্বীপপুঞ্জটা আবিষ্কার করেছে 'অরোরা' জাহাজের কমান্ডার। রয়াল ফিলিপিন কোম্পানির 'প্রিন্সেস' জাহাজের ক্যাপটেন ম্যানুয়েল দ্য ওইয়ারভিদোর দাবি, ১৭৯০ সালে সে সোজা গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল ওই দ্বীপপুঞ্জে। ওটার নিখুঁত অবস্থান নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ১৭৯৪ সালে রওনা দিয়েছিল স্প্যানিশ কর্ভেট (একজাতীয়

রণতরী) আত্রেভিদা। ১৮০৯ সালে মাদ্রিদের রয়াল হাইড্রোগ্রাফিকাল সোসাইটি এই অভিযান সম্বন্ধে লিখেছে: 'জানুয়ারির একুশ থেকে সাতাশ তারিখ পর্যন্ত দ্বীপপুঞ্জের আশপাশে সবরকমের প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ চালিয়েছে কর্ভেট আত্রেভিদা, ক্রনোমিটার দিয়ে পরিমাপ করেছে এই দ্বীপপুঞ্জ আর মালনিনাসের সোলেদাদ বন্দরের দ্রাঘিমাংশের পার্থক্য। দ্বীপ সবসুদ্ধ তিনটে ; মাঝের দ্বীপটা বেশ নিচু ; অন্য দ্বীপ দুটোর মাঝখানের দূরত্ব নয় লিগ।

১৮২০ সালের সাতাশ জানুয়ারি স্টেটেন ল্যান্ড থেকে অরোরার সন্ধানে যাত্রা করেছিল ব্রিটিশ নৌবাহিনীর ক্যাপটেন জেমস ওয়েডেল। সে কেবল আত্রেভিদার কমান্ডারের নির্দেশিত পথেই নয়, খুঁজে দেখেছিল আশপাশের সমস্ত অঞ্চল, কিন্তু অরোরা দ্বীপপুঞ্জের কোনো সন্ধান পায়নি। পরস্পরবিরোধী বিবৃতির কারণে কৌতূহলী হয়ে পরে আরও অনেক নাবিক এসেছে অরোরার সন্ধানে ; কিন্তু ভারি আশ্চর্য ব্যাপার হলো, তাদের কেউ কেউ বলেছে, সম্ভাব্য অঞ্চলের প্রতিটা ইঞ্চি খুঁজেও তারা ওটার দেখা পায়নি, আবার কেউ কেউ বলেছে যে সহজেই ওটার দেখা পেয়েছে। যারা দ্বীপপুঞ্জটাকে দেখেছে বলে দাবি করেছে তাদের মাঝে রয়েছে ১৭৬৯ সালে 'সান মিগুয়েল' জাহাজ ; ১৭৭৪ সালে 'অরোরা' জাহাজ ; ১৭৭৯ সালে 'পার্ল' জাহাজ ; আর ১৭৯০ সালে 'ডলোরেস' জাহাজ। তাই ক্যাপটেন গাইয়ের ইচ্ছে, অমীমাংসিত এই রহস্যের সমাধানে সে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।

আবার দক্ষিণ আর পশ্চিমে যাত্রা করে, মাসের বিশ তারিখে আমরা পৌঁছলাম অক্ষাংশ ৫৩°১৫ দক্ষিণ আর দ্রাঘিমাংশ ৪৭°৫৮ পশ্চিমের সেই বিতর্কিত স্থানে, কিন্তু কোনো দ্বীপের চিহ্ন চোখে পড়ল না। পরিষ্কার আবহাওয়ায় আরও তিন সপ্তাহ খোঁজার পর আমরা নিশ্চিত হলাম, আগে যদি এখানে কোনো দ্বীপ থেকেও থাকে, এখন তার আর অস্তিত্ব নেই। বাড়ি ফেরার পর জেনেছি, ১৮২২ সালে সতর্ক অনুসন্ধান চালিয়েছিল আমেরিকান 'হেনরি' স্কুনারের ক্যাপটেন জনসন, আর আমেরিকান 'ওয়াস্প' স্কুনারের ক্যাপটেন মোরেল – উভয়ের ক্ষেত্রেই ফলাফল হয়েছিল আমাদের মতো।

অধ্যায় ১৬

ক্যাপটেন গাইয়ের আসল ইচ্ছে ছিল, অরোরা দ্বীপপুঞ্জের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবার পর, এগিয়ে যাবে সে ম্যাগেলান প্রণালি হয়ে, প্যাটাগোনিয়ার পশ্চিম উপকূল বরাবর ; কিন্তু ত্রিস্তান দ্য কানহাতে তথ্য পেয়ে তার দক্ষিণে যাবার ইচ্ছে জাগল এই আশায় যে অক্ষাংশ ৬০° দক্ষিণ আর দ্রাঘিমাংশ ৪১°২০ পশ্চিমের সমাক্ষরেখায় সে আবিষ্কার করে ফেলতে পারে কথিত ছোট ছোট কিছু দ্বীপ। যদি দ্বীপগুলো আবিষ্কার করা না যায়, সেক্ষেত্রে আবহাওয়া অনুকূল থাকলে, এগিয়ে যাবে সে দক্ষিণ মেরুর দিকে। সুতরাং আবার আমরা যাত্রা করলাম ডিসেম্বরের বারো তারিখে। আঠারো তারিখে পৌঁছলাম গ্লাসের উল্লেখিত সেই অঞ্চলে, কিন্তু তিন দিন আশপাশে চষে ফেলেও কোনো দ্বীপের সন্ধান মিলল না। একুশ তারিখে, আবহাওয়া অস্বাভাবিক রকমের ভালো হওয়ায়, যতদূর সম্ভব এগোবার সংকল্প নিয়ে, যাত্রা করলাম আমরা দক্ষিণে। আমার বিবরণের এই অংশটা শুরু করার আগে, পাঠকগণের যাঁরা এই অঞ্চলের আবিষ্কারের তেমন সংবাদ রাখেন না, তাঁদের জন্যে মনে হয়, এ যাবৎ দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছার যে গুটিকয় চেষ্টা হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলে ভালো হবে।

অভিযাত্রী হিসেবে আমরা সর্বপ্রথম পাই ক্যাপটেন কুকের বিবরণ। ১৭৭২ সালে সে দক্ষিণে যাত্রা করে 'রেজলিউশন' জাহাজে, আর 'অ্যাডভেঞ্চার' জাহাজে করে তাকে সঙ্গ দেয় লেফটেন্যান্ট ফারনু। ডিসেম্বরে কুক যায় দক্ষিণ অক্ষাংশের আটান্ন ডিগ্রি সমাক্ষরেখা আর দ্রাঘিমাংশ ২৬°৫৭ পুবে। এখানে সে দেখতে পায় উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পুবে বিস্তৃত, আট থেকে দশ ইঞ্চি মতো পুরু, সরু বরফের দেয়াল। বরফখণ্ডগুলো বড় বড়, আর এমন ঠাসানো যে তার ভেতর দিয়ে পথ করে জাহাজকে এগোতে হলো অতি কষ্টে। এইসময় অসংখ্য পাখির ওড়াউড়ি

আর অন্যান্য চিহ্ন দেখে ক্যাপটেন কুক ভাবল, আশপাশেই আছে ডাঙা। প্রচণ্ড ঠান্ডা আবহাওয়ায় দক্ষিণে এগোতে এগোতে পৌছল সে চৌষট্টি ডিগ্রি সমাক্ষরেখা আর দ্রাঘিমাংশ ৩৮°১৪ পুবে। এখানে পাঁচ দিন ধরে পেল সে ভালো আবহাওয়া, সঙ্গে ঝিরঝিরে বাতাস, থার্মোমিটার ছত্রিশে। ১৭৭৩ সালের জানুয়ারিতে জাহাজ পেরিয়ে গেল সুমেরুবৃত্ত, কিন্তু আর এগোতে পারল না ; কারণ, অক্ষাংশ ৬৭°১৫-এ পৌছার পর, যতদূর চোখ যায় দক্ষিণ দিগন্ত বরাবর বাধা হয়ে দাঁড়াল প্রকাণ্ড এক বরফের দেয়াল। কোনো কোনো জায়গায় সে দেয়াল উঠে গেছে পানির আঠারো বা বিশ ফুট ওপরে। এই বাধা পেরোবার কোনো উপায় নেই দেখে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্যাপটেন কুক উত্তরে ঘুরল।

পরবর্তী নভেম্বরে আবার শুরু হলো তার অভিযান। অক্ষাংশ ৫৯°৪০-এ সে পেল দক্ষিণগামী এক শক্তিশালী স্রোত। ডিসেম্বরে জাহাজ অক্ষাংশ ৬৭°৩১ আর দ্রাঘিমাংশ ১৪২°৫৪ পশ্চিমে যেতে, ঠান্ডা খুব বেড়ে গেল, সঙ্গে তীব্র ঝোড়ো বাতাস আর কুয়াশা। এখানেও প্রচুর পাখি, বিশেষ করে অ্যালবাট্রস, পেঙ্গুইন, আর পেট্রেল। অক্ষাংশ ৭০°২৩-এ সে মুখোমুখি হলো বড় কয়েকটা বরফ দ্বীপের, তারপরেই দক্ষিণে ভেসে যাওয়া মেঘগুলোর রং তুষারের মতো সাদা দেখে বুঝতে পারল, আশপাশেই রয়েছে বরফ প্রান্তর। অক্ষাংশ ৭১°১০ আর দ্রাঘিমাংশ ১০৬°৫৪ পশ্চিমে, আগের মতোই থেমে গেল নাবিকেরা, কারণ, আবারও পথরোধ করে দাঁড়াল দক্ষিণ দিগন্ত জুড়ে প্রকাণ্ড এক বরফের বিস্তার। এই বিস্তার দক্ষিণে এগিয়েছে প্রায় একমাইল, আর তার উত্তর প্রান্ত এমনই অসমান আর ভাঙা ভাঙা যে পেরিয়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। বিস্তারটার ওপারের পৃষ্ঠ অপেক্ষাকৃত মসৃণ, কিন্তু খানিক পরই শুরু হয়েছে বরফের পাহাড়শ্রেণী, একটার ওপরে মাথা তুলে আছে আরেকটা। ক্যাপটেন কুক সিদ্ধান্ত টানল যে দিগন্ত বিস্তৃত এই বরফ গিয়ে ঠেকেছে দক্ষিণ মেরুতে কিংবা যুক্ত হয়েছে কোনো মহাদেশের সঙ্গে। মি. জে. এন. রেনল্ডস, যার প্রয়াস আর অধ্যবসায়ের ফলে মেরু অঞ্চল আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল একটা জাতীয় অভিযান, রেজলিউশনের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বলেছে: 'আমরা মোটেই অবাক হইনি ক্যাপটেন কুক ৭১°১০-এর ওপারে যেতে পারেননি বলে, বরং অবাক হয়েছি তিনি ওই পর্যন্ত যেতে পেরেছেন বলে। পামার্স ল্যান্ড রয়েছে শেটল্যান্ডের দক্ষিণে, অক্ষাংশ চৌষট্টি ডিগ্রিতে, আর সম্ভবত বিস্তৃত হয়েছে আরও দক্ষিণে আর পশ্চিমে, যেখানে আজ পর্যন্ত কোনো নাবিক যেতে

পারেনি। কুক সেই দিকেই যাচ্ছিলেন যখন বরফ তাঁর অগ্রগতিকে থামিয়ে দেয় ; আর ছয় জানুয়ারি, মানে, তাঁর মতো যে-ই এভাবে বছরের শুরুতে সেখানে যাক তার ক্ষেত্রেই এই বিপর্যয় নেমে আসতে বাধ্য – আর তিনি যে পাহাড়শ্রেণীর বর্ণনা দিয়েছেন সেগুলো পামার্স ল্যান্ডের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকলে আমাদের অবাক হবার কিছুই নেই।'

১৮০৩ সালে রাশিয়ার আলেকসান্দর জলপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পাঠাল ক্যাপটেন ক্রুয়েতজেনস্তার্ন আর ক্যাপটেন লিসিঅস্কিকে। দক্ষিণে এগোবার চেষ্টা করল দুই ক্যাপটেন, কিন্তু দ্রাঘিমাংশ ৭০°১৫ পশ্চিমের বেশি যেতে পারল না। পুবদিকে ধেয়ে যাওয়া তীব্র স্রোতের মুখোমুখি হলো তারা ; দেখতে পেল অনেক তিমি কিন্তু কোনো বরফ নয়। এই অভিযান সম্বন্ধে মি. রেনল্ডস মন্তব্য করেছে যে মার্চে গিয়েছিলেন ক্রুয়েতজেনস্তার্ন, আরও আগে গেলে অবশ্যই তিনি বরফ দেখতে পেতেন। দক্ষিণ থেকে পশ্চিমে বহমান বাতাস আর স্রোত মিলে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ঠান্ডা ওই অঞ্চলের ভাসমান তুষারস্তর, যে অঞ্চলের উত্তরে রয়েছে জর্জিয়া, পুবে স্যান্ডউইচ ল্যান্ড আর দক্ষিণ ওর্কনি দ্বীপপুঞ্জ, আর পশ্চিমে দক্ষিণ শেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ।

১৮২২ সালে সে যাবৎ যে কোনো নাবিকের চেয়ে বেশি দক্ষিণে গিয়েছিল ব্রিটিশ নৌবাহিনীর ক্যাপটেন জেমস ওয়েডেল, আর দুটো ছোট ছোট জাহাজ নিয়ে গেলেও তাকে বড়সড় কোনো বিপদের মুখোমুখি হতে হয়নি। সে বলেছে, মাঝেসাঝে চারপাশে বরফ ঘিরে এলেও বাহাত্তর ডিগ্রি সমাক্ষরেখায় পৌঁছার পর সে কোনো বরফ দেখতে পায়নি, আর অক্ষাংশ ৭৪°১৫-এ যেতে তার চোখে পড়েছে কেবল বরফের তিনটে দ্বীপ, কোনো বরফ প্রান্তর নয়। আশ্চর্য ব্যাপার হলো, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, ডাঙার স্বাভাবিক সব চিহ্ন, আর শেটল্যান্ড দ্বীপের দক্ষিণ পাশ দেখে, এমনকি মাস্তুলের মাথা থেকে দক্ষিণে অজানা উপকূল চোখে পড়া সত্ত্বেও, দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে স্থলভাগের অস্তিত্বের ধারণাকে ওয়েডেল নিরৎসাহিত করেছে।

১৮২৩ সালের ১১ জানুয়ারি আমেরিকান স্কুনার 'ওয়াস্প'-এর ক্যাপটেন বেঞ্জামিন মোরেল কারগুয়েলেন ল্যান্ড থেকে যাত্রা করেছিল যথাসম্ভব দক্ষিণে যাবার উদ্দেশ্যে। পহেলা ফেব্রুয়ারি পৌঁছেছিল সে অক্ষাংশ ৬৪°৫২ দক্ষিণ আর দ্রাঘিমাংশ ১১৮°২৭ পুবে। ওই তারিখে তার জার্নালে সে লিখেছে: 'শিগগিরই বাতাসের গতি উঠে এল এগারো নটে, আর সেই সুযোগে আমরা রওনা দিলাম পশ্চিমে ; নিশ্চিত হয়েছিলাম যে অক্ষাংশ চৌষট্টি ডিগ্রি পেরিয়ে যতই আমরা দক্ষিণে যাব, ততই কমে যাবে বরফের

আশঙ্কা। সামান্য দক্ষিণে ঘুরে পেরিয়ে গেলাম আমরা সুমেরুবৃত্ত, আর পৌঁছলাম অক্ষাংশ ৬৯°১৫ পুবে। এই অক্ষাংশে কোনো বরফ প্রান্তর নেই, চোখে পড়ল মাত্র কয়েকটা বরফ দ্বীপ।'

আমি দেখেছি, চৌদ্দ মার্চের জার্নালে মোরেল লিখেছে: 'সাগর এখন বরফ প্রান্তর থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, গোটা বারোর চেয়ে বেশি বরফ দ্বীপও চোখে পড়ল না। বাতাস আর পানির তাপমাত্রাও তেরো ডিগ্রি বেড়ে গেছে (অনেক শান্ত), যেমনটা ষাট আর বাষট্টি সমাক্ষরেখার মাঝে আর কখনোই পাইনি আমরা। এখন আমরা অবস্থান করছি অক্ষাংশ ৭০°১৪ দক্ষিণে, বাতাসের তাপমাত্রা সাতচল্লিশ, আর পানির চুয়াল্লিশ।... সুমেরুবৃত্তের মধ্যরেখার অনেক জায়গা অতিক্রম করার সময় বরাবরই দেখেছি, দক্ষিণ অক্ষাংশের পঁয়ষট্টি ডিগ্রি পেরিয়ে যতই এগিয়েছি, ক্রমেই শান্ত হয়ে এসেছে বাতাস আর পানির তাপমাত্রা। অথচ এই অক্ষাংশের উত্তরে, ষাট আর পঁয়ষট্টি দক্ষিণের মাঝে, জাহাজ চালাতে আমাদের প্রায় বেশ অসুবিধেয় পড়তে হয়েছে, কারণ, সেখানে রয়েছে অসংখ্য বরফ দ্বীপ, যার কোনো কোনোটার পরিধি এক থেকে দুই মাইল, আর উচ্চতা পানির স্তরের পাঁচশো ফুটেরও বেশি।'

এই সময় জ্বালানি আর পানির অভাব দেখা দেওয়ায়, আর সঙ্গে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি না থাকায়, সামনে খোলা সাগর পেয়েও, আরও পশ্চিমে যাবার চেষ্টা বাদ দিয়ে, ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল ক্যাপটেন মোরেল। সে মন্তব্য করেছিল যে পরিস্থিতি তাকে ফিরতে বাধ্য না করলে, একদম মেরু না হলেও, সে অন্তত পঁচাশি সমাক্ষরেখা পর্যন্ত এগিয়ে যেত। ক্যাপটেনের বিবরণ আমি একটু বিস্তারিত দিলাম এজন্যে, যেন পাঠক মিলিয়ে নেওয়ার সুযোগ পান তার ধারণাগুলো আমার পরবর্তী অভিজ্ঞতাকে কতটা সমর্থন করে।

১৮৩১ সালে লন্ডনের তিমি শিকারি জাহাজের মালিক মঁসিয়ে এন্ডারবির কর্মচারী ক্যাপটেন ব্রিসকো দক্ষিণ সাগরে যাত্রা করেছিল 'লাইভলি' জাহাজ নিয়ে, তার সঙ্গে ছিল 'টুলা' নামের এক কাটার জাহাজ। আটাশ ফেব্রুয়ারি অক্ষাংশ ৬৬°৩০ দক্ষিণ আর দ্রাঘিমাংশ ৪৭°১৩ পুবে পৌঁছে, সে দেখতে পেয়েছিল ডাঙা, বরফের মাঝে পরিষ্কারভাবে আবিষ্কার করেছিল একটা পর্বতমালা যেগুলোর কালো চূড়া চলে গেছে পুব আর দক্ষিণ-পুবে। পরবর্তী পুরো মাসটাই সে কাটিয়েছিল জায়গাটার আশপাশে, কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্যে উপকূলের দশ লিগের চেয়ে কাছে আর যেতে পারেনি। সেই ঋতুতে আর কোনোরকম আবিষ্কার সম্ভব নয় দেখে, শীতে ফিরে এসেছিল সে উত্তরের ভ্যান ডিয়েমেন ল্যান্ডে।

১৮৩২ সালের শুরুতে আবার যাত্রা করেছিল সে দক্ষিণে, আর ফেব্রুয়ারির চার তারিখে দক্ষিণ-পুবে ডাঙা দেখতে পেয়েছিল অক্ষাংশ ৬৭°১৫ আর দ্রাঘিমাংশ ৬৯°২৯ পশ্চিমে। এটা তার প্রথম আবিষ্কার করা অন্তরীপের কাছের একটা দ্বীপ। মাসের একুশ তারিখে সে দ্বীপটাতে পদার্পণ করতে সমর্থ হয়েছিল, আর চতুর্থ উইলিয়ামের নামে সেটা দখল করে, ইংরেজ রানির সম্মানে তার নাম রেখেছিল– এডেলেইড দ্বীপ। এসব তথ্য লন্ডনের রয়াল জিয়োগ্রাফিকাল সোসাইটিকে জানানোর পর তারা সিদ্ধান্ত দিয়েছিল '৪৭°৩০ পুব থেকে দ্রাঘিমাংশ ৬৯°২৯ পশ্চিম, অর্থাৎ, দক্ষিণ অক্ষাংশের ছেষট্টি থেকে সাতষট্টি সমাক্ষরেখা বরাবর অবশ্যই একটা ভূখণ্ড বিস্তৃত আছে।' এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মি. রেনল্ডস মন্তব্য করেছে, 'এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরা কোনোভাবেই একমত হতে পারি না ; ব্রিসকোর আবিষ্কারও এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে না। এই বিশেষ সীমার ভেতরেই জর্জিয়া, স্যান্ডউইচ ল্যান্ড, দক্ষিণ ওর্কনি দ্বীপপুঞ্জ, আর শেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের পুবের একটা মধ্যরেখার ওপর দিয়ে ওয়েডেল অগ্রসর হয়েছিলেন দক্ষিণে।' আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা সোসাইটির সিদ্ধান্তকে সরাসরি ভুল প্রমাণিত করবে।

এগুলোই দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের প্রধান কয়েকটা অভিযান। তাহলে দেখা যাচ্ছে, জেন গাইয়ের অভিযানের আগে সুমেরুবৃত্তের প্রায় তিনশো ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশ কেউ অতিক্রম করেনি। আমাদের সামনে পড়ে আছে অনাবিষ্কৃত এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড, তাই ক্যাপটেন গাই যখন বলল যে সাহসিকতার সঙ্গে সে দক্ষিণে এগিয়ে যাবার ব্যাপারে স্থিরসঙ্কল্প, আনন্দে নেচে উঠল আমার মনটা।

অধ্যায় ১৭

গ্লাসের দ্বীপের অনুসন্ধান ত্যাগ করে, চার দিন ধরে আমরা এগিয়ে চললাম দক্ষিণে, কোনো বরফই চোখে পড়ল না। ছাব্বিশ তারিখ দুপুরে আমরা পৌঁছলাম অক্ষাংশ ৬৩°২৩ দক্ষিণ আর দ্রাঘিমাংশ ৪১°২৫ পশ্চিমে। এবার চোখে পড়ল বড় বড় কয়েকটা বরফ দ্বীপ, আর ভাসমান একটা তুষারস্তর, যেটা খুব বড় নয়। বাতাস সাধারণত বইছে দক্ষিণ-পূর্ব বা উত্তর-পূর্ব থেকে, কিন্তু খুবই ধীরে। হঠাৎ কখনো যখন বাতাস এল পশ্চিম থেকে, তার সঙ্গে এল বৃষ্টি। প্রত্যেকদিন কমবেশি বরফের দেখা মিলল। সাতাশ তারিখে থার্মোমিটার দাঁড়াল পঁয়ত্রিশে।

জানুয়ারি ১, ১৮২৮. আজ আমাদের চারপাশ ঘিরে ধরল বরফ, ফলে আর কতটা এগোতে পারব তা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। দুপুরের আগ পর্যন্ত বয়ে চলল একটা ঝড়, বরফের বড় বড় খণ্ড ভেসে এসে জোর ধাক্কা খেতে লাগল হালের সঙ্গে, পরিণতি রীতি মতো ভাবিয়ে তুলল আমাদের। সন্ধের দিকেও ঝড় বয়ে চলল বেগে, সামনের বরফের চাঙর ভেঙে গেল অনেকটা, তাই ছোট ছোট বরফের ফাঁক দিয়ে আমরা যেতে পারলাম ওপারের খোলা পানিতে।

জানুয়ারি ২. আবহাওয়া এখন অসহনীয়। দুপুর নাগাদ কুমেরুবৃত্ত পেরিয়ে, পৌঁছলাম আমরা অক্ষাংশ ৬৯°১০ দক্ষিণ আর দ্রাঘিমাংশ ৪২°২০ পশ্চিমে। পেছনে বরফের বড় বড় স্তর থাকলেও, দক্ষিণে চোখে পড়ল খুব কমই। আজ গভীরতা মাপার জন্যে আমরা জাহাজে লাগালাম বিশ গ্যালন পানি ধরে এরকম বড় একটা লোহার পাত্র, আর দুইশো ফ্যাদমের একটা দড়ি। ঘণ্টায় সিকি মাইল গতিতে স্রোত ছুটে চলেছে উত্তরে। বাতাসের তাপমাত্রা এখন প্রায় তেত্রিশ।

জানুয়ারি ৫. বড় কোনো বাধা ছাড়াই এখনো আমরা এগিয়ে চলেছি দক্ষিণে। আজ সকালে অক্ষাংশ ৭৩°১৫ পুব আর দ্রাঘিমাংশ ৪২°১০ পশ্চিমে আসার পর, আবার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল শক্ত বরফের এক বিশাল বিস্তার। দক্ষিণে অবশ্য খোলা পানি চোখে পড়ছে, আমরা সেখানে পৌঁছতেও পারব। তুষারস্তরের পাশ দিয়ে এগিয়ে, মাইলখানেক চওড়া একটা পথ পেলাম আমরা, আর সেটা দিয়েই এগোলাম সূর্যাস্ত পর্যন্ত। সাগর এখন প্রায় ঢেকে গেছে বরফ দ্বীপে, কিন্তু কোনো বরফ প্রান্তর না থাকায় আমরা এগিয়ে চললাম আগের মতোই। মাঝেসাঝে তুষারঝড় হলেও ঠান্ডা বাড়েনি বলেই মনে হচ্ছে। আজ স্কুনারের ওপর দিয়ে দক্ষিণ-পুব থেকে উত্তর-পশ্চিমে উড়ে গেল অসংখ্য অ্যালবাট্রসের ঝাঁক।

জানুয়ারি ৭. সাগর এখনো খোলা থাকায়, এগিয়ে যেতে আমাদের অসুবিধে হচ্ছে না। পশ্চিমে আমরা দেখলাম প্রকাণ্ড কিছু হিমশৈল, বিকেলে স্কুনারের পাশ দিয়ে চলে গেল একটা, যার চূড়া মহাসাগরের পৃষ্ঠ থেকে চারশো ফ্যাদমের কম হবে না। গোড়ার দিকে এটার ঘের সম্ভবত পৌনে একলিগ, পাশের ফাটলগুলো থেকে ঝরনার মতো ঝরে পড়ছে পানি। হিমশৈলটাকে দুই দিন পর্যন্ত দেখতে পেলাম আমরা, তারপর ওটা হারিয়ে গেল কুয়াশায়।

জানুয়ারি ১০. আজ সকালে দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের একজন নাবিক হারিয়ে গেল সাগরে। সে ছিল একজন আমেরিকান, নাম পিটার ভ্রেডেনবার্গ, নিউ ইয়র্কের অধিবাসী, স্কুনারের অন্যতম সেরা কাজের মানুষ। পা পিছলে সে পড়ে গেল দুটো বরফখণ্ডের মাঝখানে, আর উঠতে পারল না। দুপুরে আমরা এলাম অক্ষাংশ ৭৮°৩০ আর দ্রাঘিমাংশ ৪০°১৫ পশ্চিমে। এখন প্রচণ্ড ঠান্ডা, অবিরাম তুষারঝড় বইছে উত্তর আর পুব থেকে। সেদিকে আমরা দেখতে পেলাম আরও বেশকিছু প্রকাণ্ড হিমশৈল, পুরো পুব দিগন্তটাই যেন আগলে দাঁড়িয়েছে বরফ প্রান্তরের সারি, একটার ওপরে আরেকটা। সন্ধের দিকে ভেসে গেল কিছু কাঠের গুঁড়ি, আর উড়ে গেল অনেক পাখি, যার মাঝে রয়েছে নেলি, পেট্রেল, অ্যালবাট্রস, আর উজ্জ্বল নীল পালকের বিরাট এক পাখি।

জানুয়ারি ১২. আমাদের দক্ষিণের যাত্রা আবার সন্দেহের মুখে পড়ল, মেরুর দিকে চোখে পড়ছে কেবল সীমাহীন তুষারস্তর, সেগুলোর পেছনে এবড়োখেবড়ো বরফ পাহাড়ের সারি, যেগুলোর একটার চূড়া আরেকটার

ওপর দিয়ে ভ্রুকুটি করছে। একটা পথ খুলে যাবার আশায় চৌদ্দ তারিখ পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করলাম পশ্চিমে।

জানুয়ারি ১৪. আজ সকালে আমরা গেলাম বাধা হয়ে দাঁড়ানো প্রান্তরটার পশ্চিম শেষ প্রান্ত পর্যন্ত, তারপর বাতাসের অনুকূলে জাহাজ চালিয়ে, গিয়ে পড়লাম সম্পূর্ণ বরফহীন একটা খোলা সাগরে। দুইশো ফ্যাদম গভীরতা মেপে দেখা গেল, দক্ষিণে একটা স্রোত ছুটে চলেছে ঘণ্টায় আধা মাইল গতিতে। বাতাসের তাপমাত্রা সাতচল্লিশ, আর পানির চৌত্রিশ। এবার কোনো বাধা ছাড়াই দক্ষিণে এগিয়ে ষোলো তারিখ দুপুরে আমরা পৌঁছলাম অক্ষাংশ ৮১°২১ আর দ্রাঘিমাংশ ৪২° পশ্চিমে। এখানে আবার গভীরতা মেপে পাওয়া গেল দক্ষিণমুখী স্রোত, ছুটছে ঘণ্টায় পৌনে একমাইল গতিতে। বাতাসের তাপমাত্রা এখন সুন্দর এবং সহনীয়, থার্মোমিটার উঠেছে একান্নতে। বরফের একটা কণাও চোখে পড়ল না কোথাও। জাহাজের সবাই আশাবাদী হয়ে উঠল, এবার অবশ্যই পৌঁছা যাবে মেরুতে।

জানুয়ারি ১৭. আজ অনেক ঘটনা ঘটেছে। দক্ষিণ থেকে জাহাজের ওপর দিয়ে উড়ে গেছে অসংখ্য পাখির ঝাঁক, ডেক থেকে গুলি করে ফেলাও হয়েছে বেশ কয়েকটা ; তার মধ্যে একজাতের একটা পেলিক্যানের স্বাদ ছিল চমৎকার। দুপুরের দিকে মাস্তুলের ওপর থেকে দেখা গেল কিছু বরফস্তর, যার ওপরে বসে আছে বড়সড় একটা জানোয়ার। আবহাওয়া ভালো আর প্রায় শান্ত থাকায়, দুটো নৌকা নিয়ে ওটা কোন জানোয়ার তা দেখে আসতে বলল ক্যাপটেন গাই। মেটের বড় নৌকাটাতে গেলাম ডার্ক পিটার্স আর আমি। বরফস্তরটার কাছে যেতে দেখলাম, ওটা মেরু ভালুক প্রজাতির একটা বিশাল জানোয়ার, কিন্তু সবচেয়ে বড় মেরু ভালুকের চেয়েও অনেক বড়। যথেষ্ট সশস্ত্রই ছিলাম, তাই ওটাকে আক্রমণ করলাম আমরা নির্দ্বিধায়। পরপর বেশ কয়েকটা গুলি করা হলো, যার বেশির ভাগই লাগল ওটার মাথায় আর শরীরে। জানোয়ারটা সেই গুলির কোনো তোয়াক্কাই করল না, বরফের ওপর থেকে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, হা করে সাঁতরে সোজা তেড়ে এল পিটার্স আর আমার নৌকার দিকে। অপ্রত্যাশিত এই পাল্টা আক্রমণে কেউই দ্বিতীয়বার গুলি করতে পারলাম না, ভালুকটা তার শরীরের অর্ধেক নৌকার ওপর তুলে, ধরে ফেলল একটা লোককে। ঠিক এইসময় পিটার্সের দুঃসাহস আর তৎপরতা আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করল। বিশাল জানোয়ারটার পিঠে লাফিয়ে পড়ে, একটা ছুরি আমূল বসিয়ে দিল সে ওটার ঘাড়ের পেছনে। ডিগবাজি খেয়ে সাগরে পড়ে গেল ওটার প্রাণহীন

দেহ, সঙ্গে পিটার্স। শিগগিরই নিজেকে সামলে নিল, আর জানোয়ারটার কোমরে একটা দড়ি বেঁধে উঠে এল নৌকায়। ওটাকে নিয়ে বিজয়ীর বেশে আমরা ফিরে এলাম স্কুনারে। মেপে দেখা গেল, ভালুকটা পনেরো ফুট লম্বা। লোম ধবধবে সাদা, খুবই খসখসে, আঁটোসাঁটোভাবে কোঁকড়ানো। চোখ রক্তের মতো লাল, আর মেরু ভালুকের চেয়ে বড়। নাকের কাছটাও বেশি গোলাকার, বুলডগের মতো। মাংস নরম, কিন্তু অত্যন্ত বিস্বাদ আর আঁশটে, যদিও নাবিকেরা গোগ্রাসে খেয়ে বলল যে মাংসটা চমৎকার।

খাবারের পালা শেষ হতে না হতেই, ভেসে এল মাস্তুলের ওপর বসা লোকটার আনন্দিত চিৎকার, 'ডাঙা দেখা যাচ্ছে !' মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল সব নাবিক, উত্তর আর পুব থেকে ভেসে এল একটা বাতাস, শিগগিরই আমরা গেলাম উপকূলের কাছাকাছি। দেখলাম, ওটা ছোট্ট একটা পাথুরে দ্বীপ, পরিধি এক লিগের মতো, আর একজাতের প্রিকলি পেয়ার ছাড়া সেখানে কোনো গাছপালা নেই। উত্তর থেকে এগোতে চোখে পড়ল, পাটের বেলের মতো আজব চেহারার একটা শৈলশিরা বিস্তৃত হয়ে আছে সাগরের ওপর। সেই শৈলশিরার পশ্চিমে ছোট একটা অববাহিকা, যেখানে বেশ ভালোভাবেই আমরা নোঙর ফেলতে পারলাম।

পুরো দ্বীপটা চষে ফেলতে আমাদের বেশি সময় লাগল না, কিন্তু পাওয়া গেল না উল্লেখযোগ্য প্রায় কিছুই। দক্ষিণ প্রান্তে, সৈকতের কাছে পেলাম আলগা পাথরের ভেতরে অর্ধেক পোঁতা একটা কাঠের টুকরো। জিনিসটাকে মনে হলো, একটা ক্যানুর গলুই, যার ওপরে কিছু খোদাই করার চেষ্টা করা হয়েছে। ক্যাপটেন গাইয়ের মতে ওটা একটা কচ্ছপ, কিন্তু খোদাইটার সঙ্গে আমি কচ্ছপের বিশেষ মিল খুঁজে পেলাম না। এই গলুই ছাড়া, অবশ্য সত্যিই যদি ওটা গলুই হয়ে থাকে, আমরা আর এমন কোনো চিহ্ন পেলাম না যাতে মনে হয়, এখানে আগে কোনো জীবিত প্রাণী বাস করত। মাঝেসাঝে উপকূলের আশপাশে ছোটখাটো বরফস্তর দেখা গেল, তবে সংখ্যায় খুবই কম। এই দ্বীপের সঠিক অবস্থান হলো, অক্ষাংশ ৮২°৫০ দক্ষিণ আর দ্রাঘিমাংশ ৪২°২০ পশ্চিম, এবং ক্যাপটেন গাই তার স্কুনারের মালিকানার অংশীদারের সম্মানে এটার নামকরণ করল – বেনেট আইলেট।

দক্ষিণে আট ডিগ্রির চেয়েও বেশি এগোলাম আমরা, আজ পর্যন্ত কোনো নাবিকই যতদূর আসতে পারেনি। সাগর সম্পূর্ণ খোলা, প্রথমে বাতাস, আর পরে পানির তাপমাত্রা আরও শান্ত হয়ে এসেছে। আকাশ পরিষ্কার, মাঝেসাঝে দক্ষিণ দিগন্তে পাতলা কুয়াশা দেখা গেছে, তবে খুবই অল্প

সময়ের জন্যে। দুটো অসুবিধে দেখা দিয়েছে ; কমে এসেছে আমাদের জ্বালানি, আর অনেক নাবিকের মাঝে দেখা গেছে স্কার্ভির লক্ষণ। বারবার ফিরে যাবার কথা বলছে ক্যাপটেন গাই। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যেদিকে যাচ্ছি সেদিকে যাত্রা অব্যাহত রাখলে শিগগিরই আমরা ডাঙা দেখতে পাব, আর সেটা নিষ্ফলা না-ও হতে পারে। এরকম একটা সময়ে ফিরে যাবার কথা বলায় রাগ হলো ক্যাপটেনের ওপর, কিন্তু এ ব্যাপারে তার ওপর দিয়ে হাত বাড়াবার ক্ষমতা আমার নেই, তাই অনুরোধ করলাম, সে যেন অন্তত আর কয়েকটা দিন এভাবেই এগিয়ে যায়। সুতরাং আমার পরামর্শে অচিরেই যে চরম দুর্ভাগ্যজনক আর রক্তপাতের ঘটনাটা ঘটল, সেজন্যে অনুতাপ না করে কোনো উপায় আমার নেই, আবার এ কথা ভেবে খুশি না হয়েও পারছি না যে বিজ্ঞানের চোখের সামনে একটা তীব্র উত্তেজনাকর গোপন তথ্য তুলে ধরার ব্যাপারে, অতি পরোক্ষ হলেও, একটা সহায়ক ভূমিকা আমার অবশ্যই ছিল।

অধ্যায় ১৮

জানুয়ারি ১৮. আজ সকালে আবার দক্ষিণে যাত্রা করলাম আমরা, আবহাওয়া আগের মতোই ভালো। একটা কথা এখানে বলে রাখা উচিত। আমার বিবরণে 'সকাল' আর 'সন্ধে' শব্দ দুটোকে বারবার ব্যবহার করেছি, যেন পাঠকগণের মাঝে কোনো ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়, তাঁরা যেন অবশ্যই শব্দ দুটোর সাধারণ অর্থ না করেন। অনেকদিন ধরে আমরা রাতের মুখ দেখিনি, চব্বিশ ঘণ্টাই রয়েছে দিনের আলো। সব তারিখই হিসেব করা হয়েছে নটিক্যাল (Nautical) সময় অনুসারে। যেহেতু নিয়মিত কোনো জার্নাল লিখিনি, আমি এটাও দাবি করতে পারি না যে বিবরণের প্রথম অংশে ব্যবহৃত সমস্ত তারিখ, বা অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশ নির্ভুল। অনেক ক্ষেত্রেই আমাকে পুরোপুরি স্মৃতির ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। যাই হোক, সাগর একদম শান্ত, উত্তর-পুব থেকে আসা বাতাস সহনীয়, পানির তাপমাত্রা তিপ্পান্ন। আবার গভীরতা মাপতে, দেড়শো ফ্যাদমের দড়ি নামাতে বোঝা গেল, স্রোত মেরুর দিকে চলেছে ঘণ্টায় একমাইল গতিতে। স্রোত আর বাতাস দুটোই অবিরাম দক্ষিণে চলায় স্কুনারের কোথাও কোথাও শুরু হলো আলোচনা, আবার কোথাও কোথাও আশঙ্কা ; পরিষ্কার দেখতে পেলাম, ক্যাপটেন গাইয়ের ভেতরেও শুরু হয়েছে অস্বস্তি। আমি শেষমেশ তাকে হাসিয়ে তার যাবতীয় আশঙ্কা দূর করে দিতে পারলাম। সারাদিনে রাইট জাতের বেশ কয়েকটা বড় বড় তিমি দেখলাম, আর জাহাজের ওপর দিয়ে উড়ে গেল অ্যালবাট্রসের অসংখ্য ঝাঁক। হথর্নের মতো লাল বেরি বোঝাই একটা ঝোপও দেখলাম আমরা, আর আজব চেহারার স্থলভাগের একটা জানোয়ারের মৃতদেহ। ওটা তিন ফুট লম্বা, কিন্তু উচ্চতা মাত্র ছয় ইঞ্চি, খুবই ছোট ছোট চারটে পা, থাবার লম্বা লম্বা নখগুলো প্রবালের মতো

টকটকে লাল। শরীর রেশমের মতো সোজা লোমে ঢাকা, ধবধবে সাদা। প্রায় দেড় ফুট লম্বা লেজটা ইঁদুরের মতো। মাথাটা বিড়ালের মতো, কিন্তু কান দুটো কুকুরের মতো ঝোলানো। দাঁতগুলো নখের মতোই টকটকে লাল। আজব জানোয়ারটাকে আমরা তুলে নিলাম জাহাজে।

জানুয়ারি ১৯. আজ, অক্ষাংশ ৮৩°২০ আর দ্রাঘিমাংশ ৪৩°৫ পশ্চিমে (অস্বাভাবিক এক কালো রং ধারণ করেছে সাগর), মাস্তুলের ওপর থেকে আবার ডাঙা দেখতে পেলাম আমরা, আর, ভালোভাবে লক্ষ করতে বোঝা গেল, ওটা বেশ বড় বড় দ্বীপের একটা পুঞ্জ। সৈকত খাড়া আর ভেতর দিকে যথেষ্ট গাছপালা দেখে আনন্দে আটখানা হলাম সবাই। প্রথম দেখতে পাবার ঘণ্টা চারেকের মধ্যে উপকূল থেকে এক লিগ দূরে নোঙর ফেলা হলো, ফেনারাশি আর এখানে-সেখানে বড় বড় ঢেউ উঠতে দেখে এর চেয়ে কাছে যাবার সাহস পাওয়া গেল না। সবচেয়ে বড় নৌকা দুটো নামিয়ে, সশস্ত্র একটা দল (সেই দলে পিটার্স আর আমিও ছিলাম) খুঁজতে বেরোল, দ্বীপটাকে ঘিরে থাকা শৈলশ্রেণীর কোথাও ঢোকার মতো কোনো ফাঁক পাওয়া যায় কি না। খানিক খুঁজতেই একটা খাঁড়ি পেয়ে গেলাম আমরা, আর সেই পথে ঢুকতে যেতেই লক্ষ করলাম, উপকূল থেকে এদিকেই আসছে বড় বড় চারটে ক্যানু, যেগুলোতে ওঠা লোকদের বেশ সশস্ত্রই মনে হচ্ছে। খুব দ্রুত ছোটায় দেখতে দেখতেই তারা এসে পড়ল কাছে। ক্যাপটেন গাই তখন একটা দাঁড়ের মাথায় সাদা রুমাল বেঁধে তুলে ধরল ওপরে, সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল আগন্তুকেরা, নিজেদের মাঝে কী যেন সব বলাবলি করতে লাগল জোরে জোরে, আর মাঝে মাঝে ছাড়ল চিৎকার, যার দুটো শব্দ কেবল স্পষ্ট শুনতে পেলাম আমরা — আনামু-মু ! আর লামা-লামা ! অন্তত আধা ঘণ্টা তারা চালিয়ে গেল দুর্বোধ্য এই বকরবকর, সেই সুযোগে আমরা ভালোভাবে লক্ষ করতে লাগলাম তাদের চেহারা।

মোটামুটি পঞ্চাশ ফুট লম্বা আর পাঁচ ফুট চওড়া মাপের ক্যানু চারটেতে রয়েছে সবসুদ্ধ একশো দশজন অসভ্য মানুষ। দেহের গঠন অনেকটা ইয়োরোপীয়দের মতো, কিন্তু আরও পেশিবহুল। গায়ের রং কুচকুচে কালো, লম্বা আর ঘন পশমের মতো চুল। পরনে অজানা কোনো কালো জানোয়ারের ছাল, লোম কোঁকড়া আর রেশমি, তবে গলা, কবজি, আর গোড়ালির কাছে ছাড়া লোমগুলো দেহের ভেতরের দিকে মোড়ানো। তাদের হাতে ধরা গাঢ়

রঙের ভারী কাঠের গদা, তবে চকমকির ফলাঅলা কিছু বর্শাও আছে, আর কয়েকটা গুলতি। ক্যানুগুলোর তলা বড় বড় ডিমের আকারের কালো পাথরে ভরা।

তাদের চিৎকার আর বকরবকরের পালা শেষ হবার পর, সর্দার গোছের একজন তার ক্যানুর গলুইয়ে দাঁড়িয়ে, আমাদের নৌকা দুটো তার পাশে নিয়ে যাবার ইশারা করল। তার ইশারা না বোঝার ভান করলাম আমরা, কারণ, তাদের সংখ্যা যেহেতু আমাদের চারগুণ, দূরত্ব বজায় রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে, অন্য ক্যানু তিনটেকে সেখানেই থাকতে বলে, নিজের ক্যানু নিয়ে সর্দার এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে। কাছে আসতেই একলাফে আমাদের বড় নৌকাটায় উঠে, বসল সে ক্যাপটেন গাইয়ের পাশে, আর স্কুনারের দিকে হাত তুলে বারবার বলতে লাগল আনামু-মু ! আর লামা-লামা ! এগোতে লাগলাম আমরা জাহাজের দিকে, খানিকটা দূরত্ব রেখে অনুসরণ করল ক্যানু চারটে।

জাহাজের পাশাপাশি আসতে সর্দারের মাঝে প্রকাশ পেল চরম বিস্ময় আর আনন্দ ; হাততালি দিল সে, উরু আর বুক চাপড়াল, হাসল গলা ফাটিয়ে। দলের অন্যরাও যোগ দিল সর্দারের আনন্দে, ফলে কয়েক মিনিট এমন হইচই চলল যে আমাদের কানে তালা লাগার জোগাড়। অবশেষে হইচই থামতে, নিরাপত্তার কথা ভেবে নৌকা দুটোকে জাহাজে তুলে নিতে বলল ক্যাপটেন গাই, আর সর্দারকে (শিগগিরই আমরা জানতে পেরেছি যে তার নাম টু-উইট) আকার-ইঙ্গিতে বোঝাল যে আমরা ডেকে একবারে তার বিশজনের বেশি লোক তুলতে পারব না। ক্যাপটেনের বন্দোবস্তে তাকে খুবই সন্তুষ্ট মনে হলো, ক্যানুগুলোর দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিল সে, এগিয়ে এল একটা ক্যানু, বাকি তিনটে রয়ে গেল গজ পঞ্চাশেক পেছনে। বিশজন অসভ্য মানুষ ডেকে উঠে পড়ে, প্রত্যেকটা জিনিস দেখতে লাগল দারুণ কৌতূহলে।

পরিষ্কার বোঝা গেল যে এর আগে তারা কোনো সাদা চামড়ার মানুষ দেখেনি – সাদা চামড়ার কারো সামনে পড়লেই কেমন যেন একটু কুঁকড়ে যাচ্ছিল তারা। জেন গাইকে তারা মনে করল জ্যান্ত কোনো প্রাণী, তাই খোঁচা লেগে পাছে আঘাত পায়, সেজন্যে বর্শার ফলাগুলোকে রাখল ওপর দিকে করে। টু-উইটের একটা কাণ্ড দেখে খুবই মজা পেল আমাদের

নাবিকেরা। গ্যালির কাছে কুড়াল দিয়ে কাঠ চিরছিল পাচক, হঠাৎ তার কুড়ালের চোট লেগে ডেকের একটা জায়গা বেশ গভীরভাবে কেটে গেল। তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে, ধাক্কা মেরে তাকে একপাশে সরিয়ে দিল সর্দার, যেন কতই না কষ্ট পাচ্ছে স্কুনার, তারপর কাটা জায়গাটায় হাত বুলিয়ে আদর করে, সেখানটা ধুয়ে দিল পাশেই একটা গামলায় রাখা সাগরের পানিতে। তাদের এতখানি মূর্খতার জন্যে আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

জাহাজের ওপরটা দেখার কৌতূহল মিটে যাবার পর, তাদের নিয়ে যাওয়া হলো নিচে, যখন তাদের বিস্ময়ের আর কোনো সীমা রইল না। ঘুরে বেড়াতে লাগল তারা নীরবে, সেই নীরবতা ভঙ্গ হলো কেবল মুখ থেকে ছুটে যাওয়া অস্ফুট কোনো শব্দে। অস্ত্রশস্ত্র তাদের হতভম্ব করে দিল। আমি নিশ্চিত যে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রকৃত ব্যবহার সম্বন্ধে তাদের কোনোরকম ধারণা নেই, তাই আমাদের অতি সাবধানে নাড়াচাড়া করা দেখে, দেখার জন্যে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার সময় অতি সতর্কতা লক্ষ করে, তারা ভাবল যে ওগুলো আসলে দেব-দেবী। কামান দেখে তাদের বিস্ময় দ্বিগুণ হয়ে গেল। সেগুলোর কাছে গেল তারা আতঙ্কমিশ্রিত শ্রদ্ধায়, কিন্তু পরীক্ষা করল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কেবিনে ছিল বড় বড় দুটো আয়না এবং এখানেই তাদের বিস্ময় চরমে পৌঁছল। প্রথমে আয়নার কাছে গেল টু-উইট, আর কেবিনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো যে একটা আয়নার দিকে রইল তার মুখ, আরেকটার দিকে পিঠ। চোখ তুলে সামনের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে তার পাগল হবার দশা হলো ; তারপর পালাবার জন্যে ঘুরতেই পেছনের আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখে তার চোখ এমনভাবে কপালে উঠে গেল যে আমার ভয় হলো, বেচারি শেষে মারা না যায় ! অনেক বুঝিয়েও তাকে আর আয়নার সামনে দাঁড় করানো গেল না ; হাতে মুখ গুঁজে মেঝের ওপর শুয়ে পড়ল সে উপুড় হয়ে, শেষমেশ হেঁচড়ে কেবিন থেকে তাকে ডেকে নিয়ে যেতে বাধ্য হলাম আমরা।

এভাবে একেকবারে বিশজন করে সব অসভ্যকে তোলা হলো জাহাজে, আর পুরোটা সময় থাকতে হলো টু-উইটকে। তাদের ভেতরে চুরির কোনো প্রবণতা দেখতে পাইনি আমরা, তারা চলে যাবার পর প্রত্যেকটা জিনিসই পাওয়া গেছে ঠিকঠাক। জাহাজ দেখতে এসে বরাবর তারা খুব বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবই প্রদর্শন করে গেছে। অবশ্য তাদের কিছু কিছু আচরণ

কোনোভাবেই বুঝে উঠতে পারিনি আমরা ; যেমন, তাদের আমরা নিরীহ কয়েকটা জিনিসের কাছে নিয়ে যেতে পারিনি। যথা– জাহাজের পাল, ডিম, খোলা বই বা একপাত্র ময়দা। আমরা জানার চেষ্টা করলাম তাদের কাছে এমন কোনো জিনিস আছে কি না যা দিয়ে ব্যবসা চলতে পারে, কিন্তু কথাটা তাদের বোঝাতে আমাদের ঘাম ছুটে গেল। তবে দ্বীপে আমরা পেলাম প্রচুর গ্যালিপ্যাগো জাতের বড় কচ্ছপ, একটা তো দেখলাম টু-উইটের ক্যানুতেই। এক অসভ্যের হাতে কয়েকটা সাগর শসাও দেখতে পেলাম, প্রাণীগুলোকে কাঁচাই খাচ্ছে গপগপ করে। এসব অসঙ্গতি দেখে পুরো দ্বীপে একটা অনুসন্ধান চালাতে চাইল ক্যাপটেন গাই, এই আশায় যে সে লাভজনক কিছু পেতে পারে। এদিকে আমি এই অঞ্চলের দ্বীপগুলো সম্বন্ধে আরও কথা জানার লক্ষ্যে একটুও সময় নষ্ট না করে আবার দক্ষিণে যাত্রা করার জন্যে ছটফট করছি। আমার অস্থিরতা আরও বাড়ল এ কারণে যে ইতিমধ্যেই আমরা পৌঁছে গেছি চুরাশি সমাক্ষরেখায়, আবহাওয়া চমৎকার, সামনে খোলা সাগর, স্রোতও বইছে দক্ষিণমুখী, কিন্তু কতদিন এই অবস্থা থাকবে বলা যায় না, নাবিকদের রোগও বেড়ে যেতে পারে যে কোনো সময়, সুতরাং পরিস্থিতি অনুকূলে থাকতেই অভিযান সেরে নেওয়াটা সমীচীন। ক্যাপটেন জ্বালানি আর টাটকা খাবারের প্রসঙ্গ তুলতে তাকেও বোঝালাম, ওগুলো ফেরার পথে এই দ্বীপ থেকেই সংগ্রহ করা যাবে, শীতে বরফে পথ বন্ধ হয়ে গেলে এমনিতেই এখানে আমাদের থাকতে হবে কয়েক মাস। অবশেষে আমার কথায় সায় দিল ক্যাপটেন (বুঝতে পারিনি, কেন যেন তার ওপরে আমার একটা প্রভাব পড়েছিল), স্থির হলো, এখানে মাত্র এক সপ্তাহ থেকে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস সংগ্রহ করে, আমরা আবার রওনা দেব দক্ষিণে। টু-উইটের নির্দেশিত পথে, জেন গাইকে শৈলশ্রেণীর মাঝ দিয়ে নিরাপদে নিয়ে গিয়ে, নোঙর ফেলা হলো উপকূলের মাইলখানেক দূরের স্থলবেষ্টিত সুন্দর একটা অববাহিকায়। শুনলাম, অববাহিকাটার মাথায় আছে সুস্বাদু পানির তিনটে ঝরনা, আর প্রচুর গাছ দেখলাম আশপাশে। মোটামুটি একটা দূরত্ব বজায় রেখে, আমাদের অনুসরণ করল চারটে ক্যানু। টু-উইট নিজে জাহাজেই থাকল, আর নোঙর ফেলতে, আমাদের আমন্ত্রণ জানাল দ্বীপের ভেতর দিকে তার গ্রামে যাবার জন্যে। এতে রাজি হলো ক্যাপটেন গাই ; দশজন অসভ্যকে জামিনস্বরূপ জাহাজে রেখে, সর্দারের সঙ্গে যাবার জন্যে

আমরা প্রস্তুত করলাম বারোজনের একটা দল। মনে কোনোরকম অবিশ্বাস না থাকলেও, যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নেওয়া হলো। স্কুনারে অস্ত্র কমে যাওয়ায় তারের জাল দিয়ে ঘিরে রাখা হলো সেটাকে, এছাড়া নেওয়া হলো অন্যান্য পদক্ষেপ, যেন হঠাৎ আক্রান্ত হলে সামাল দেওয়া যায়। চিফ মেটকে নির্দেশ দেওয়া হলো, আমাদের অনুপস্থিতিতে সে যেন কাউকে জাহাজে উঠতে না দেয়, আর, যদি আমরা বারো ঘণ্টার মধ্যেও না ফিরি, তাহলে কাটার জাহাজটাকে যেন পাঠিয়ে দেয় আমাদের সন্ধানে।

যতই ভেতরে ঢুকলাম, বিশ্বাস দৃঢ় হতে লাগল যে আমরা এসে পড়েছি এমন এক দেশে যার সবকিছুই সভ্য মানুষদের দেখা যে কোনো দেশের থেকে আলাদা। এখানকার গাছপালাও উষ্ণমণ্ডল, নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল বা উত্তরের হিমমণ্ডলের মতো নয়, এমনকি ইতিমধ্যেই আমরা পেরিয়ে এসেছি দক্ষিণের যেসব অক্ষাংশ, সেগুলোতেও দেখিনি এই জাতের গাছপালা। পাহাড়গুলোরও আকার, রং, স্তরবিন্যাস সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ; স্রোতস্বিনীগুলোর চেহারা পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের স্রোতস্বিনীর থেকে এতটাই আলাদা যে আমরা প্রাকৃতিক পানির মতো হবে কি না ভেবে প্রথমে বিশ্বাস করে সেই পানি খেতেই পারিনি। পথে প্রথম যে স্রোতস্বিনীটা পেলাম আমরা, পানি খেতে সেখানে থামল টু-উইট আর তার অনুচরেরা। পানির আজব চেহারা দেখেই সে পানি খেতে আমরা রাজি হলাম না ; খানিক পর বোঝা গেল, এই অঞ্চলের সব স্রোতস্বিনীই এরকম। এই পানির বৈশিষ্ট্য কীভাবে বোঝাব ভেবে পাচ্ছি না, অন্তত দুই-এক কথায় তো পারবই না। আর সব পানির মতোই এই পানি ঢাল বেয়ে নামে, কিন্তু প্রপাতের আকারে নামার সময়ে ছাড়া স্বচ্ছ দেখায় না আর কখনোই। তাহলে এগুলোর পানি যে কোনো চুনাপাথরের পানির মতোই স্বচ্ছ, কেবল চেহারাটা আলাদা। কম ঢালু জায়গায় দেখলে মনে হয়, এই পানির সঙ্গে যেন মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে গদের আঠা। কিন্তু পানির বৈশিষ্ট্যগুলোর মাঝে এটাই সবচেয়ে কম আজব। এই পানি রংহীন নয়, আবার নির্দিষ্ট একটা রঙেরও নয়, প্রবাহিত হবার সময় দেখলে মনে হয়, পরিবর্তনশীল রেশমি কাপড়ের মতো এটার রয়েছে বেগুনি-লাল রঙের যাবতীয় বৈচিত্র্য। পানির রঙের এই বৈচিত্র্য দেখে আমরা সবাই ততটাই অবাক হলাম যতটা টু-উইট হয়েছিল আয়না দেখে। একটা

গামলায় পানি রেখে থিতিয়ে আসার পর দেখলাম, পানিটায় রয়েছে বেশ কয়েকটা স্বতন্ত্র শিরা, যার প্রত্যেকটার রং আলাদা ; এক শিরার সঙ্গে আরেক শিরা মেশে না ; অর্থাৎ, আপন বস্তুকণা নিয়ে এই শিরা নিখুঁত থাকে, পাশের শিরার বস্তুকণার সঙ্গে মিশলে তাতে খুঁত এসে যায়। একটা ছুরি নিয়ে দেখলাম, দুটো শিরার মাঝে অভ্রান্তভাবে ছুরি চালালেই কেবল সেগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে এসে গায়ে গায়ে জুড়ে যেতে পারছে না। ধীরে ধীরে অলৌকিক যে ঘটনাবলি আমাকে ঘিরে ধরেছিল, পানির রহস্যটা সেই ধারাবাহিকতার প্রথম সুস্পষ্ট অংশ মাত্র।

অধ্যায় ১৯

গ্রামটার দূরত্ব নয় মাইলেরও বেশি, আর রাস্তা এবড়োখেবড়ো হওয়ায়, সেখানে পৌঁছতে আমাদের লাগল প্রায় তিন ঘণ্টা। যেতে যেতে টু-উইটের দলে (চারটে ক্যানুর একশো দশজন অসভ্যের সবাই) দুজন, ছয়জন বা সাতজন করে অসভ্য যোগ দিতে লাগল, রাস্তার বিভিন্ন মোড়ে। এই যোগ দেওয়ার মাঝে এমন একটা পদ্ধতি আছে বলে মনে হলো যে অবিশ্বাসে না ভুগে পারলাম না, আর আমার আশঙ্কার কথা জানালামও ক্যাপটেন গাইকে। তবে এখন আর ফিরে যাওয়া চলে না, সুতরাং টু-উইটের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করাটাই সবচেয়ে নিরাপদ। এগোতে এগোতে সতর্ক চোখ রাখলাম অসভ্যদের ওপর, যেন মাঝখানে ঢুকে পড়ে তারা আমাদের দলটাকে বিভক্ত করে দিতে না পারে। অবশেষে খাড়া একটা গিরিখাত পেরিয়ে পৌঁছলাম আমরা দ্বীপের একমাত্র বসতিতে। গ্রামটা চোখে পড়তেই চিৎকার শুরু করে দিল সর্দার, আর বারবার বলতে লাগল একটা শব্দ – ক্লক-ক্লক ; আমরা ভাবলাম, ওটাই গ্রামের নাম বা গ্রামের প্রতিশব্দ।

বসতিগুলোর অবস্থা এতই শোচনীয় যে তার বর্ণনা দেওয়াই কঠিন, সবচেয়ে নিচু জাতের অসভ্য মানুষও এত জঘন্যভাবে থাকে না, সঙ্গতিপূর্ণ কোনো পরিকল্পনা তাদের নেই। বসতিগুলোর কয়েকটা (এগুলোর মালিক ওয়ামপু বা ইয়ামপুরা, অর্থাৎ, গ্রামের প্রধান মানুষেরা) করা হয়েছে একটা গাছকে শেকড়ের চার ফুট মতো ওপরে কেটে ফেলে, তার ওপরে বড় একটা কালো চামড়া এমনভাবে বিছিয়ে, যেন তার প্রান্ত মাটির ওপর শিথিলভাবে ঝোলে। এর নিচেই বাস করে অসভ্যেরা। আবার কোনো কোনোটা তৈরি করা হয়েছে পাঁচ-ছয় ফুট উঁচু মাটির ঢিবির ওপর, পাতাসুদ্ধ গাছের কয়েকটা ডাল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে পেছনদিকে বেঁকিয়ে। এগুলো ছাড়াও আর কয়েকটা তৈরি হয়েছে মাটিতে খাড়া গর্ত খুঁড়ে, আর ওপরে ডালপালা

বিছিয়ে, এসবে বসবাসকারীরা ডাল সরিয়ে ভেতরে ঢোকে, তারপর ডাল টেনে বন্ধ করে দেয় গর্তের মুখ। গাছের ডালের ফাঁকেও বসবাস করে কেউ কেউ, তারা ওপরের ডাল খানিকটা কেটে নিচের ডালগুলোর ওপরে একটা আচ্ছাদন তৈরি করে, যেন ঝড়-বৃষ্টিতে খানিকটা হলেও রেহাই পাওয়া যায়। তবে বেশির ভাগ অসভ্যই বাস করে কালো পাথরের একটা খাড়া শৈলশিরার গায়ে ছোট ছোট অগভীর গুহায়। এই শৈলশিরাই ঘিরে আছে গ্রামের তিন দিক। প্রত্যেকটা আদিম গুহার মুখে রয়েছে একটা করে ছোট পাথর, এখানে বসবাসকারীরা গুহা ছেড়ে চলে যাবার সময় পাথর টেনে বসিয়ে দিয়ে যায় গুহামুখে ; কিন্তু কেন তারা এই কাজটা করে তা আমি বুঝতে পারিনি, কারণ, সেই পাথরে গুহামুখের ঢাকা পড়ে বড়জোর তিন ভাগের একভাগ।

এই গ্রামটা, অবশ্য এটাকে যদি গ্রাম বলা যায়, রয়েছে মোটামুটি গভীর এক উপত্যকায়, যেখানে যাওয়া যায় কেবল দক্ষিণ দিক থেকে, বাকি আর সব দিকে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে খাড়া সেই শৈলশিরা। উপত্যকার মাঝখান দিয়ে কলকল করে বয়ে চলেছে বিস্ময়কর পানির একটা স্রোতস্বিনী, রঙিন যে পানির বিবরণ আমি ইতিমধ্যেই দিয়েছি। বসতির আশপাশে বেশকিছু আজব জানোয়ারও দেখলাম আমরা, যার সবগুলোকে পুরোপুরি গৃহপালিত বলেই মনে হলো। জানোয়ারগুলোর মাঝে সবচেয়ে যেটা বড় সেটার শরীর আর তুণ্ড (Snout) আমাদের সাধারণ শুয়োরের মতো ; কিন্তু লেজটা লোমশ আর পাগুলো অ্যান্টিলোপের মতো সরু, চালচলন খুবই অদ্ভুত, যেন কী করবে বুঝতে পারছে না, জানোয়ারটাকে একবারও পালাবার চেষ্টা করতে দেখা গেল না। প্রায় একই চেহারার আরও জানোয়ার দেখলাম আমরা, তবে সেগুলোর শরীর অনেক বেশি লম্বা, আর কালো পশমে ঢাকা। নানা জাতের পোষা মুরগি ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক সেদিক, সম্ভবত এগুলোই অসভ্যদের প্রধান খাদ্য। এই পাখিগুলোর মাঝে পুরোপুরি গৃহপালিত গোছের কালো অ্যালবাট্রস দেখে খুবই অবাক হলাম আমরা, খানিক পর পর সাগরে চলে যাচ্ছে তারা খাবারের খোঁজে, কিন্তু আবার গ্রামে ফিরে আসছে যেন এটাই তাদের বাসা, আর ডিমে তা দেওয়ার জন্যে বেছে নিয়েছে গ্রামের দক্ষিণ উপকূল। সেখানে স্বাভাবিকভাবেই তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বন্ধু পেলিক্যানের দল, কিন্তু সেই পেলিক্যানেরা কখনোই অসভ্যদের বসতিতে আসে না। অন্যান্য পাখির মাঝে রয়েছে হাঁস, যেগুলোর সঙ্গে আমাদের দেশের ক্যানভাস ব্যাক হাঁসের খুব বেশি পার্থক্য নেই, কালো গ্যানেট, আর অনেকটা বাজার্ডের মতো বিরাট একটা পাখি,

কিন্তু মাংসাশী নয়। মাছ রয়েছে অনেক জাতের আর প্রচুর পরিমাণে। আমরা দেখলাম স্যামনের শুঁটকি, পাহাড়ে কড, নীল ডলফিন, ম্যাকেরেল, ব্ল্যাকফিশ, স্কেট, কঙ্গার ঈল, এলিফ্যান্ট ফিশ, মালিট, সোল, প্যারটফিশ, লেদার জ্যাকেট, গারনার্ড, হেক, রাঘববোয়াল, প্যারাকুটা এবং অন্যান্য আরও অসংখ্য জাত। আমরা লক্ষ করলাম, এখানকার বেশির ভাগ মাছই অক্ষাংশ একান্ন ডিগ্রি দক্ষিণের লর্ড অকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের মাছের মতো। গ্যালিপ্যাগো কচ্ছপও রয়েছে প্রচুর। বুনো জানোয়ার চোখে পড়ল মাত্র কয়েকটা, কোনোটাই বড় নয়, কিংবা আমাদের পরিচিত কোনো জানোয়ারের মতোও নয়। ভয়ংকর চেহারার দু-একটা সাপ দেখলাম, কিন্তু অসভ্যেরা সেগুলোর দিকে চোখ তুলেও না তাকানোয় বুঝলাম, সাপগুলো নির্বিষ।

টু-উইট আর তার দলের সঙ্গে আমরা গ্রামের কাছাকাছি যেতেই, অসভ্যের বিরাট একটা দল ছুটে এল চেঁচাতে চেঁচাতে, যার মাঝে দুটো শব্দই মাত্র বোঝা গেল – আনামু-মু ! আর লামা-লামা ! আমরা দেখে অবাক হলাম যে ক্যানুর অসভ্যদের পরনে চামড়ার পোশাক থাকলেও, নতুন যারা ছুটে এল, তাদের কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সবাই ন্যাংটা। গ্রামের সমস্ত অস্ত্রও মনে হলো ক্যানু আরোহীদেরই দখলে, কারণ নবাগতদের কারো হাতে কোনো অস্ত্র নেই। নবাগতদের মাঝে অনেক মেয়ে আর শিশুও আছে, তেমন কমতি নেই মেয়েদের সৌন্দর্যে। তাদের শরীর সোজা, লম্বা, আর সুগঠিত, চালচলনে এমন একটা মাধুর্য আর স্বাধীন ভাব আছে যা সভ্য সমাজে দেখা যায় না। তাদের ঠোঁট পুরুষের মতো মোটা, তাই হাসলেও দাঁত বেরিয়ে আসে না বাইরে। তাদের চুলের গঠন পুরুষের চেয়ে ভালো। ন্যাংটা গ্রামবাসীদের মাঝে দশ কি বারোজনের পরনে টু-উইটের দলের মতো কালো চামড়ার পোশাক, হাতে বর্শা আর ভারী গদা। গ্রামের অন্যরা তাদের বেশ মেনে চলছে দেখলাম, আর সবসময় ডাকছে 'ওয়ামপু' বলে। তারা বাস করে কালো চামড়ার প্রাসাদে ! টু-উইটের বাসস্থান গ্রামের মাঝখানে, বাকিগুলোর চেয়ে অনেকটা বড়, আর খানিকটা হলেও ভালোভাবে নির্মিত। যে গাছটা বসতির ঠেসের কাজ করছে সেটা কাটা হয়েছে শেকড়ের বারো ফুট উঁচুতে, আর তার নিচের ডালগুলো না কাটায় সেগুলো ঢালু হয়ে রয়েছে, ফলে বসতির অদ্ভুত আচ্ছাদনটা যেমন বিস্তৃত হয়েছে তেমনই ডালগুলো গুঁড়ির চারপাশে লুটিয়ে পড়েনি। অদ্ভুত আচ্ছাদনটা তৈরি হয়েছে খুব বড় বড় চারটে চামড়া দিয়ে, তারপর সেই চামড়াকে আবার টানটান

করা হয়েছে মাটিতে কাঠের খুঁটি পুঁতে। মেঝেতে কার্পেটের মতো করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শুকনো পাতা।

আমাদের মহাসমারোহে নিয়ে যাওয়া হলো সর্দারের কুটিরে, আদিবাসীরাও যতজন পারে এল আমাদের পেছনে পেছনে। পাতার কার্পেটে বসে পড়ে, আমাদেরও বসতে ইশারা করল টু-উইট। বসার পর, পরিস্থিতি জটিল না হলেও বেশ অস্বস্তিকর মনে হলো। মাটিতে বসে আছি আমরা বারোজন, আমাদের ঘিরে অন্তত চল্লিশজন অসভ্য এমনভাবে গা ঘেঁষে বসে আছে যে যদি কোনো ঝামেলা হয়, তাহলে আমাদের পক্ষে কেবল অস্ত্র ব্যবহার করাই অসম্ভব নয়, উঠেও দাঁড়াতে পারব না। চাপ কেবল কুটিরের ভেতরেই নয়, বাইরেও, যেখানে সম্ভবত জড়ো হয়েছে পুরো দ্বীপের অধিবাসী, আর টু-উইট অবিরাম গালিগালাজ করে বাধা না দিলে, তারা বোধ হয় এতক্ষণ কুটিরের ভেতরে ঢুকে পড়ে আমাদের পায়ের তলাতেই পিষে মারত। সুতরাং আমাদের মূল নিরাপত্তা যেহেতু এখন আমাদের মাঝে টু-উইটের উপস্থিতির ওপর নির্ভরশীল, সর্দারকে যথাসম্ভব ঘিরে বসে রইলাম আমরা, যেন কোনো শত্রুতা দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ তাকে খতম করে দিতে পারি।

বাইরের চেঁচামেচি একটু শান্ত হতে, আমাদের উদ্দেশ্য করে বেশ লম্বা একটা বক্তৃতা দিতে লাগল সর্দার, প্রায় যেমনটা সে দিয়েছিল ক্যানুতে, পার্থক্য কেবল, এবার লামা-লামা !-র চেয়ে আনামু-মু ! শব্দটার ওপর জোর দেওয়া হলো বেশি। একবর্ণও না বুঝে গম্ভীর মুখে শুনে গেলাম আমরা পুরো বক্তৃতা। তারপর এল ক্যাপটেনের বক্তৃতার পালা। ক্যাপটেন গাই বক্তৃতার মাধ্যমে সর্দারকে জানাল চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব এবং শুভেচ্ছা, আর তার নিদর্শনস্বরূপ তাকে উপহার দিল নীল পুঁতির বেশ কয়েকটা মালা আর একটা ছুরি। আমাদের অবাক করে, পুঁতির মালা দেখে নাক সিটকাল সর্দার ; কিন্তু ছুরিটা দেখে সে এতই খুশি হলো যে তৎক্ষণাৎ জারি করল ভোজ আনার হুকুম। পরিচারকেরা মাথায় করে বয়ে আনল অজানা এক জানোয়ারের নাড়িভুঁড়ি, সম্ভবত সরু পাঅলা শুয়োরগুলোর কোনো একটার, যেগুলোকে আমরা দেখেছিলাম গ্রামে ঢোকার সময়। আমরা চুপ করে আছি দেখে সর্দার ভাবল, এত সুস্বাদু খাবার কীভাবে খেতে হয় সেই কৌশলটা বুঝি আমাদের জানা নেই, আর তাই নিজেই দেখিয়ে দিল। জিনিসটা দেখেই গা গুলিয়ে উঠেছিল, সর্দার কচমচ করে কয়েক গজ নাড়ি চিবিয়ে গিলে ফেলার পর মনে হলো, আর সহ্য করতে পারব না, বমি হয়ে যাবে যে কোনো মুহূর্তে। এমন

একটা রাজভোগে অংশগ্রহণ করছি না দেখে এতটাই বিস্মিত হলো সর্দার, তার সে বিস্ময়কে হার মানাতে পারে কেবল সেই আয়না দেখার ঘটনাটা। যাই হোক, আমরা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে খানিক আগেই ভরপেট খেয়ে আসায় আমাদের কারোরই খিদে নেই।

সর্দারের খাবার পালা শেষ হবার পর, যথাসম্ভব কৌশলে আমরা তাকে জেরা করতে লাগলাম যে এই অঞ্চলে কোন কোন জিনিসের উৎপাদন সবচেয়ে বেশি, আর সেগুলো ব্যবসার জন্যে লাভজনক কি না। শেষমেশ আমাদের কথা কিছুটা অনুমান করতে পারল সে, আর আমাদের নিয়ে যেতে চাইল উপকূলের কোনো একটা জায়গায় যেখানে অসংখ্য সাগর শসা পাওয়া যায়। আদিবাসীদের চাপ কাটিয়ে পালাবার এই সুযোগ আমরা কেউই হারাতে চাইলাম না, তাই আমাদের বাইরে নিয়ে যাবার ইশারা করলাম। সর্দার আমাদের নিয়ে গেল দ্বীপের দক্ষিণ-পুব প্রান্তে, পেছনে পেছনে এল পুরো গ্রামের আদিবাসী। জায়গাটা আমরা যেখানে নোঙর ফেলেছি তার থেকে দূরে নয়। ঘণ্টাখানেক পর অসভ্যেরা নিয়ে এল সেই চারটে ক্যানু। আমরা বারোজন একটা ক্যানুতেই উঠে পড়লাম, তারপর সেই শৈলশ্রেণীর পাশ দিয়ে এগিয়ে, অন্য আরেকটা শৈলশ্রেণী পেরিয়ে যেতেই, দেখতে পেলাম অসংখ্য সাগর শসা ; আমাদের সবচেয়ে বুড়ো নাবিক বলল যে একসঙ্গে এত সাগর শসা সে এদিকের কোনো দ্বীপে দেখেনি, আর তারা মাছের মতো এই প্রাণীগুলো ব্যবসার জন্যে খুব ভালো। শৈলশ্রেণীর কাছে কিছুক্ষণ থেকে আমরা সন্তুষ্ট হলাম যে এখানে এত সাগর শসা আছে, প্রয়োজনে গোটা বারো জাহাজ ভরিয়ে ফেলা যাবে অনায়াসে। স্কুনারে ফেরার পর, টু-উইটের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় সে আমাদের কথা দিল যে আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ক্যানু ভরিয়ে নিয়ে আসবে ক্যানভাস ব্যাক হাঁস আর গ্যালিপ্যাগো কচ্ছপ। আমাদের অভিযানের এই পুরো সময়ে আদিবাসীদের আচরণে সন্দেহ করার মতো কিছু দেখিনি, খটকা লেগেছিল কেবল একবারই– যখন স্কুনার থেকে গ্রামে যাবার সময় কেমন যেন একটা পদ্ধতিগতভাবে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ক্রমেই তারা দলে ভারী হচ্ছিল।

অধ্যায় ২০

সর্দার মানুষটা যেমন ভালো তার কথারও তেমনই মূল্য আছে, শিগগিরই আমরা পেয়ে গেলাম প্রচুর তাজা খাবার। কচ্ছপগুলো খুবই সুস্বাদু, হাঁসগুলো তো আমাদের দেশের সেরা জাতের বনমুরগির চেয়েও ভালো – তুলতুলে নরম, রসাল, সুগন্ধী। এসবের পাশাপাশি অসভ্যেরা আমাদের এনে দিল প্রচুর পরিমাণে বাদামি সেলারি আর স্কার্ভি ঘাস, সঙ্গে পুরো এক ক্যানু তাজা মাছ আর শুঁটকি। সেলারিটা চমৎকার, আর স্কার্ভি ঘাস আমাদের স্কার্ভি রোগে ভোগা নাবিকদের জন্যে বয়ে আনল ধারণাতীত উপকার। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাদের কেউ আর রোগীর তালিকায় থাকল না। এল আরও নানা ধরনের তাজা খাবার, যার মধ্যে রয়েছে মাসেলের (Mussel) মতো দেখতে একজাতের খোলাঅলা মাছ, যেটার স্বাদ ঝিনুকের মতো। কুঁচো চিংড়ি আর বাগদা চিংড়িও এল অনেক, আর অ্যালবাট্রস এবং অন্যান্য পাখির কালো খোলাঅলা ডিম। বিশেষ প্রজাতির সেই শুয়োরের মাংসও অঢেল পাওয়া গেল, যে প্রজাতির কথা আগেই বলেছি। বেশির ভাগ নাবিক সেই মাংস সুস্বাদু বলেই খেল, কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না, মাংসটায় কেমন যেন আঁশটে একটা গন্ধ। এতসব ভালো ভালো জিনিসের বিনিময়ে আদিবাসীদের আমরা উপহার দিলাম নীল পুঁতি, পেতলের অলঙ্কার, পেরেক, ছুরি, আর লাল কাপড়ের টুকরো, আর এগুলো পেয়ে তারাও খুশি হলো খুব। স্কুনারের কামানগুলোর ঠিক নিচে, সৈকতের ওপর নিয়মিত একটা বাজার বসালাম আমরা, যেখানে সুশৃঙ্খলভাবেই পণ্যবিনিময় চলতে লাগল, অথচ ক্লক-ক্লক গ্রামে অসভ্যদের আচরণ দেখে আমরা তাদের মোটেই সুশৃঙ্খল ভাবতে পারিনি।

বেশ কিছু দিন এভাবেই কেটে গেল বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে, মাঝেসাঝেই দলে দলে অসভ্য উঠে এল স্কুনারে, আমাদের নাবিকেরাও মাঝেসাঝেই

নামল সৈকতে বা বেড়াতে গেল দ্বীপের ভেতর দিকে, কেউ তাদের সঙ্গে কোনোরকম ঝামেলা পাকাল না। খুব সহজে জাহাজ সাগর শসায় ভরিয়ে নেওয়া যাবে ভেবে, দ্বীপবাসীদের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ আর সেসব সংগ্রহে সহযোগিতার মনোভাব দেখে, ক্যাপটেন গাই টু-উইটের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে চাইল যেন সাগর শসার যত্ন করার জন্যে উপযুক্ত ঘর তৈরি করা হয়, আর আদিবাসীদের সহায়তায় সেগুলো সংগ্রহ করা হয় যত বেশি সম্ভব, ইতিমধ্যে ভালো আবহাওয়ার সুযোগে সে ঘুরে আসবে আরও দক্ষিণ থেকে। পরিকল্পনার কথাটা বলতে একটা চুক্তিতে আসার ব্যাপারে খুবই আগ্রহ দেখাল সর্দার। দুই পক্ষেরই সন্তোষজনক একটা দর কষাকষি করে শেষমেশ সাব্যস্ত হলো যে সাগর শসা রাখার ঘর তৈরির কাজে হাত লাগাবে স্কুনারের সব নাবিক, তারপর পরিকল্পনা কার্যকর করার তত্ত্বাবধান আর সাগর শসা শুকানোর ব্যাপারে আদিবাসীদের নির্দেশ দেওয়ার জন্যে দু-তিনজন লোক রেখে, স্কুনার যাত্রা করবে আরও দক্ষিণে। আমাদের অনুপস্থিতিতে পরিকল্পনার সাফল্য প্রায় পুরোটাই নির্ভর করবে অসভ্যদের পরিশ্রমের ওপর। এবং এই পরিশ্রমের বিনিময়ে চুক্তি অনুসারে তারা পাবে নীল পুঁতি, ছুরি, লাল কাপড় আর এই ধরনের আরও কিছু জিনিস।

তো, যেটা নিয়ে এত ব্যবসার কথা চলছে, সেটার কিছু বিবরণ দিলে পাঠকগণের মনে হয় ভালোই লাগবে। বিবরণের এই অংশটুকু নেওয়া হয়েছে একটা দক্ষিণ সাগর অভিযানের আধুনিক ইতিহাস থেকে।

'একজাতের এই সাগর শসাকে ফরাসিরা বলে বুচ দ্য মার, যার অর্থ, সাগরের একটা চমৎকার খাবার। এগুলো প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা হয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোতে, আর বিশেষ করে সংগ্রহ করা হয় চীনা বাজারের জন্যে, যেখানে এগুলোর দাম খুবই বেশি, সম্ভবত তাদের বহুল আলোচিত ভোজ্য পাখির বাসার সমান, সম্ভবত এই প্রাণীর শরীর থেকে নরম আর আঠাল একটা বস্তু তুলে নিয়ে যে-বাসা তৈরি করে এক প্রজাতির সোয়ালো পাখি। প্রাণীগুলোর শরীরে কোনো খোলা নেই, পা নেই, প্রধান কোনো অঙ্গ নেই, আছে কেবল খাদ্যবস্তু শুষে নেওয়া আর তা বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা ; কিন্তু, শুঁয়োপোকা বা গুটিপোকার মতো, ইলাস্টিক গোছের ডানার সহায়তায় তারা একরকম হামাগুড়ি দিয়ে চলাফেরা করে অগভীর পানিতে, আর তখনই সোয়ালো পাখিরা দেখতে পেয়ে, তাদের তীক্ষ্ণ ঠোঁট প্রাণীগুলোর শরীরে ঢুকিয়ে দেয়, আর নরম আর আঠাল একটা আঁশ বের করে, শুকিয়ে, তা দিয়ে তৈরি করে তাদের বাসার দেয়াল।

'এই সাগর শসা বা একজাতীয় শামুক, কিংবা এটাকে আমরা একজাতীয় ঝিনুকও বলতে পারি, হলো আয়তাকার, লম্বায় তিন থেকে আঠারো ইঞ্চি ; আর আমি কয়েকটা দেখেছি যেগুলো লম্বায় দুই ফুটের কম নয়। বড়গুলো প্রায় গোল, একপাশ সামান্য চ্যাপটা, থাকে সাগরের তলদেশে, আর এক থেকে আট ইঞ্চি মোটা। বছরের একটা বিশেষ ঋতুতে তারা হামাগুড়ি দিয়ে চলে আসে অগভীর পানিতে, সম্ভবত প্রজননের উদ্দেশ্যে, কারণ, তখন তাদের দেখা যায় জোড়ায় জোড়ায়। সূর্যের প্রচণ্ড তাপে পানি যখন ঈষদুষ্ণ হয়ে যায়, তখন তারা উঠে আসে উপকূলে ; আর প্রায়ই এত অগভীর জায়গায় যে ভাটার সময় পানি নেমে গেলে তারা বালিতে আটকা পড়ে রোদে শুকাতে থাকে। তারা কখনোই তাদের বাচ্চাকে অগভীর পানিতে নিয়ে আসে না, গভীর পানি থেকে উঠে আসে কেবল প্রাপ্তবয়স্করা। তাদের প্রধান খাদ্য সেই জাতের জুফাইট (Zoophyte) যা দিয়ে তৈরি হয় প্রবাল।

'এই বিচ দ্য মার বা সাগর শসাকে সাধারণত তুলে আনা হয় তিন-চার ফুট গভীর পানি থেকে ; তারপর শরীরের আকার অনুসারে সেটার একপাশ ছুরি দিয়ে চেরা হয় এক ইঞ্চি বা তার চেয়েও বেশি। চাপ মেরে চেরা জায়গাটা দিয়ে বের করে আনা হয় নাড়িভুঁড়ি, তারপর ওটাকে ধুয়ে সেদ্ধ করা হয় নির্দিষ্ট একটা মাত্রা পর্যন্ত, খুব বেশি নয় বা খুব কমও নয়। তারপর সেগুলোকে মাটিতে পুঁতে রাখা হয় চার ঘণ্টা, তারপর তুলে আবার সেদ্ধ করা হয় অল্পক্ষণ, দ্বিতীয় বার সেদ্ধ করার পর সেগুলোকে শুকাতে হয় আগুনে বা রোদে। সবচেয়ে ভালো হলো রোদে শুকানো ; কিন্তু রোদে যে সময়ে এক পিকাল (Picul=১৩৩ ১/৩ পাউন্ড) শুকানো যায়, আগুনে সেই একই সময়ে শুকানো যায় তিরিশ পিকাল। যথাযথভাবে প্রস্তুত করার পর, কোনোরকম নষ্ট হবার ঝুঁকি ছাড়াই শুকনো জায়গায় সেগুলোকে অনায়াসে রাখা যায় দুই থেকে তিন বছর ; কিন্তু কয়েক মাস পরপর সেগুলোকে একটু পরীক্ষা করে দেখতে হবে, বছরে মোটামুটি চার বার, স্যাঁতসেঁতে হয়ে যাচ্ছে কি না।

'আগেই বলা হয়েছে, চীনাদের কাছে এই বিচ দ্য মারের কদর খুব বেশি। তারা বিশ্বাস করে, এটা পুষ্টি জুগিয়ে শরীরকে শক্তিশালী করে তোলে, ফুরিয়ে যাওয়া মাত্রাতিরিক্ত যৌনতাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। সবচেয়ে ভালো শ্রেণীর সাগর শসার অনেক মূল্য ক্যান্টনে, প্রতি পিকাল নব্বই ডলার ; দ্বিতীয় শ্রেণীর পঁচাত্তর ডলার ; তৃতীয় পঞ্চাশ ডলার ; চতুর্থ তিরিশ ডলার ; পঞ্চম বিশ ডলার ; ষষ্ঠ বারো ডলার ; সপ্তম আট

ডলার ; আর অষ্টম চার ডলার ; চীন ছাড়া সাগর শসার অল্প করে চালান যায় ম্যানিলা, সিঙ্গাপুর, আর বাটাভিয়ায়।'

চুক্তি হয়ে যাবার ফলে, জায়গা পরিষ্কার করে ঘর তৈরির জিনিসপত্র নামাতে লাগলাম আমরা। সমতল বড় একটা জায়গা বাছাই করা হলো পুব উপকূলে, যেটা সাগর শসা পাওয়া যায় এমন প্রধান শৈলশ্রেণীগুলোর ভালো যোগাযোগের আওতায়, আবার প্রচুর কাঠ আর পানি মেলে। এবার আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ শুরু করে দিলাম আমরা সবাই, আর অসভ্যদের ভীষণ অবাক করে দিয়ে, শিগগিরই কেটে ফেললাম অনেকগুলো বড় বড় গাছ। অসভ্যদের নিয়োজিত করা হলো কাঠামো তৈরির কাজে, আর দুই-তিন দিনের মাঝেই কাজ এতটা এগিয়ে গেল যে পরিকল্পনামাফিক যে তিনজনকে আমরা দ্বীপে রেখে যেতে চেয়েছিলাম, বাদবাকি কাজের ভার নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিতে পারলাম সেই জন কারসন, আলফ্রেড হ্যারিস, আর পিটারসনের (আমার মনে হয়, তিনজনই লন্ডনের অধিবাসী) ওপর।

মাসের শেষাশেষি যাত্রার সব প্রস্তুতিই সম্পন্ন হয়ে গেল। টু-উইট্ জিদ করতে লাগল যে বিদায়ের আগে আমরা আরেক বার তাদের গ্রামে যেতে চেয়েছিলাম, আর আমরাও রাজি হলাম, কারণ, সর্দারকে অযথা চটানোটা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেসময় আমাদের কেউ অসভ্যদের নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেনি। তারা সবাই আমাদের সঙ্গে দিনের পর দিন ভালো ব্যবহার করেছে, সব কাজে বাড়িয়ে দিয়েছে সাহায্যের হাত, তাদের নানারকম পণ্যদ্রব্য দিয়েছে বিনে পয়সায়, আর কখনোই আমাদের কোনো জিনিস চুরি করেনি, যদিও আমাদের জিনিসগুলো ছিল তাদের চোখে দামি, আমাদের কাছ থেকে যে কোনো উপহার পেলে তাদের চেহারা এমন আনন্দিত হয়ে উঠত যে ব্যাপারটা বুঝতে মোটেই অসুবিধে হতো না। বিশেষ করে তাদের মেয়েরা ছিল খুবই ভদ্র, মোট কথা, অসভ্যেরা আমাদের সঙ্গে এতটাই ভালো ব্যবহার করেছিল যে তাদের কাউকে অবিশ্বাস করলে আমরাই হতাম মানুষ হিসেবে সবচেয়ে সন্দেহপ্রবণ। অথচ কিছুদিনের মধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেল যে আপাত ওই চমৎকার আচরণের আড়ালে ছিল আমাদের ধ্বংস করার সুগভীর ষড়যন্ত্র, যে দ্বীপবাসীদের আমরা এত বড় চোখে দেখেছি, আসলে তারা ছিল পৃথিবীর অন্যতম এক নৃশংস, ধূর্ত, আর রক্তপিপাসু জঘন্য জাতি।

পহেলা ফেব্রুয়ারি আমরা তীরে নামলাম তাদের গ্রামে যাবার উদ্দেশ্যে। আর, তাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করলেও, সাবধানতা

অবলম্বনের কোনোরকম ঘাটতি আমরা রাখলাম না। ছয়জন নাবিককে স্কুনারে রাখা হলো এই আদেশ দিয়ে যে আমাদের অনুপস্থিতিতে কোনো অজুহাতেই অসভ্যদের কাউকে তারা জাহাজে উঠতে দেবে না, আর নিজেরা সবসময়ই থাকবে ডেকের ওপর। তারের জালে ঢেকে ফেলা হলো জাহাজের চারপাশ, গুলি আর গোলা ভরা হলো প্রত্যেকটা বন্দুক আর কামানে। জাহাজের নোঙর ফেলা হলো উপকূল থেকে মাইলখানেক দূরে, ফলে যেদিক থেকেই কোনো ক্যানু আসুক না কেন চোখ ফাঁকি দিয়ে আসতে পারবে না, আর সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যাবে আমাদের কামানের আওতায়।

ছয়জনকে জাহাজে রাখায় সবসুদ্ধ আমাদের দলে মানুষ হলো বত্রিশজন। যতরকমে সশস্ত্র হওয়া সম্ভব হলাম আমরা – সঙ্গে থাকল মাস্কেট, পিস্তল, খঞ্জর, আর নাবিকদের বিশেষ এক ধরনের লম্বা ছুরি, যেটা দেখতে অনেকটা আমাদের পশ্চিম আর দক্ষিণের দেশগুলোতে ইদানীং বহুল ব্যবহৃত বোয়ি ছুরির মতো। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে উপস্থিত একশো কালো চামড়ার যোদ্ধা। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, তাদের কারো কাছে কোনো অস্ত্র নেই। টু-উইটকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় সে জবাব দিল – ম্যাটি নন উই পাপা সি, যার অর্থ, যেখানে সবাই ভাই ভাই সেখানে অস্ত্রের কোনো প্রয়োজন নেই। কথাটা শুনে খুব খুশিমনে রওনা দিলাম আমরা।

সেই রঙিন পানির ঝরনা আর স্রোতস্বিনী পেরিয়ে ঢুকে পড়লাম আমরা সরু একটা গিরিখাতে, দুই পাশে সোপস্টোনের (Soapstone) পাহাড় যার ভেতর দিয়ে এগোলে পাহাড়ের মাঝেই পাওয়া যাবে গ্রামটা। গিরিখাতটা খুবই পাথুরে আর এবড়োখেবড়ো, ওটার ভেতর দিয়ে প্রথম বার ক্লক-ক্লক গ্রামে যেতেও আমাদের বেশ অসুবিধে হয়েছিল। গিরিখাতটা দেড় মাইল মতো লম্বা হবে, কিংবা দুই মাইল। একবার এদিকে একবার ওদিকে বাঁক নিয়ে এগিয়ে গেছে, বিশ গজ মতো এগোতে না এগোতেই হঠাৎ নিয়েছে একটা করে মোড়। এই গিরিখাতের দুই পাশ বরাবর খাড়া উঠে গেছে সত্তর থেকে আশি ফুট, আর দু-একটা জায়গায় সেই উচ্চতা এতই বেশি যে সেখানে দিনের আলো পৌঁছতে পারে না বললেই চলে। গিরিখাতটা গড়পড়তা চল্লিশ ফুট মতো চওড়া, কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় এত সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে, যেখানে পাশাপাশি পাঁচ-ছয়জন মানুষ চলাচল করাই কঠিন। মোট কথা, আক্রমণের উদ্দেশ্যে ওত পেতে থাকার জন্যে

পৃথিবীতে এটার চেয়ে উপযুক্ত জায়গা বুঝি আর হয় না, তাই এমন একটা জায়গায় ঢোকার আগে নিজেদের অস্ত্রগুলো আমরা যে একবার করে ভালোভাবে দেখে নেব এটা খুবই স্বাভাবিক। আজ ভাবলে অবাক হই, সামনে এবং পেছনে এতগুলো অপরিচিত অসভ্যদের নিয়ে সেখানে যাবার মতো মারাত্মক ভুল আমরা সেদিন করেছিলাম কীভাবে। অথচ তা-ই করেছিলাম আমরা ; নিজ দলের শক্তির ওপর নির্ভর করে, টু-উইট আর তার দলের লোকদের নিরস্ত্র থাকার ভরসায়, আমাদের আগ্নেয়াস্ত্রের নিশ্চিত সাফল্যের বিশ্বাসে, আর শয়তান আদিবাসীগুলোর বন্ধুত্বের সুদীর্ঘ ভানে, নিতান্ত নির্বোধ আমরা পা বাড়িয়েছিলাম অন্ধের মতো। তাদের পাঁচ-ছয়জন কঠিন অভিনয়ে সবাইকে ভুলিয়ে পথের বড় বড় পাথর আর অন্যান্য জঞ্জাল সরাতে সরাতে চলল সামনে সামনে। তার পেছনে আমাদের দল। কোনোভাবেই যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে না যাই, তাই চললাম আমরা গা ঘেঁষে ঘেঁষে। অস্বাভাবিক শৃঙ্খলার সঙ্গে আমাদের পেছনে পেছনে এল অসভ্যদের মূল দল।

ডার্ক পিটার্স, উইলসন অ্যালেন নামের একজন, আর আমি চলেছি দলের ডানে, যেতে যেতে লক্ষ করছি গিরিখাতের খাড়া দুই পাশের আজব স্তরবিন্যাস। নরম পাহাড়ের গায়ে একটা ফাটল আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একজন মানুষ ঢোকার মতো জায়গা রয়েছে সেখানে ফাটলটা পাহাড়ের ভেতরেই সোজা চলে গেছে আঠারো থেকে বিশ ফুট, তারপর ঢালু হয়ে নেমে গেছে বামপাশে। ফাটলটার উচ্চতা হবে সম্ভবত ষাট থেকে সত্তর ফুট। খাঁজের দু-একটা ঝোপে জন্মেছে বাদামের মতো একটা ফল। কৌতূহলী হয়ে ভেতরে ঢুকে, একটানে পাঁচ-ছয়টা বাদাম ছিঁড়ে নিয়ে ঘুরতেই দেখি, পেছনে পেছনে এসেছে পিটার্স আর অ্যালেন। ফাটলের ভেতরে পাশাপাশি দুজনেরও চলাচল করার জায়গা ছিল না বলে, ফিরে যেতে বললাম তাদের, জানালাম বাদামের ভাগ তাদেরও দেব। আমার কথা মেনে ফেরার জন্যে তৎক্ষণাৎ ঘুরল দুজনেই, অ্যালেন ফাটলমুখের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, এমন সময় হঠাৎ আমার কানে এল ভয়াবহ এক শব্দ – যেরকম শব্দ আমি জীবনে কখনো শুনিনি, সমস্ত অনুভূতি যেন প্রায় লোপ পেয়ে গেল, ভাসাভাসাভাবে কেবল বুঝতে পারলাম, পৃথিবীর ভিতটা যেন চিরে দুই ফাঁক হয়ে গেছে, রোজ কেয়ামতের আর মোটেই দেরি নেই।

অধ্যায় ২১

লোপ পাওয়া বুদ্ধিসুদ্ধি কিছুটা ফিরে পেতে দেখলাম, আমার দম প্রায় বন্ধ হবার জোগাড়, নিরেট অন্ধকারে আমি হাতড়াচ্ছি আলগা কিছু মাটির মাঝে, ওপরের সবদিক থেকে প্রবল বেগে ঝরে পড়ছে ঝুরো মাটি, যেন আমাকে জ্যান্ত কবর দেবে। চিন্তাটা মাথায় আসামাত্র মহাআতঙ্কে শিরদাঁড়া ঠান্ডা হয়ে গেল, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াতে চাইলাম আমি, আর শেষমেশ পারলাম। তখন কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বোঝার চেষ্টা করলাম, ঘটনাটা কী ঘটেছে, আর আমি রয়েছিই বা কোথায়। হঠাৎ কানে এল একটা গোঙানির শব্দ, দম আটকে আসার মতো একটা গলায় ঈশ্বরের নামে আমার কাছে সাহায্য চাইছে পিটার্স। হাতড়াতে হাতড়াতে দু-এক ধাপ এগোতেই, পড়ে গেলাম আমার সঙ্গীর মাথা আর কাঁধের ওপর ; নরম মাটিতে কোমর পর্যন্ত পুঁতে যাবার পর মরিয়া হয়ে উঠে আসার চেষ্টা করছে সে। চারপাশের মাটি সরিয়ে, সর্বশক্তিতে টান মেরে তাকে বের করে আনতে পারলাম মাটির ভেতর থেকে।

আতঙ্ক আর বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে আমরা স্বাভাবিক আলাপ করার মতো অবস্থা ফিরে পেলাম আর শেষমেশ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে আমরা যে ফাটলে ঢুকেছি, প্রাকৃতিক কোনো কম্পনে, বা সম্ভবত নিজের ওজনেই তার দেয়ালগুলো বসে গেছে নিচের দিকে, আর আমাদের জ্যান্ত কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। দীর্ঘ সময় এমন তীব্র যন্ত্রণা আর হতাশা ভোগ করলাম আমরা, যা ঠিক এই অবস্থায় না পড়লে কেউই বুঝতে পারবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষের জীবনে যতরকমের ঘটনাই ঘটুক না কেন, তার কোনোটাই জ্যান্ত কবর হয়ে যাবার চেয়ে শারীরিক আর মানসিক যন্ত্রণা দিতে পারে না। ভুক্তভোগীকে চারপাশ থেকে চেপে ধরে নিরেট অন্ধকার, শ্বাসকষ্টে ফেটে যেতে চায় ফুসফুস, স্যাঁতসেঁতে মাটির দূষিত গন্ধ ঝাপটা মারে নাকে, মিলিয়ে যায় উদ্ধার পাবার

বিন্দুমাত্র আশা, জীবিত অবস্থায় সে হয়ে যায় মৃতের খানিক অংশ – অনুভূতিটা মানুষের মনে এমন মাত্রার এক আতঙ্ক জাগিয়ে তোলে, যা সহ্য করা অসম্ভব, ধারণা করা অকল্পনীয়।

অবশেষে পিটার্স বলল যে এখান থেকে মুক্তি পাবার একটা চেষ্টা করতেই হবে, সম্ভাবনা খুব কম হলেও কোথাও কোনো ফাঁক এখনো রয়ে যেতে পারে। তার কথায় আশা জাগল আমার মনে, আলগা মাটির স্তূপ থেকে বেরিয়ে এগোবার চেষ্টা করলাম। একধাপ বাড়াতে না বাড়াতেই চোখে পড়ল ক্ষীণ একটা আলো, যার অর্থ, এই মুহূর্তে আমাদের অন্তত বাতাসের অভাবে দম আটকে মরতে হবে না। সাহস খানিকটা ফিরে এল, একে অপরকে আশ্বাস দিলাম আমরা। হামাগুড়ি দিয়ে জঞ্জালের একটা স্তূপের ওপর উঠতেই ফুসফুসের দপদপানি অনেকটা কমে এল। আবছাভাবে চোখে পড়তে লাগল চারপাশের জিনিস, বুঝতে পারলাম যে আমরা ফাটলটার সোজা অংশের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি, এরপরেই সেটা বামে মোড় নিয়েছে। আর কয়েকবার চেষ্টা করতেই আমরা পৌঁছে গেলাম বাঁকের কাছে, সেখান থেকে লম্বা একটা ফাটল ওপর দিকে উঠে গেছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করে। ফাটলটা পুরোপুরি দেখতে পেলাম না ; কিন্তু, যেহেতু ওদিক দিয়ে বেশকিছুটা আলো এসে পড়েছে এখানে, মনে তেমন সন্দেহ রইল না যে কোনোভাবে ওপরে উঠতে পারলে বাইরের খোলা বাতাসে বেরিয়ে যাবার মতো একটা পথ পেয়ে যাব আমরা।

এতক্ষণে মনে পড়ল যে মূল গিরিখাত থেকে আমরা তিনজনে ঢুকে পড়েছিলাম এই ফাটলে, আর আমাদের সঙ্গী অ্যালেনের এখনো কোনো খোঁজ আমরা পাইনি ; তাই তক্ষুনি আমরা ঠিক করলাম যে পেছনে ফিরে গিয়ে তার অনুসন্ধান করতে হবে। দীর্ঘ সময় অনুসন্ধান চালালাম আমরা, সবসময় ভয় করতে লাগল আবার ওপর থেকে মাটি ভেঙে পড়তে পারে, অবশেষে চিৎকার করে পিটার্স বলল যে সে আমাদের সঙ্গীর একটা পা চেপে ধরেছে, আর তার পুরো শরীর পুঁতে গেছে জঞ্জালের ভেতরে, বের করতে পারার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। শিগগিরই বুঝতে পারলাম পিটার্সের কথার সত্যতা, অনেক আগেই মারা গেছে অ্যালেন। সুতরাং দুঃখভারাক্রান্ত মনে তাকে নিয়তির হাতে ছেড়ে দিয়ে, আবার আমরা এগিয়ে চললাম বাঁকের দিকে।

দু-একবার ওপরে ওঠার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে, আবার আমাদের পেয়ে বসতে লাগল হতাশা। আগেই বলেছি, গিরিখাতটা সোপস্টোনের মতো নরম

পাথরে তৈরি। আমরা যে ঢাল বেয়ে ওঠার চেষ্টা করলাম সেটাও ওই একই বস্তুতে তৈরি, ভিজে এমনভাবে পিছল হয়ে গেছে যে পা রাখাই কঠিন ; আর কোথাও কোথাও এত খাড়া, মনে হলো, এটা বেয়ে আমরা উঠতেই পারব না। যাই হোক, হতাশাই শেষমেশ আমাদের সাহস জোগাল ; বোয়ি ছুরি দিয়ে ধাপ কেটে কেটে উঠতে লাগলাম আমরা ওপরে, আর ফাটলের শেষ প্রান্তের একটা সমতল জায়গায় পৌঁছতে চোখে পড়ল একখণ্ড নীল আকাশ। সামান্য দম নিয়ে পেছন ফিরতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ফাটলটা সদ্য সৃষ্টি হয়েছে, আর প্রচণ্ড যে আলোড়নের শব্দ আমাদের হতভম্ব করে দিয়েছিল, সেটাই আবার খুলে দিয়েছে বেরোবার পথ। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, অবসন্ন ভাবটা কেটে যাবার পর পিটার্স বলল, মাস্কেট আর খঞ্জর ঝুরো মাটির মাঝে হারিয়ে ফেললেও আমাদের কোমরে এখনো পিস্তল গোঁজা আছে, সুতরাং পিস্তলের গুলি ছুড়ে বন্ধুদের জানান দিই, আর তারা এসে আমাদের উদ্ধার করুক। কিন্তু এই দুর্ঘটনাটার পেছনে অসভ্যদের হাত আছে এমন একটা সন্দেহ মনে জাগায় কাজটা করা থেকে বিরত থাকলাম দুজনে, কারণ, পিস্তলের গুলি ছোড়ার অর্থ হবে অসভ্যদের কাছে আমাদের অবস্থান প্রকাশ করে দেওয়া। পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করেছে, সেদিন গুলি ছুড়লে আমাদের আর বাঁচতে হতো না।

ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নেওয়ার পর গিরিখাত বয়ে ধীরে ধীরে আমরা উঠতে লাগলাম ওপর দিকে, আর খানিকটা যেতেই কানে ভেসে এল পরপর কয়েকটা আর্তনাদ। খুব সাবধানে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম সরু একটা খোলা জায়গায়, যেখান থেকে আশপাশের পুরো অঞ্চলটা দেখা যায়, আর সেখান থেকে তাকাতেই আমাদের কাছে উদঘাটিত হয়ে গেল ভয়াবহ সেই শব্দের ভয়ংকর রহস্য।

আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি সোপস্টোনের পাহাড়শ্রেণীর সবচেয়ে উঁচু চূড়াটার কাছাকাছি। আমাদের বত্রিশজনের দলটা যে গিরিখাতের ভেতরে ঢুকেছিল, সেটা এখান থেকে বামপাশে মাত্র পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে। কিন্তু বর্তমানে গিরিখাতটার চিহ্নমাত্র নেই, চাপা পড়ে গেছে ওটা লাখ লাখ টন মাটি, পাথর, আর জঞ্জালের নিচে, তবে কীভাবে ঘটানো হয়েছে এই প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা, সেই চিহ্ন রয়ে গেছে এখনো। প্রান্ত থেকে দশ ফুট মতো পেছনে, বড়জোর একগজ অন্তর অন্তর, কাঠের খুঁটি পোঁতা হয়েছে মোটামুটি তিনশো ফুট জায়গা জুড়ে, তারপর একটার সঙ্গে আরেকটার সংযোগ রক্ষা করে, খুঁটিগুলোকে বাঁধা হয়েছে শক্ত আঙুরলতা দিয়ে। সোপস্টোনের পাহাড়গুলোর

আজব স্তরবিন্যাসের কথা ইতিমধ্যেই বলেছি, প্রাকৃতিক যে কোনো আলোড়নেই নরম এই পাথরে ফাটল সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে – যেমন একটা ফাটল সৃষ্টি হবার ফলেই আমরা দুজন জ্যান্ত কবরের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছি। এবং আজব এই স্তরবিন্যাসেরই সুযোগ নিয়েছে নৃশংস অসভ্যেরা। প্রথমে অনেকগুলো খুঁটি পুঁতে তারা একটা ফাটল সৃষ্টি করেছে পাহাড়ের গায়ে, তারপর আগে থেকে নির্দিষ্ট একটা সঙ্কেত পাওয়ামাত্র লতা ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে, পাহাড়ের একটা পাশ ধসিয়ে নামিয়ে দিয়েছে নিচের গিরিখাতে। আমাদের হতভাগ্য সঙ্গীদের পরিণতির ব্যাপারে সমস্ত অনিশ্চয়তা দূর হয়ে গেল। আমরা দুজনই কেবল রেহাই পেয়েছি সেই ভয়াবহ ধ্বংসের কবল থেকে। আমরা দুজনই কেবল এখন এই দ্বীপের জীবিত সাদা চামড়ার মানুষ।

অধ্যায় ২২

জ্যান্ত কবর হয়ে গেল ভেবে পরিস্থিতিকে যতটা ভয়ংকর কল্পনা করেছিলাম, বর্তমান পরিস্থিতি তার চেয়ে কোনো অংশে কম ভয়ংকর নয়। এখন হয় আমাদের অসভ্যদের হাতে মরতে হবে, নয়ত তাদের বন্দী হয়ে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে শোচনীয়ভাবে। এটা নিশ্চিত যে শয়তানদের চোখ ফাঁকি দিয়ে আমরা লুকিয়ে থাকতে পারি এই পাহাড়শ্রেণীর সুরক্ষিত আড়ালে বা শেষ উপায় হিসেবে আশ্রয় নিতে পারি সেই গহ্বরে যেখান থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি এইমাত্র ; কিন্তু সেক্ষেত্রে হয় আমাদের মরতে হবে দীর্ঘ মেরু শীতের ঠান্ডা আর অনাহারে, নয়ত শেষমেশ ধরা পড়তে হবে গরম কোনো আশ্রয় বা খাবার খুঁজতে গিয়ে।

আমাদের চারপাশের অঞ্চল এখন ছেয়ে গেছে অসভ্য মানুষে, নিশ্চয় দক্ষিণের দ্বীপগুলো থেকে ভেলায় চড়ে এসেছে তারা জেন গাই দখল আর লুটে সাহায্য করতে। জাহাজটা যেমন ছিল তেমনই শান্তভাবে নোঙর করা আছে, নাবিক ছয়জন বুঝতেও পারছে না কী ভয়ংকর বিপদ ওত পেতে আছে তাদের জন্যে। এইসময় তাদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেওয়ার জন্যে কী যে আকুলতা শুরু হলো আমাদের ভেতরে ! মনে হলো, এক্ষুণি গিয়ে হয় তাদের বাঁচার ব্যবস্থা করি, নয়ত অসভ্যদের বিপক্ষে লড়াইয়ে সবাই মরি একসঙ্গে। তাদের সাবধান করে দেওয়ারও কোনো উপায় খুঁজে পেলাম না, সাবধান করতে গেলে আমাদের দুজনেরই জীবন যাবে, কিন্তু তাতে করে তাদের কোনো লাভ হবে না। পিস্তলের গুলি ছুড়লে তারা বুঝতে পারবে যে গোলমাল কিছু একটা ঘটেছে, কিন্তু এটা বুঝবে না যে এই গোলমালের হাত থেকে রেহাই পাবার একমাত্র পথ হলো এক্ষুণি নোঙর তুলে এখান থেকে পালানো, কিংবা তাদের সঙ্গীরা কেউই আর এখন জীবিত নেই। গুলির শব্দ শুনিয়ে তাদের লড়াইয়ের প্রস্তুতির কথাটাও বোঝানো যাবে না যে অনেকদিন

যাবৎ অপেক্ষমাণ শত্রুরা এখন আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে। সুতরাং কোনো উপকারই তাদের করা যাবে না দেখে পিস্তলের গুলি ছোড়ার পরিকল্পনাটা আমরা ত্যাগ করলাম।

তারপর আমরা ভাবলাম, আচমকা ছুটে গিয়ে একটা ক্যানু দখল করে, সোজা জাহাজে গিয়ে উঠি। কিন্তু ব্যাপারটা যে অসম্ভব তা বুঝতে আমাদের দেরি হলো না। আগেই বলেছি, পুরো অঞ্চলটা ছেয়ে গেছে অসভ্য মানুষে, ঝোপের আড়ালে আর পাহাড়ের খাঁজেও ওত পেতে আছে তারা, যেন স্কুনার থেকে দেখা না যায়। এবং মূল যে পথটা দিয়ে আমরা উপকূলে যাবার কথা ভাবছি, ঠিক তার ওপরেই কালো চামড়া পরা যোদ্ধাদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সর্দার টু-উইট, অবশ্যই অপেক্ষা করছে কেবল আরও কিছু অসভ্য এসে যোগ দেওয়ামাত্র জেন গাইয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। ক্যানুগুলোতেও উঠে বসেছে অসভ্যেরা, নিরস্ত্র, কিন্তু অস্ত্র নিশ্চয় আশপাশেই আছে। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেখানে ছিলাম সেখানেই লুকিয়ে থেকে আমরা হলাম আসন্ন সংঘর্ষের নিছক দর্শক।

আধ ঘণ্টার মাঝেই দেখতে পেলাম, দক্ষিণ থেকে ষাট-সত্তরটা ভেলায় করে এসে উপস্থিত হলো দলে দলে আদিবাসী। অস্ত্র বলতে তাদের কাছে কাঠের খাটো গদা, আর ভেলার তলায় স্তূপ করে রাখা পাথর। শিগগিরই একই অস্ত্র নিয়ে উল্টো দিক থেকে এসে যোগ দিল আরও বড় একটা দল। এভাবে, লিখতে আমার যতক্ষণ সময় লাগল, বোধ হয় তারচেয়েও কম সময়ে, যেন জাদুমন্ত্রের মতো, জেন গাইকে ঘিরে ফেলল অসংখ্য হিংস্র আদিবাসী।

জাহাজ দখলে তারা যে সফল হবে সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই ছিল না। জাহাজে থাকা মাত্র ছয়জন নাবিকের পক্ষে এতগুলো অসভ্যের সঙ্গে পেরে ওঠা অসম্ভব, তা সে যত দুঃসাহসিক প্রতিরোধই তারা গড়ে তুলুক না কেন। সত্যি বলতে কী, তারা কোনোরকম বাধা দিতে পারবে সেটাও আমার মনে হয়নি। কিন্তু জাহাজ ঘুরিয়ে, ক্যানুগুলোর মুখোমুখি হয়ে, গোলাগুলি ছুড়তে লাগল তারা, ভেলাগুলো তখন প্রায় সিকি মাইল দূরে। যাই হোক, অজানা কোনো কারণে, খুব সম্ভবত নিরাশাজনক পরিস্থিতির উত্তেজনায়, আমাদের বন্ধুদের আক্রমণ পুরোপুরি ব্যর্থ হলো। কোনো ক্যানুতেই গোলাগুলি আঘাত হানল না, কিংবা আহত হলো না একজনও অসভ্য, গোলাগুলি হয় তাদের আগেই পানিতে পড়ল নয়ত চলে গেল মাথার ওপর দিয়ে। প্রতিক্রিয়া বলতে, অপ্রত্যাশিত শব্দ শুনে আর ধোঁয়া দেখে

তারা এতটাই অবাক হলো যে কিছুক্ষণের জন্যে আমার মনে হলো, অসভ্যেরা বোধ হয় লড়াই ফেলে পালাবে। আমাদের নাবিকেরা যদি আক্রমণ অব্যাহত রাখত, তাহলে হয়ত সত্যিই পালিয়ে যেত তারা, কারণ, ক্যানুগুলো ততক্ষণে কাছে এসে পড়ায় গোলাগুলি আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো না। কিন্তু, তা না করে, নাবিকেরা জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে নিল ভেলাগুলোর দিকে, এবং সেই সুযোগে ক্যানুর অসভ্যেরা তাদের প্রাথমিক ভয় আর বিস্ময় কাটিয়ে উঠল।

এবার কামানের গোলার প্রতিক্রিয়া হলো ভয়ংকর। সাত-আটটা ভেলা টুকরো টুকরো হয়ে গেল, ত্রিশ থেকে চল্লিশজন অসভ্য মারা পড়ল তৎক্ষণাৎ, অন্তত একশোজন পানিতে ছিটকে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগল, যাদের বেশির ভাগই মারাত্মকভাবে আহত। বাদবাকিগুলো ছুটে পালাল আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে, পানিতে পড়ে আর্তনাদ করা আহত সঙ্গীদের দিকে ফিরেও তাকাল না। দুঃখের বিষয়, এই সাফল্য এল বড় দেরিতে। নতুন করে বারুদে আগুন দেওয়ার সময়ও বেচারিরা আর পেল না, ক্যানুর দেড়শোজনেরও বেশি অসভ্য উঠে পড়ল জাহাজে, আর আদিম ক্রোধে ছয় নাবিককেই একেবারে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল।

এই দৃশ্য দেখে, ভেলার অসভ্যেরাও তাদের আতঙ্ক কাটিয়ে হইচই করে উঠে পড়ল জাহাজে। মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে শোচনীয় এক ধ্বংসলীলার শিকার হলো জেন গাই। ডেক কেটে খানখান হয়ে গেল, দড়িদড়া, পালের চিহ্নমাত্র রইল না। তারপর হাজার হাজার অসভ্য জাহাজটাকে টানতে টানতে তীরে নিয়ে গিয়ে, তুলে দিল টু-উইটের হাতে। এতক্ষণ দক্ষ একজন সেনাপতির মতোই পাহাড়ের নিরাপত্তায় বসে সবকিছু লক্ষ করছিল সে, জয় সম্পূর্ণ হতে কালো চামড়ার পোশাক পরা যোদ্ধাদের নিয়ে এবার সে নেমে এল নিচে, আর গ্রহণ করল লুটের ভাগ।

টু-উইট তার দলবলসহ পাহাড় থেকে নেমে যাওয়ায়, লুকানোর জায়গাটা ছেড়ে আশপাশ ঘুরে দেখার একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম আমরা। গহ্বরমুখের গজ পঞ্চাশেকের মধ্যেই ছোট একটা ঝরনা দেখে পিপাসা মিটিয়ে নিলাম দুজনে। ঝরনা থেকে খানিকটা দূরেই দেখলাম সেই বাদাম ঝোপ, যে বাদামগুলোর কথা আগেই বলেছি। কয়েকটা বাদাম মুখে দিয়ে বেশ ভালোই লাগল, অনেকটা ইংল্যান্ডের বাদামের মতোই। আমাদের হ্যাট বাদামে ভরতি করে, গিরিখাতে লুকিয়ে রেখে, ফিরে এলাম আরও বাদাম নেওয়ার জন্যে। ব্যস্ত হয়ে বাদাম সংগ্রহ করছি, হঠাৎ ঝোপের ভেতরে

একটা খসখস শব্দ শুনে চমকে উঠে কেবল দ্রুতপায়ে ফিরে আসতে চাইছি আমাদের লুকাবার জায়গায়, এমন সময় ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল বিটার্ন জাতের বড় একটা কালো পাখি। আমার উপস্থিত বুদ্ধি কাজ করেনি, কিন্তু পাখিটা উড়ে উঠবার আগেই ছুটে গিয়ে ওটার গলা চেপে ধরল পিটার্স। ডানা ঝাপটাতে লাগল পাখিটা আর এমন তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়ল যে মনে হলো, ওটাকে ছেড়ে দেওয়াই ভালো, পাছে আশপাশে লুকিয়ে থাকা কোনো অসভ্য চিৎকারটা শুনে ফেলে। যাই হোক, বোয়ি ছুরি চালিয়ে ওটাকে খতম করে দিল পিটার্স, আর আমরা পাখিটাকে টেনে নিয়ে গেলাম গিরিখাতের ভেতরে। যাক, পরিস্থিতি যেমনই হোক, এই খাবারে আমাদের অন্তত একটা সপ্তাহ চলে যাবে।

পাহাড়ের দক্ষিণ ঢাল পর্যন্ত আরও খানিকটা খোঁজাখুঁজি করলাম আমরা, কিন্তু আর কোনো খাবার পেলাম না। তাই কিছু শুকনো কাঠ নিয়ে যখন ফিরে আসছি, দেখলাম, অসভ্যদের দু-একটা বড় দল গ্রামে ফিরছে জাহাজের লুটের মাল নিয়ে। ভয় লাগল, শয়তানেরা আমাদের দেখে ফেলতে পারে পাহাড়ের নিচ দিয়ে যাবার সময়।

এবার নজর দিলাম আমাদের নিরাপত্তার দিকে। যে গর্তটার ভেতর থেকে আমরা নীল আকাশ দেখতে পেয়েছিলাম, সেটার মুখের ওপর বিছিয়ে দিলাম কয়েকটা ভাঙা ডাল, আর সেখানে রাখলাম এমন একটা ফাঁক, যেদিক দিয়ে আমরা অববাহিকার দিকটা দেখতে পেলেও বাইরে থেকে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। নিরাপত্তার বিষয়ে সন্তুষ্ট হলাম দুজনেই, যতক্ষণ না এই গিরিখাত ছেড়ে পাহাড়ে যাচ্ছি কারো পক্ষে আমাদের আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। আপাতত ফাঁক দিয়ে অসভ্যদের কার্যকলাপ দেখতে লাগলাম আমরা।

শয়তানের দল ইতিমধ্যেই জাহাজটাকে ধ্বংস করে ফেলেছে, এখন সেটায় আগুন ধরিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেইন হ্যাচওয়ে দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে দেখলাম আমরা, আর তারপরেই ফোকাসল থেকে ওপর দিকে লাফিয়ে উঠল আগুনের একটা লেলিহান শিখা। দড়িদড়া, মাস্তুল, পালের অবশেষে ধরার পর আগুন ছড়িয়ে পড়ল ডেকে। তখনো অনেক অসভ্য বড় বড় পাথর, কুড়াল, আর কামানের গোলা দিয়ে দমাদম পিটছে খিল, বল্টু, এবং অন্যান্য লোহা আর তামার জিনিসপত্র। স্কুনারের আশপাশে সাগরতীরে, ক্যানু আর ভেলাতেও অসভ্যের সংখ্যা দশ হাজারের কম হবে না, যাদের অনেকে লুটের মাল নিয়ে রওনা

দিয়েছে নিকটবর্তী দ্বীপগুলোর উদ্দেশ্যে। ভয়ংকর একটা বিপর্যয়ের অপেক্ষায় রইলাম আমরা, এবং হতাশও হতে হলো না। প্রথমে একটা ধাক্কা খেলাম, কিন্তু চোখে পড়ল না বিস্ফোরণের কোনো চিহ্ন। অসভ্যেরাও চমকে উঠে মুহূর্তের জন্যে থামাল তাদের জাহাজ পিটানো আর চিৎকার। তারপর শয়তানেরা আবার যখন শুরু করতে যাচ্ছে তাদের কাজ, হঠাৎ ডেকের ওপর থেকে পাক খেতে খেতে বেরিয়ে এল কালো ঝোড়ো মেঘের মতো ধোঁয়া – তারপর যেন জাহাজের পেট থেকে বেরিয়ে, সিকি মাইল ওপরে ঝাঁপিয়ে উঠল আগুনের এক সুবিশাল শিখা – তারপর আগুন ছড়িয়ে পড়ল গোল হয়ে – প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুরো বায়ুমণ্ডল যেন ভরে গেল কাঠ, ধাতু, আর মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এক বিশৃঙ্খল আবর্জনায় – এবং সবশেষে ভেসে এল বিস্ফোরণের কানফাটানো শব্দ, অত দূরে থাকা সত্ত্বেও আমরা ছিটকে পড়ে গেলাম মাটিতে, পাহাড়শ্রেণীটাই কেঁপে উঠল থরথর করে, ধ্বংসস্তূপের অসংখ্য খুদে বস্তুকণা ঘন বৃষ্টির মতো ছুটে গেল আমাদের চারপাশ দিয়ে।

বিশ্বাসঘাতকতার যে শাস্তি পেল অসভ্যেরা, তা আমাদের সুদূর প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেল। বিস্ফোরণে খতম হয়ে গেল সম্ভবত এক হাজার অসভ্য, আর বিশ্রীভাবে পঙ্গু হয়ে গেল ওই একইসংখ্যক। পুরো উপকূলটা ভরে গেল হাবুডুবু খাওয়া আর প্রাণভয়ে সাঁতার কাটা অসভ্যে। সাগরতীরের অবস্থা আরও শোচনীয়, এই মহাদুর্ঘটনার আকস্মিকতায় তারা এতটাই হতভম্ব হয়ে গেছে যে কেউ এগিয়ে যাচ্ছে না কারো সাহায্যে। অবশেষে হঠাৎ করেই তাদের আচরণে দেখা গেল আমূল পরিবর্তন। হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে তারা যেন উঠে গেল উত্তেজনার চরমে, তীরের নির্দিষ্ট একটা জায়গা থেকে ছোটাছুটি করতে লাগল এদিক-সেদিক, চেহারায় ফুটে উঠল আতঙ্ক, ক্রোধ, আর সুতীব্র কৌতূহলের এক অতি অদ্ভুত মিশ্র অভিব্যক্তি, একইসঙ্গে গলা ফাটিয়ে সবাই চেঁচাল তারা – টেকেলি-লি ! টেকেলি-লি !

এবার বড় একটা দল গেল পাহাড়ের ভেতরে, আর শিগগিরই ফিরে এল কাঠের খুঁটা নিয়ে। যেখানে অসভ্যেরা ভিড় করেছে সবচেয়ে বেশি সেখানেই এল তারা, আর জনতা ভাগ হয়ে যেতে আমরা দেখতে পেলাম উত্তেজনার বিষয়টা। সাদা কী যেন একটা পড়ে আছে মাটির ওপর, কিন্তু প্রথমে সেটাকে আমরা চিনতে পারলাম না। অবশেষে বুঝতে পারলাম, এটা হলো টকটকে লাল দাঁত আর লাল নখঅলা সেই আজব প্রাণীর মৃতদেহ যেটাকে সাগর থেকে স্কুনারে তুলে নেওয়া হয়েছিল জানুয়ারির আঠারো তারিখে। ক্যাপটেন গাই ওটাকে রেখে দিয়েছিল স্টাফ করে ইংল্যান্ডে নিয়ে

খাবার জন্যে। আমার মনে আছে, এই দ্বীপে পৌঁছার ঠিক আগে ওটার সম্বন্ধে কী যেন নির্দেশ দিয়েছিল ক্যাপটেন গাই, তাই মৃতদেহটাকে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল কেবিনের একটা লকারে। বিস্ফোরণের ফলে ওটা ছিটকে গিয়ে পড়েছে তীরের ওপর ; কিন্তু ওটাকে নিয়ে অসভ্যেরা এত মাতামাতি করছে কেন বুঝে উঠতে পারলাম না। মৃতদেহটাকে ঘিরে থাকলেও একটা দূরত্ব বজায় রেখেছে তারা, কেউই যেন ওটার কাছে আসতে চাইছে না। শিগগিরই খুঁটা নিয়ে আসা অসভ্যেরা ওটাকে ঘিরে খুঁটাগুলো পুঁতল গোল করে, আর, কাজটা শেষ হতেই, অসভ্যদের পুরো দলটা ছুটে গেল দ্বীপের ভেতরদিকে, সেইসঙ্গে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল – টেকেলি-লি ! টেকেলি-লি !

অধ্যায় ২৩

পরবর্তী ছয়-সাত দিন আমরা একরকম গর্ত ছেড়েই বেরোলাম না, কদাচিৎ খুব সাবধানে দু-একবার গেলাম কেবল পানি আর বাদাম আনতে। সমতল জায়গাটাকে আমরা তৈরি করে নিলাম একটা চিলেকোঠার মতো করে, পাতলাম শুকনো পাতার বিছানা, আর রাখলাম বড় বড় তিনটে চ্যাপটা পাথর, যেগুলো ফায়ারপ্লেস আর টেবিল দুটোরই কাজ চালাল। সহজেই আগুন জ্বাললাম আমরা দুই টুকরো কাঠ ঘষে, একটা নরম, আরেকটা শক্ত। যে পাখিটাকে ধরে নিয়ে এসেছিলাম, সেটার মাংস একটু শক্ত হলেও খেতে চমৎকার। ওটা মহাসাগরীয় কোনো মোরগ নয়, বিটার্ন জাতের পাখি, পালক ঘোর কালো আর ধূসর, শরীরের অনুপাতে ডানা অনেক ছোট। পরে গিরিখাতের পাশে এই জাতের আরও তিনটে পাখিকে উড়তে দেখেছি আমরা, কিন্তু সেগুলো মাটিতে এসে না বসায় ধরার কোনো সুযোগ পাইনি।

পাখির মাংসটা যতদিন ছিল আমাদের কোনো চিন্তা করতে হয়নি, কিন্তু মাংস ফুরিয়ে যেতে আবার খাবার জোগাড়ের প্রয়োজন দেখা দিল। বাদাম খেয়ে খিদে মেটে না, পেট কামড়ায়, আর ইচ্ছে মতো খেলে ভীষণ মাথা ধরে। পাহাড়ের পুবদিকের সৈকতে বেশ কয়েকটা বড় কচ্ছপ দেখেছি, আদিবাসীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সৈকতে নামতে পারলে সহজেই ধরা যাবে। এখনই একটা চেষ্টা আমরা অবশ্যই করব।

দক্ষিণের ঢাল বেয়ে একশো গজ মতো নামতেই পথরোধ করে দাঁড়াল সেই গিরিখাতের একটা শাখা যেখানে আমাদের অনেক সঙ্গীর জ্যান্ত কবর হয়ে গেছে। তবু ওটার প্রান্ত দিয়ে এগোলাম আমরা, কিন্তু সিকি মাইল মতো যেতে না যেতেই আবার পথরোধ করে দাঁড়াল অতল এক খাদ। ওটার প্রান্ত দিয়ে আর এগোতে না পারায়, বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম আমরা মূল গিরিখাতে।

এবার এগোলাম আমরা পুবদিকে, কিন্তু ভাগ্য কোনোরকম সহায়তা করল না। একঘণ্টার প্রাণান্তকর পরিশ্রমের পর কালো গ্র্যানাইটের বিরাট এক গর্তে নেমে আমরা দেখলাম, মেঝেতে ছড়ানো রয়েছে মিহি ধুলো, আর ওখান থেকে বের হবার একমাত্র পথ হলো, আমরা যে এবড়োখেবড়ো পথ বেয়ে নেমেছি, সেটাই। অতি কষ্টে ওই পথ ধরে ওপরে উঠে এবার আমরা গেলাম পাহাড়ের উত্তর প্রান্তে। এখানে আমাদের এগোতে হলো অত্যন্ত সাবধানে, কারণ, এতটুকু অসাবধান হলে গ্রাম থেকে অসভ্যেরা আমাদের পুরোপুরিই দেখে ফেলবে। কখনো হামাগুড়ি, আবার কখনো বুকে ভর দিয়ে, এগোলাম আমরা ঝোপঝাড়ের আড়ালে। কিন্তু এভাবে সামান্য যেতেই সামনে পড়ল এমন এক খাদ, যার চেয়ে গভীর কোনো খাদ আমরা জীবনে দেখিনি, আর খাদটা সরাসরি গিয়ে যুক্ত হয়েছে মূল গিরিখাতের সঙ্গে। সুতরাং আমরা যা আশঙ্কা করছিলাম তা-ই সত্য বলে প্রমাণিত হলো, নিচের পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে কোনো মতে ফিরলাম আমাদের সমতল সেই বাসস্থানে, পাতার বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে সুন্দর ঘুম দিলাম কয়েক ঘণ্টা ধরে।

এরপর তন্ন তন্ন করে খাবার খুঁজলাম পাহাড় চূড়ো জুড়ে, কিন্তু অস্বাস্থ্যকর সেই বাদাম ও বাজে একজাতের স্কার্ভি ঘাস ছাড়া আর কিছুই পেলাম না ; স্কার্ভি ঘাসটা জন্মেছে মাত্র চার রড (১ রড (Rod) = ৫$\frac{১}{২}$ গজ) বর্গাকারে, যা খুব শিগগির ফুরিয়ে যাবে। যতদূর মনে পড়ে, পনেরোই ফেব্রুয়ারি ঘাসের একটা ফলাও আর অবশিষ্ট রইল না, একেবারেই কমে গেল বাদামের সংখ্যা, ফলে আমাদের অবস্থা আবার শোচনীয় আকার ধারণ করল। ষোলো তারিখে আমাদের বন্দিশালার দেয়াল বরাবর আরেকটা চক্কর লাগালাম বেরোবার পথ খুঁজে পাবার আশায়, কোনো লাভ হলো না। এবার ক্ষীণ আশা নিয়ে নামলাম ধ্বংসের সেই ফাটলে, যদি চোখে পড়ে মূল গিরিখাতে যাবার কোনো পথ। আবারও হতাশ হতে হলো আমাদের, যদিও এ যাত্রায় নিয়ে আসতে পারলাম একটা মাস্কেট।

সতেরো তারিখে ঠিক করলাম, কালো গ্র্যানাইটের গর্তটা আরেকবার ভালোভাবে অনুসন্ধান করে দেখব আমরা। প্রথমবার ওটার ভেতরে একটা ফাটল চোখে পড়েছিল, অবশ্য কোনো পথ খুঁজে পাবার আশা আমরা করিনি।

প্রথম বারের মতোই গর্তের তলায় নামতে তেমন অসুবিধে হলো না, তাই ঠাণ্ডা মাথায় দেখতে লাগলাম ঘুরে ঘুরে। গর্তটার চেহারা খুবই আজব,

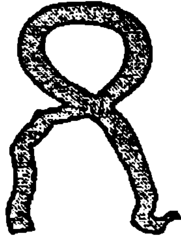
ঠিক প্রকৃতির হাতে গড়া বলে মনে হলো না। গর্তটা, আঁকাবাঁকা পথ ধরে গেলে, পুব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত লম্বায় প্রায় পাঁচশো গজ ; তবে সরলরেখায় ধরলে, পুব থেকে পশ্চিমের দূরত্ব চল্লিশ বা পঞ্চাশ গজের বেশি নয়। পাহাড় চুড়ো থেকে গর্তে একশো গজের মতো নামার পর দেখলাম, দুই পাশের দেয়াল দুই ধরনের উপাদানে তৈরি– একটা সোপস্টোন, আরেকটা কী যেন ধাতব পদার্থের সঙ্গে মেশানো সারমাটি। এখানে খাড়া দুই পাশের মধ্যবর্তী দূরত্ব সম্ভবত ষাট ফুট, তবে গর্তটার গঠনের ধারাবাহিকতা নেই। আরও খানিকটা নামার পর দুই দেয়াল সমান্তরাল হয়ে গেল, কিন্তু এখানেও রয়ে গেল উপাদানের পার্থক্য। তলার পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে পৌছতে পাওয়া গেল নিখুঁত ধারাবাহিকতা। এবার দুই দেয়ালের রংও এক, উপাদানও এক – খুবই কালো চকচকে গ্র্যানাইট, মধ্যবর্তী দূরত্বও সব জায়গায় ঠিক বিশ গজ। বিচিত্র এই গর্তের নিখুঁত গঠনটা বোঝা যাবে একটা নকশা দেখলে   সৌভাগ্যক্রমে, আমার কাছে ছিল একটা পকেটবুক আর একটা পেন্সিল, এই বস্তু দুটো সযত্নে রেখে দেওয়ার জন্যেই সুদীর্ঘ অভিযানের বিবরণ লিখতে গিয়ে সবসময় স্মৃতির ওপর নির্ভর করতে হয়নি।

এই নকশা (১নং নকশা দেখুন) হলো সেই গর্ত বা গহ্বরের মোটামুটি খসড়া একটা কাঠামো, তবে দেয়ালের গায়ের ফোকরগুলো এখানে আঁকা হয়নি, একপাশের দেয়ালে যে ফোকর আছে ঠিক তার উল্টোপাশের দেয়ালে আছে অবিকল সেরকম আরেকটা ফোকর। মেঝেটা তিন-চার ইঞ্চি অতি মিহি ধুলোয় ঢাকা, আর তার নিচে কালো গ্র্যানাইট। নিচের ডানপাশে ছোট একটা ফাটল, যেটা ভালোভাবে পরীক্ষা করতেই এখানে আমাদের এই দ্বিতীয়বার আসা। পথরোধ করে থাকা কাঁটাঝোপ কেটে আর তীরের ফলার মতো ধারালো চকমকি পাথরের স্তূপ সরিয়ে, নতুন তেজে ঢুকে পড়লাম সেই ফাটলের ভেতরে। দূর প্রান্তে একটা আলোর আভাস পেয়ে দারুণ আশায় নেচে উঠল মন। তিরিশ গজ মতো এগোবার পর আমরা পৌছলাম নিচু খিলানঅলা একটা ফাটলে, যার মেঝেতেও মূল গহ্বরের মতো সেই অতি মিহি ধুলো। এবার চোখে পড়ল জোরাল একটা আলো, আর বামে ছোট একটা মোড় নিতেই আমরা পৌছলাম বড় আরেকটা গহ্বরে, যেটা সবদিক দিয়ে আগের গহ্বরটার মতোই, কেবল লম্বাটে ধরনের। সেই গহ্বরের খসড়া কাঠামো দেওয়া হলো। (২নং নকশা দেখুন)

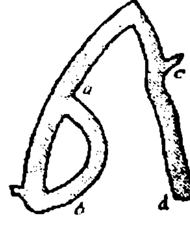
A থেকে শুরু করে B-এর বাঁক ঘুরে D-এর প্রান্ত পর্যন্ত এই গহ্বরটার মোট দৈর্ঘ্য সাড়ে পাঁচশো গজ। C-তে রয়েছে আমাদের আগের দেখা ফাটলের মতোই একটা ফাটল, একইভাবে কাঁটাঝোপ আর তীরের ফলার মতো সাদা চকমকিতে বদ্ধ। প্রায় চল্লিশ ফুট লম্বা ফাটলটা পেরিয়ে, আমরা পৌঁছলাম তৃতীয় আরেকটা গহ্বরে। এটাও প্রথমটার মতোই, কেবল আরেকটু লম্বাটে। (৩নং নকশা দেখুন)

তৃতীয় গহ্বরটার মোট দৈর্ঘ্য তিনশো বিশ গজ। A-তে রয়েছে ছয় ফুট মতো চওড়া একটা ফাটল, যেটা পাহাড়ের গায়ে পনেরো ফুট বিস্তৃত হয়ে গিয়ে পৌঁছেছে একটা সারমাটির স্তরে, আর তার ওপারে আর কোনো গহ্বর নেই, ঠিক যেমনটা আমরা ভেবেছিলাম। ফাটলটায় আলো খুব কম বলে কেবল বেরিয়ে আসতে পা বাড়িয়েছি, এমন সময় পিটার্স আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করাল সারমাটির দেয়ালে খোদাই করা আজব কিছু চিহ্নের দিকে। কল্পনার দৌড়টা খানিক বাড়িয়ে দিলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, বামদিকের, অর্থাৎ, সবচেয়ে উত্তরের চিহ্নটা যেন সামনে দুই হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মানুষ। বাকি চিহ্নগুলোর চেহারা হরফের মতো, অন্তত পিটার্সের সেরকমই ধারণা। আমি পিটার্সের ভুলটা ধরিয়ে দিলাম ফাটলের মেঝেতে অতি মিহি ধুলোর মাঝে পড়ে থাকা সারমাটির বড় বড় কয়েকটা টুকরো দেখিয়ে। প্রাকৃতিক কোনো আলোড়নে টুকরোগুলো খসে পড়েছে দেয়াল থেকে। টুকরোগুলো আমরা তুলে নিয়ে দেখলাম, প্রত্যেকটাই বসে গেল চিহ্নের খাঁজে খাঁজে ; আর এভাবেই প্রমাণ করল যে এগুলো প্রকৃতির হাতে গড়া। পুরো চিহ্নগুলোর একটা নিখুঁত নকল দেওয়া হলো। (৪নং নকশা দেখুন)

যখন নিশ্চিত হলাম যে অদ্ভুত চেহারার এই গহ্বরগুলো মুক্তির কোনো পথ করে দেবে না, নিরাশ হয়ে আমরা ফিরে এলাম আবার সেই পাহাড় চুড়োয়। পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টায় উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটল না, কেবল তৃতীয় গহ্বরের পুবদিকের মাটি পরীক্ষা করে আমরা পেলাম ত্রিভুজ আকারের দুটো গর্ত। দুই গর্তেরই দেয়াল কালো গ্র্যানাইটে নির্মিত। দুটোরই চেহারা সাধারণ কুয়োর মতো হওয়ায়, বের হবার পথ পাব না ভেবে সেগুলোর ভেতরে আর নামার ঝামেলায় যাইনি। প্রত্যেকটা গর্তেরই পরিধি প্রায় বিশ গজ, আর সেগুলোর আকারের একটা ধারণা দেওয়া হলো। (৫নং নকশা দেখুন)



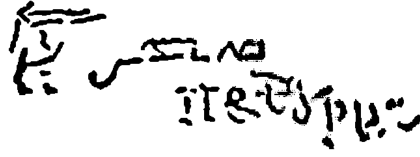
নকশা-১



নকশা-২



নকশা-৩



নকশা-৪



নকশা-৫

অধ্যায় ২৪

মাসের বিশ তারিখে বাদাম খাওয়া একদম অসহ্য হয়ে উঠতে, পাহাড়ের দক্ষিণ ঢাল দিয়ে নিচে নামার জন্যে একরকম মরিয়া হয়ে উঠলাম আমরা। এখানকার সোপস্টোন সবচেয়ে নরম আর খাড়া নেমে গেছে অন্তত দেড়শো ফুট। অনেক খোঁজার পর শেষমেশ পেলাম ফুট বিশেক নিচের একটা শৈলশিরা। আমাদের দুজনের পকেট রুমাল একত্রে বেঁধে, সেটা ধরে ঝুলে নেমে গেল পিটার্স ; খানিকটা অসুবিধে হলেও নামলাম আমিও। দেখলাম, যে উপায়ে সোপস্টোনের গায়ে সিঁড়ি কেটে কেটে উঠে এসেছিলাম আমরা সেই মরণ-গহ্বর থেকে, সেভাবেই ছুরি দিয়ে সিঁড়ি কেটে এখান থেকে সম্ভবত নামা যাবে। কাজটা সহজ নয়, কিন্তু অন্য কোনো উপায় যেহেতু নেই, চেষ্টাটা আমরা করব বলেই ঠিক করলাম।

গেরো বাঁধা রুমাল বাদামঝোপে বেঁধে ঝুলে পড়ল পিটার্স, তারপর ছুরি দিয়ে একটা করে সিঁড়ি কাটল নরম সোপস্টোনের গায়ে, আর সাবধানে নামতে লাগল একটু একটু করে। কষ্ট হলো অনেক, তবে নিরাপদেই সে নেমে গেল তলায়।

এবার আমার নামার পালা। খানিকটা সময় নিলাম, কিন্তু অবশেষে সাহসে বুক বেঁধে নামতে লাগলাম আমি। প্রথমে গহ্বরে পাওয়া মাস্কেটটাকে ছুড়ে দিলাম নিচে, তারপর পিটার্সের ছেড়ে যাওয়া শার্টের সঙ্গে আমার শার্টটা বেঁধে, শার্টের সেই দড়ি ঝোপে বেঁধে, নামতে লাগলাম দ্রুত। বারবার ভাবলাম, নিচের দিকে তাকাব না, কারণ, বেশি গভীরতার দিকে তাকালে সাহস হারিয়ে ফেলতে পারি ; কিন্তু যতই ভাবলাম, চোখ আরও বেশি বেশি করে যেতে চাইল নিচের দিকে। তারপর শুরু হলো আতঙ্কের

সব কল্পনা, চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল মাথা ঘোরা, মূর্ছা যাওয়া আর শেষমেশ পাহাড় থেকে নিচে আছড়ে পড়ার সব ছবি। যতই অবাস্তব বলে ছবিগুলোকে পাশ কাটাতে চাইলাম, ছবি এল আরও বাস্তব হয়ে। একসময় সত্যিই বনবন করে ঘুরতে লাগল মাথা ; কার যেন ভুতুড়ে চিৎকার ভেসে এল কানে ; ঝাপসা একটা মূর্তি এসে দাঁড়াল আমার ঠিক নিচে ; আর, দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলে, ঝুপ করে পড়ে গেলাম আমি পিটার্সের দুই বাহুর বাঁধনে।

আমি মূর্ছা গিয়েছিলাম। নিচে থেকে আমার সব কার্যকলাপই লক্ষ করছিল পিটার্স, আর কথা বলে বলে আমাকে যথাসম্ভব সাহস জোগাচ্ছিল ; অথচ প্রচণ্ড মানসিক বিশৃঙ্খলা তখন আমাকে এতটাই হতবুদ্ধি করে ফেলেছিল যে তার একটা কথাও শুনতে পাইনি। অবশেষে, আমাকে টলতে দেখে, ছুটে এসেছিল সে যথাসময়ে। মিনিট পনেরো পর মূর্ছা ভাঙতে অবশ্য যাবতীয় ভয় কাটিয়ে উঠলাম আমি, আর, আমার সঙ্গীর আরেকটু সহায়তায় নিরাপদেই নেমে গেলাম নিচে।

আমরা যেখানটায় নেমেছি, সেখান থেকে আমাদের বন্ধুদের জ্যান্ত কবর হওয়া সেই গিরিখাত বেশি দূরে নয়। জায়গাটার এমন আজব এক বন্যতা আছে, যা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল পর্যটকদের বর্ণিত বেবিলনের বিষণ্ণ সেই অঞ্চলগুলোর কথা। এখানে শিল্প না থাকলেও যেন রয়েছে শিল্পের ধ্বংসাবশেষ। চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে প্রচুর কোষবিশিষ্ট লাভাপিণ্ড আর কালো গ্র্যানাইটের বিশাল সব ব্লক, সেগুলোর মাঝে ধাতুমিশ্রিত সারমাটি। এখানকার সারমাটির রংও কালো ; পুরো দ্বীপে আমরা হালকা রঙের কোনো জিনিস দেখিনি। যতদূর চোখ যায়, গাছপালার কোনো চিহ্ন নেই। বেশ কয়েকটা কাঁকড়াবিছে দেখতে পেলাম, আর নানা জাতের সরীসৃপ, যা এই দ্বীপ ছাড়া এই অঞ্চলের আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

খাবারই যেহেতু আমাদের সন্ধানের প্রধান বিষয়, কচ্ছপ ধরার জন্যে রওনা দিলাম আমরা আধ মাইল দূরবর্তী সাগর উপকূলের উদ্দেশ্যে। সাবধানে বড় বড় পাথর আর সমাধিস্তূপের মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে একশো গজের মতো এগিয়েছি, হঠাৎ ছোট একটা গর্তের ভেতর থেকে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পাঁচজন অসভ্য, একজনের গদার আঘাতে পিটার্স লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। সে পড়ে যেতেই দলের সবাই ছুটে গেল তার দিকে,

এই সুযোগে আক্রমণের প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে নিলাম আমি। মাস্কেটটা কাছেই ছিল, কিন্তু শৈলশিরার মাথা থেকে ফেলে দেওয়ায় ওটার নলের বারোটা বেজে গিয়েছিল, তাই অকেজো বন্দুকটা একপাশে ছুড়ে দিয়ে, একের পর এক পিস্তলের গুলি চালালাম আমি। ধরাশায়ী হলো দুই অসভ্য, আর যে শয়তানটা পিটার্সের বুকে বর্শা ঢোকাতে যাচ্ছিল, লাফিয়ে উঠল সে কাজটা না সেরেই। ফলে মুক্ত হয়ে গেল আমার সঙ্গী। কাছে পিস্তল থাকা সত্ত্বেও সে তার আসুরিক শক্তির ওপরেই নির্ভর করল বেশি, আর পড়ে যাওয়া একটা অসভ্যের গদা তুলে নিয়ে, একের পর এক মাত্র তিনটে আঘাতে গুঁড়ো করে দিল তিনজনের খুলি।

এত দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাটা যে সেটার বাস্তবতা নিয়েই কেমন যেন সন্দেহ জাগল মনে ; লাশগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে ভাবছি, চমক ভাঙল দূর থেকে ভেসে আসা চিৎকারে। পিস্তলের গুলির শব্দ শুনে ছুটে আসছে অসভ্যেরা, এখন তাদের চোখকে আর ফাঁকি দেওয়া যাবে না। পাহাড়ের কাছে যেতে হলে চিৎকারের দিকেই ছুটতে হবে আর পাহাড়ের পাদদেশে যদি পৌঁছতে পারিও, ওঠার আগে অবশ্যই তারা আমাদের দেখে ফেলবে। মহাবিপদের মুখে পড়ে যখন ভাবছি কোন পথে পালানো যায়, আমার গুলি করা যে দুজন অসভ্যকেই মৃত ভেবেছিলাম, তাদের মধ্যে একজন চট করে লাফিয়ে উঠে পালাবার চেষ্টা করল। বেশি দূর যাবার আগেই অবশ্য তাকে ধরে ফেললাম আমরা, আর আমি যখন তাকে খতম করতে উদ্যত, পিটার্স পরামর্শ দিল যে ব্যাটাকে বাঁচিয়ে রাখলে পালাবার ব্যাপারে সহায়তার জন্যে আমরা তাকে বাধ্য করাতে পারব। সুতরাং তাকে টেনে নিয়ে চললাম আমরা, আর বুঝিয়ে দিলাম যে কোনোরকম বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করব। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার করে নিল সে, আর আমাদের পাশাপাশি ছুটতে লাগল সাগরতীরের দিকে।

সাগর এখনো প্রায় দুইশো গজ দূরে। খোলা সৈকতে আসতেই দেখলাম, গ্রাম এবং আশপাশের দ্বীপ থেকে দলে দলে অসভ্য ছুটে আসছে চরম হিংস্র অঙ্গভঙ্গি আর জানোয়ারের মতো চিৎকার করতে করতে। আমরা ঘুরে পালাতে যাব এমন সময় চোখে পড়ল, বড় একটা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আছে দুটো ক্যানুর গলুই। ছুটলাম সেদিকে প্রাণপণে, আর

কাছে যেতে দেখলাম, কোনো অসভ্য নেই সেগুলোর পাহারায়, রয়েছে কেবল বড় বড় তিনটে গ্যালিপ্যাগো কচ্ছপ আর ষাটটা দাঁড়। লাফিয়ে উঠলাম একটা ক্যানুয়, বন্দীটাকেও জোর করে টেনে তুললাম।

পঞ্চাশ গজ মতো এগোতেই বুঝতে পারলাম, কী মারাত্মক ভুলটাই না আমরা করেছি ! একটা ক্যানু ফেলে এসেছি অসভ্যদের হাতে, আর সৈকতের ওপর দিয়ে ছুটে আসছে তারা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। এখন আমাদের রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় হলো, তারা এসে পড়ার আগেই ছুটে গিয়ে ক্যানুটাকে দখল করা ; সফল হলে হয়ত প্রাণে বেঁচে যাব আমরা, আর যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকি, তাহলে মাথা পেতে নিতে হবে অবশ্যম্ভাবী নৃশংস মৃত্যু।

ক্যানুটার দুই দিকের গলুই একইরকম, ফলে ঘুরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হলো না। আমাদের মনোভাব বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ হয়ে গেল অসভ্যদের চিৎকার, বেড়ে গেল দৌড়ের গতি। মরিয়া হয়ে দাঁড় বেয়ে আমরাও পৌঁছলাম ক্যানুটার কাছে, কিন্তু তার আগেই দুজন অসভ্য এসে উপস্থিত হলো সেখানে। পিস্তল দিয়ে পিটার্স একজনকে গুলি করল মাথা বরাবর। আমরা যখন ক্যানুটাকে ধরে ফেললাম, দলের সামনের অসভ্যগুলো বড়জোর আর বিশ-ত্রিশ ধাপ দূরে। প্রথমে ক্যানুটাকে আমরা টেনে নামাতে চাইলাম গভীর পানিতে, কিন্তু মাটিতে গেড়ে যাওয়ায় তা পারলাম না, এদিকে নষ্ট করার মতো একমুহূর্ত সময়ও নেই হাতে, তাই মাস্কেটের কুঁদোর গোটা দুই প্রচণ্ড আঘাতে ক্যানুটার গলুইয়ের বড় একটা অংশ আর একটা পাশ ভেঙে ফেলল পিটার্স। তারপর রওনা দিতেই, দুই আদিবাসী নাছোড়বান্দার মতো চেপে ধরল আমাদের ক্যানু, বাধ্য হয়ে ছুরি চালিয়ে দুটোকেই খতম করতে হলো। এবার আমরা এগোলাম তরতর করে। অসভ্যদের মূল দল ভাঙা ক্যানুর কাছে এসে রাগে আর হতাশায় জুড়ে দিল কানফাটানো চিৎকার। সত্যিই, এদের মতো শয়তান, ভণ্ড, প্রতিহিংসাপরায়ণ, রক্তপিপাসু, আর নৃশংস জাতি বুঝি পৃথিবীতে আর দুটো নেই। এটা নিশ্চিত যে তাদের হাতে পড়লে করুণার লেশমাত্রও আমাদের ভাগ্যে জুটত না। ভাঙা ক্যানুতেই পাগলের মতো আমাদের অনুসরণ করতে চাইল তারা, কিন্তু সেটা অসম্ভব বুঝে আরেকবার চিৎকার ছেড়ে, ছুটে চলে গেল পাহাড়ের ভেতরে।

আপাতত রক্ষা পেলেও বিপদ মনে হয় পুরোপুরি কাটল না; কারণ, ক্যানু ছিল সবসুদ্ধ চারটে। তখন আমরা জানতাম না, পরে আমাদের বন্দী নিশ্চিত করাল যে জেন গাইয়ের বিস্ফোরণে ওই দুই ক্যানু টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তবে যে ভেলাগুলো রয়েছে প্রায় তিন মাইল দূরে, সেগুলো নিয়েও তাড়া করা বিচিত্র নয় ভেবে বাড়িয়ে দিলাম আমরা ক্যানুর গতি, বন্দীটাকেও দাঁড় টানতে বাধ্য করালাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ-ছয় মাইল দক্ষিণে চলে আসার পর দেখলাম, রওনা দিল ভেলার বেশ বড়সড় একটা দল, স্পষ্টতই অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু কিছুতেই আমাদের আর ধরে ফেলা সম্ভব নয় দেখে, হতাশ মন নিয়ে ফিরে গেল তারাও।

অধ্যায় ২৫

আমরা এখন চলেছি বিশাল আর নির্জন কুমেরু মহাসাগরের ওপর দিয়ে, অক্ষাংশ চুরাশি ডিগ্রি ছাড়িয়ে, পলকা একটা ক্যানুতে, খাবার বলতে রয়েছে কেবল তিনটে কচ্ছপ। সুদীর্ঘ মেরু শীতের আর বেশি দেরি নেই, তাই ভাবা প্রয়োজন যে ঠিক কোন পথে আমরা যাব। একই ধরনের ছয়-সাতটা দ্বীপের দেখা পেলাম, একটার থেকে আরেকটার দূরত্ব পাঁচ-ছয় লিগের কিছু বেশি ; কিন্তু সেগুলোর কোনোটাতেই আমাদের নামার ইচ্ছে হলো না। জেন গাইয়ে উত্তর থেকে একে একে পেরিয়ে এসেছি নিদারুণ সব বরফের রাজ্য, সুতরাং সেই পথে ফিরে যাওয়াটাও হবে বোকামি – বিশেষ করে মরশুমের এই শেষে। আশার পথ খোলা আছে কেবল একটাই। তাই দক্ষিণেই যাব বলে স্থির করলাম আমরা, সেদিকে অন্তত আরও দ্বীপ আবিষ্কারের সম্ভাবনা আছে, তারচেয়েও বেশি আছে আরও ভালো আবহাওয়া পাবার সম্ভাবনা।

এ যাবৎ কুমেরু মহাসাগরকে পেয়েছি আমরা সুমেরু মহাসাগরের মতোই, প্রচণ্ড ঝড় বা তীব্র স্রোত নেই ; কিন্তু বড় হলেও আমাদের ক্যানুটা একেবারেই পলকা, তাই আমাদের সামান্য যা কিছু আছে তা নিয়েই এটাকে খানিকটা নিরাপদ করে তোলায় ব্যস্ত হলাম। এই নৌকাটা অজানা কী যেন গাছের ছাল দিয়ে তৈরি। পাশগুলো শক্ত উইলো কাঠের। এটা লম্বায় পঞ্চাশ ফুট, চওড়া চার থেকে ছয় ফুট, আর গভীরতা বরাবর সাড়ে চার ফুট – দক্ষিণ মহাসাগরীয় অধিবাসীদের যেসব নৌকার সঙ্গে সভ্য জাতিরা পরিচিত, সেগুলোর চেয়ে এই নৌকা অনেকটাই আলাদা। যে দ্বীপটা থেকে আমরা পালিয়ে এলাম, ক্যানুটা সেই দ্বীপবাসীদের হলেও, এটা তাদের মতো মূর্খের হাতে নির্মিত হয়েছে এ কথা আমাদের কখনোই বিশ্বাস হয়নি ; কয়েকদিন পর আমাদের বন্দীকে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম, ওই ক্যানু তৈরি করেছে দ্বীপটার দক্ষিণ-পশ্চিমের কয়েকজন আদিবাসী, যেগুলো হঠাৎ একসময় এসে

পড়েছে এই বর্বর জাতটার হাতে। নিরাপত্তার কাজ আমরা করতে পারলাম খুব সামান্যই। ক্যানুর দুই পাশেই বেশকিছু ফাটল ছিল, সেগুলো আমরা বন্ধ করলাম পশমি জ্যাকেটের টুকরো গুঁজে। বাড়তি দাঁড় দিয়ে একটা কাঠামোর মতো করে গলুইয়ের পাশে দাঁড় করিয়ে রাখলাম, যেন ঢেউ ঝাঁপিয়ে ক্যানুর ওপরে উঠে পড়তে চাইলে খানিকটা হলেও বাধা দিতে পারে। দুটো দাঁড় মুখোমুখি করে দুই গানেলের পাশে বেঁধে তৈরি করলাম মাস্তুল, আর পাল তৈরি করলাম শার্ট দিয়ে। পাল বাঁধতে অবশ্য বেশ একটু ঝামেলা পোহাতে হলো, কারণ, আমাদের বন্দীটা অন্যান্য সব কাজ আগ্রহের সঙ্গে করলেও এটাতে হাত পর্যন্ত দিল না। সাদা লিনেনের শার্টটা দেখামাত্র অত্যন্ত আজব এক প্রতিক্রিয়া হলো তার ভেতরে। শার্টটার দিকে সে তাকাতে চাইল না, স্পর্শ করল না, ওটার আশপাশে এল না। আমরা যখন কাজ করানোর জন্যে জোর করলাম তার ওপরে, কাঁপতে লাগল সে থরথর করে আর চিৎকার ছাড়ল গলা ফাটিয়ে– টেকেলি-লি ! টেকেলি-লি !

নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পর, ক্যানুর মুখটাকে আমরা ঘুরিয়ে দিলাম সটান দক্ষিণে। আবহাওয়া মোটামুটি ভালো। মৃদু একটা বাতাস বইছে উত্তর থেকে, সাগর সম্পূর্ণ শান্ত, দিনের আলো কখনোই মুছে যায়নি। বরফের চিহ্ন নেই কোথাও ; বেনেট আইলেট পেরিয়ে আসার পর বরফের একটা কণাও আর চোখে পড়েনি আমার। পানি অবশ্য একটু গরম। সবচেয়ে বড় কচ্ছপটাকে মেরে কেবল খাবারই পেলাম না, পেলাম প্রচুর পানিও। তারপর সাত-আট দিন ধরে আমরা ভেসে চললাম দক্ষিণে, তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটল না, তবে পথ নিশ্চয় পেরোলাম অনেকটা, কারণ, বাতাস আর স্রোত দুটোই বরাবর ছিল আমাদের অনুকূলে।

মার্চ ১. তারিখ লিখলাম যদিও, তা সম্পূর্ণ সঠিক না-ও হতে পারে। মূলত বিবরণের প্রাঞ্জলতা রক্ষার খাতিরে মোটামুটি একটা তারিখ পেন্সিল দিয়ে লিখে রেখেছিলাম। অনেক অস্বাভাবিক ঘটনা দেখে মনে হলো, আমরা প্রবেশ করছি এক নতুনত্ব আর বিস্ময়ের অঞ্চলে। দক্ষিণ দিগন্তে সবসময় চোখে পড়তে লাগল হালকা ধূসর বাষ্পের উঁচু একটা স্তর, মাঝেসাঝেই আঁকাবাঁকা একটা আলো ছুটে যাচ্ছে পুব থেকে পশ্চিমে, আবার পশ্চিম থেকে পুবে, কখনো আবার ওপরদিকে ঠেলে উঠছে সমতল আর সঙ্গতিপূর্ণ চূড়ার মতো – এসবই অরোরা বোরিয়ালিস বা সুমেরুপ্রভার বিচিত্র খেলা। বাষ্পটার গড় উচ্চতা প্রায় পঁচিশ ডিগ্রি। মাঝেসাঝেই অল্প সময়ের জন্যে বেড়ে যাচ্ছে পানির তাপমাত্রা, স্পষ্টতই পাল্টে যাচ্ছে পানির রং।

মার্চ ২. আজ আমাদের বন্দীকে বারবার প্রশ্ন করে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের দ্বীপ, দ্বীপবাসী, আর তাদের প্রথা সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতে পারলাম – কিন্তু সেসবের সবিস্তার বিবরণ দিয়ে পাঠকগণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে লাভ কী ? শুধু এটুকু বলতে পারি, আমরা জানতে পারলাম, ওই দ্বীপপুঞ্জে রয়েছে মোট আটটা দ্বীপ – সবগুলো দ্বীপ শাসন করে মাত্র একজন রাজা, নাম সালেমন বা সালেমুন, আর বাস করে সে সবচেয়ে ছোট দ্বীপগুলোর একটায় – যোদ্ধারা কালো চামড়ার যে পোশাক পরে সেটা বিশাল এক প্রাণীর, যে প্রাণী পাওয়া যায় কেবল রাজার দরবারের নিকটবর্তী একটা উপত্যকায় – দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের কেউই ওই চ্যাপটা ভেলা ছাড়া আর কোনো ধরনের নৌকা তৈরি করতে জানে না – ক্যানু চারটে তারা পেয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমের বড় কয়েকটা দ্বীপ থেকে – তার নিজের নাম নু-নু – বেনেট আইলেট সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই নেই – আর আমরা যে দ্বীপটা ছেড়ে এসেছি সেটার নাম সালাল। সালেমন বা সালাল শব্দ দুটোর উচ্চারণ শুরুর দিকে এমনই একটানা হিসহিসে যে বারবার চেষ্টা সত্ত্বেও উচ্চারণটাকে আমরা অনুকরণ করতে পারলাম না। পাহাড় চুড়োয় আমরা যে বিটার্ন জাতের কালো পাখিটাকে খেয়েছি, ওটাও ঠিক এইরকম হিসহিস শব্দ করেছিল।

মার্চ ৩. পানির তাপ বেশ আশ্চর্যরকমই বেড়েছে, আর তার রংও বদলে যাচ্ছে দ্রুত, পানির রং এখন আর স্বচ্ছ নয়, হয়ে গেছে দুধের মতো ঘন আর ঘোলাটে। ক্যানুর কাছের পানি এখনো বিপজ্জনক হয়ে ওঠেনি, কিন্তু ডানে আর বামে, বেশ কিছুটা সরে, অনেকখানি জায়গা জুড়ে পানি হঠাৎ হঠাৎ এমন আলোড়িত হয়ে উঠছে যে অবাকই লাগছে – অবশেষে লক্ষ করলাম, দক্ষিণের বাষ্পের ভেতর দিয়ে আলোর ঝলক ছুটে যাবার পরপরই উথালপাতাল হয়ে উঠছে পানি।

মার্চ ৪. আজ উত্তরের বাতাস পড়ে যাওয়ায়, ক্যানুর পালটাকে আরও চওড়া করার জন্যে পকেট থেকে বের করলাম সাদা একটা রুমাল। নু-নু বসেছিল আমার পাশেই, হঠাৎ লিনেনের রুমালটা পতপত করে উড়ে ঝাপটা মারল তার মুখে, সঙ্গে সঙ্গে খিঁচুনি উঠল তার শরীরে, আচ্ছন্নের মতো বিড়বিড় করে কেবল বলতে লাগল – টেকেলি-লি ! টেকেলি-লি !

মার্চ ৫. বাতাস একেবারেই পড়ে গেছে, কিন্তু প্রবল স্রোতের টানে দ্রুতই এখনো আমরা এগিয়ে চলেছি দক্ষিণে। হাবভাবে মনে হলো, এবার আমরা একটা বিপদের মুখোমুখি হতে পারি – তবে কিছুই ঘটল না। পিটার্স সম্পূর্ণ নির্বিকার, যদিও মাঝেসাঝে তার চেহারায় ফুটে উঠছে অতি দুর্বোধ্য

একটা ভাব। গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আসছে মেরু শীত — কিন্তু ভয়ংকরত্ব নিয়ে নয়। কেমন যেন অসাড় হয়ে আসতে চাইছে শরীর আর মন — ঝিমিয়ে আসতে চাইছে বোধ — কিন্তু তার বেশি আর কিছু নয়।

মার্চ ৬. ধূসর বাষ্প এখন দিগন্ত ছেড়ে উঠে গেছে অনেক ডিগ্রি ওপরে, আর ধীরে ধীরে কমে আসছে ধূসর ছোপটা। পানির তাপ অনেক বেড়েছে, হাত দেওয়া যাচ্ছে না, দুধের মতো রংটাও বেড়েছে আগের চেয়ে অনেক বেশি। আজ ভীষণভাবে পানি আলোড়িত হয়ে উঠল ক্যানুর খুব কাছেই, আর যথারীতি বাষ্পের মাথায় আলোর ঝলকানি। তারপর ছাইয়ের মতো অত্যন্ত মিহি একটা সাদা গুঁড়ো ঝরে পড়ল নৌকা আর অনেকটা জায়গা জুড়ে পানির ওপর। নু-নু উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ক্যানুর তলায়, অনেক বুঝিয়েও তাকে আর ওঠানো গেল না।

মার্চ ৭. আজ নু-নুর কাছে জানতে চাইলাম, তার স্বদেশীয়রা আমাদের সব সঙ্গীকে হত্যা করেছিল কেন কিন্তু আতঙ্কে সে এমনই কাহিল হয়ে পড়েছে যে তার কোনো যুক্তিসঙ্গত জবাব দিতে পারল না। এখনো একগুঁয়ের মতো উপুড় হয়ে আছে সে নৌকার তলায় ; আমরা বারবার প্রশ্ন করাতে সে কেবল বোকার মতো অঙ্গভঙ্গি করল, যেমন তর্জনী দিয়ে ওপরের ঠোঁটটা তুলে ধরে, দাঁত বের করে দেখাল। সবগুলো দাঁতই কালো। এর আগে আমরা সালাল দ্বীপের কোনো অধিবাসীর দাঁত দেখিনি।

মার্চ ৮. আজ ক্যানুর পাশ দিয়ে ভেসে গেল সেইরকম একটা সাদা জানোয়ারের মৃতদেহ, যা দেখে সালাল দ্বীপের সৈকতে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল অসভ্যেরা। ওটাকে তুলে নিতে চাইলাম একবার, কিন্তু হঠাৎ কেমন এক অবসন্নতা পেয়ে বসায় কাজটা আর করার ইচ্ছে হলো না। পিটার্স একরকম কথা বন্ধ করেছে, অনেক ভেবেও বুঝতে পারলাম না তার উদাসীনতার কারণ। নু-নু শ্বাস নিচ্ছে, তার বেশি আর কিছু নয়।

মার্চ ৯. ছাইয়ের মতো জিনিসটা এখন আরও বেশি বেশি করে অবিরাম ঝরে পড়ছে আমাদের চারপাশে। দক্ষিণের বাষ্পের স্তরটা উঠে গেছে দিগন্তের আরও ওপরে, এবং স্পষ্ট আকার নিতে শুরু করেছে। ওটা যেন অসীম দূরত্বের, আকাশের কেল্লার ভেতরে অবস্থিত কোনো জলপ্রপাত। অতি প্রকাণ্ড এক পর্দা যেন ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে দক্ষিণ দিগন্ত জুড়ে। তবে প্রপাতটা নিঃশব্দ।

মার্চ ২১. আমাদের ওপর ঝুলে আছে গোমড়ামুখো এক অন্ধকার — কিন্তু মহাসাগরের দুধের মতো গভীরতা থেকে উঠে আসছে ঝলমলে একটা

আলো। সাদা ছাইয়ের বৃষ্টি ছেয়ে ফেলছে আমাদের শরীর আর ক্যানু, কিন্তু পানিতে পড়লেই গলে যাচ্ছে। জলপ্রপাতের চুড়ো সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেছে দূরত্ব আর অস্পষ্টতার কোলে। তবু সেদিকে আমরা ছুটে চলেছি বীভৎস এক গতিতে। মাঝেসাঝে সেই প্রপাতের ফাঁকে যেন প্রলয় নাচনে মাতছে রহস্যময় অজস্র আকৃতি, আর তীব্র বাতাস নীরবে ধেয়ে এসে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে প্রজ্বলিত মহাসাগরকে।

মার্চ ২২. অন্ধকার আরও বেড়েছে, মাঝেসাঝে সেই অন্ধকারকে কেবল হটিয়ে দিচ্ছে সামনের সাদা পর্দায় প্রতিফলিত পানির দ্যুতি। পর্দার ওপার থেকে অবিরাম উড়ে আসছে ফ্যাকাশে সাদা অতিকায় পাখির ঝাঁক আর তারস্বরে টেকেলি-লি ! টেকেলি-লি ! বলতে বলতে হারিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টির আড়ালে। হাত দিলাম আদিবাসীটার গায়ে, একবার নড়ে উঠেই চিরদিনের মতো স্থির হয়ে গেল নু-নু। আমাদের আলিঙ্গন করার জন্যে প্রপাতের গায়ে মুখ ব্যাদান করল বিশাল এক গহ্বর, কিন্তু তার আগেই আমাদের পথের ওপর উঠে দাঁড়াল শবাচ্ছাদনবস্ত্রে আবৃত এক মানুষের মূর্তি – পৃথিবীতে বসবাসকারী যে কোনো মানুষের চেয়ে অনেক অ-নে-ক বড়, আর গায়ের রং তার তুষারের মতো ধবধবে নিখুঁত সাদা।

টীকা

ইতিমধ্যেই দৈনিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে সবাই জেনে গেছেন মি. পিমের আকস্মিক আর দুর্দশাগ্রস্ত মৃত্যুর কথা। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে বাদবাকি যে কয়েকটা অধ্যায়ে তাঁর বিবরণটা সম্পূর্ণ হয়েছিল, আর পুরো পাণ্ডুলিপি টাইপ করার সময় যা তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন সংশোধন করবেন বলে, দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোও হারিয়ে গেছে চিরদিনের মতো। অবশ্য বাস্তবে সেরকম না-ও হতে পারে, যদি পাণ্ডুলিপির সেই অধ্যায়গুলো শেষমেশ খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে অবশ্যই তা জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করা হবে।

বিবরণটা সম্পূর্ণ করার কোনোরকম চেষ্টাই বাদ দেওয়া হয়নি। ভূমিকায় যে ভদ্রলোকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, আর যাঁর বিবৃতি অনুসারে মনে হতে পারে যে শূন্যতাটুকু একমাত্র তিনিই পূরণ করতে পারেন, তিনি কাজটা করতে রাজি হননি – সম্ভবত তাঁর কাছে যেসব তথ্য আছে সেগুলো সঠিক নয় বলে,

আর বিবরণের শেষের অংশগুলোর পূর্ণ সত্যতা সম্বন্ধে তাঁর অবিশ্বাস থাকার ফলে। পিটার্সের কাছ থেকে হয়ত কিছু তথ্য আশা করা যেত ; সে এখনো জীবিত আর বাস করছে ইলিনয়ে, কিন্তু বর্তমানে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে হয়ত তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে, তখন অবশ্যই সে সরবরাহ করবে মি. পিমের বিবরণ সম্পূর্ণ করার মতো উপাদান।

শেষের দু-তিনটে অধ্যায় হারিয়ে যাওয়া সত্যিই দুঃখের বিষয়, কারণ, সেখানে নিশ্চয় ছিল খোদ মেরু আর তার একেবারে কাছের অঞ্চলের মূল্যবান নানা অজানা তথ্য ; আর সরকার দক্ষিণ মহাসাগরে অভিযান চালাবার যে প্রস্তুতি নিচ্ছে, তারা ফিরে এলে যাচাইও করা যেত যে লেখকের বিবরণ সঠিক নাকি পরস্পরবিরোধী।

বিবরণের যে অংশে সালাল দ্বীপের গহ্বরগুলোর উল্লেখ আছে, যে গহ্বরগুলোর এবং দেয়ালে খোদাই করা চিহ্নের নকশা এঁকেছেন লেখক, তা নিয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

মি. পিম গহ্বরগুলোর নকশা এঁকেছেন, কিন্তু কোনোরকম মন্তব্য করেননি, আর দেয়ালচিহ্নগুলোর কথা বলেছেন নিশ্চিতভাবে। পিটার্স বলেছে, চিহ্নগুলোর চেহারা হরফের মতো, কিন্তু মি. পিম তার সেই যুক্তি ভুল বলে উড়িয়ে দিয়েছেন ফাটলের মেঝেতে অতি মিহি ধুলোর মাঝে পড়ে থাকা মারমাটির বড় বড় কয়েকটা টুকরো দেখিয়ে ; তাঁর ধারণা, ভূমিকম্প বা ওই জাতীয় প্রাকৃতিক কোনো আলোড়নে টুকরোগুলো খসে পড়েছে দেয়াল থেকে। টুকরোগুলো দেয়ালের চিহ্নের খাঁজে খাঁজে বসে যাওয়ায় আমরা লেখকের যুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হই ; যুক্তিসম্পন্ন কোনো পাঠকই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবেন না। কিন্তু লেখকের নকশাগুলোর অতি অদ্ভুত চেহারা নিয়ে দু-একটা কথা বলবার আছে। নকশাগুলোর যে কোনো অর্থ থাকতে পারে, তা নিশ্চিতভাবেই মি. পো-র মনোযোগ এড়িয়ে গেছে।

১,২,৩, আর ৫নং নকশাকে একত্রে যুক্ত করলে গঠিত হয় ইথিওপীয় একটা ক্রিয়াপদের মূল, যার মানে– 'ছায়াময় থাকুক'– অর্থাৎ, সবকিছুই ঢাকা থাকুক ছায়ায় কিংবা অন্ধকারে।

৪নং নকশার সবচেয়ে বাম বা উত্তরের চিহ্নগুলো লক্ষ করলে মনে হয়, পিটার্সের মতই সঠিক– ওগুলো সত্যিই শিল্পকলা, আর শিল্পী মানুষের মূর্তিই খোদাই করতে চেয়েছে। পিটার্সের এই মতও খুবই সঠিক যে মানুষের মূর্তির অংশটুকু ছাড়া বাদবাকি চিহ্নগুলোর চেহারা হরফের মতো। ওপরের লাইনের

হরফগুলো গঠন করেছে আরবীয় একটা ক্রিয়াশব্দের মূল, যার মানে – 'সাদা থাকুক' – অর্থাৎ, সবকিছুতেই বজায় থাকুক উজ্জ্বলতা আর শুভ্রতা। নিচের লাইনের হরফগুলো অতটা প্রাঞ্জল নয়, তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ভাঙা ভাঙা হরফগুলো গঠন করেছে পুরো একটা মিশরীয় শব্দ, যার মানে – 'দক্ষিণের অঞ্চল' – মনে রাখা দরকার যে মানুষের মূর্তিটার হাতও প্রসারিত ছিল দক্ষিণ দিকে।

সাগর থেকে তুলে নেওয়া সাদা জানোয়ারটার মৃতদেহ দেখে সালালের আদিবাসীরা ছেড়েছিল আতঙ্কিত চিৎকার– টেকেলি-লি ! মি. পিমের সাদা রুমাল দেখে সালালবাসী বন্দী নু-নু বিড়বিড় করে বলেছিল– টেকেলি-লি ! এমনকি বাষ্পের পর্দার ওপার থেকে উড়ে আসা সাদা দ্রুতগামী অতিকায় পাখির ঝাঁকও ডেকে উঠেছিল – টেকেলি-লি ! সাদা কিছুই পাওয়া যায়নি সালালে। গহ্বরের দ্বীপ সালালের অর্থও খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়, যদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ করা যায় খোদ গহ্বরগুলো, কিংবা ইথিওপীয় ধাঁচের সেই রহস্যময় প্যাঁচানো লেখা।

'পাহাড়ের মাঝে দিয়েছি কবর, আর পাথরের গুঁড়োয় মিশে থাকুক আমার প্রতিশোধ।'

———